রাজনীতির নেপথ্যে

বেদুইন

ক্লাসিক প্রেস
৩/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

RAJNEETIR NEPATHYE

A Political Fiction by

BEDOUIN

Rupees Eight Only.

প্রথম প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭
পুনর্মুদ্রণ ১৩৭৫

প্রকাশক :
শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত
ক্লাসিক প্রেস
৩/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা।

মুদ্রক :
সুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা।

দেশপ্রেমী জনসাধারণের হাতে—

—লেখক।

রাজনীতির নেপথ্যে

এই লেখকের :—

শতাব্দীর অভিশাপ
ঘানার কালো মানুষ
সিয়া একটি গোপন চক্র
সাদা মানুষ কালো রক্ত
পথে প্রান্তরে ১ম ও ২য় পর্ব
কবি কংক (রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)
যশাইতলার ঘাট
এই শহরে
পথ যে আমায় ডাকে (দুই খণ্ড)
হ্যানয় থেকে সায়গন
গ্রামার গার্ল
অভিশপ্ত যৌবন
উপেক্ষিত বসন্ত
রূপ রস রঙ্গ
রাজনীতির দাবা খেলা
পুলিশের ডায়েরী থেকে
ইত্যাদি।

এক

পাদ প্রদীপের আলো জ্বলতেই রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল পাতন-রাজ্যের মহামাত্য পুলকেশী অমিত্রারিকে। পরপর প্রবেশ করল কতিপয় সহচর, সহকর্মী ও সহধর্মী। নাটক অভিনয়ের প্রথম দৃশ্য। স্থান পাতনরাজ্যের মহামাত্যের বিশেষ মন্ত্রণা কক্ষ। উৎফুল্ল নয়ন, হাস্যোজ্জ্বল অবয়ব, ততোধিক প্রফুল্ল ও বিলাসময় পরিবেশ। এহেন সুন্দরতার মধ্য দিয়ে পাতন রাজ্যসৃষ্টির নেপথ্য দৃশ্য এবং এরই মধ্য দিয়ে নাটকের কাহিনী গড়ে উঠছে। এই কাহিনীর শত শত নামী অনামী নায়ক-নায়িকা তখনও নেপথ্যে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ অভিনয়ের রিহার্সেল দিতে ব্যস্ত। তখনও এই রাজ্যের প্রকৃত চিত্র অনুদ্‌ঘাটিত।

ধীরে প্রবেশ করল মহাসচিব মঙ্গল সেন।

'প্রভুর জয় হোক', ধ্বনিত হোল।

মঙ্গল সেন জোড়হাতে নিবেদন করল, পরম কৃপাময় পরমেশ্বরের অনুগ্রহে, প্রভু, অদ্য আপনি এই বিরাট পাতনরাজ্যের মহামাত্যরূপে শপথ গ্রহণ করে দেশবাসী তথা এই অধীনকে ধন্য ও কৃতার্থ করেছেন। পাতনবাসী গণতন্ত্রধর্মী। পাতনের ঐতিহ্য গণস্বার্থানুসারী, গণভোটে আপনারা বিজয়ী। বিজয়ীকে যথাযথ মর্যাদাদান গণধর্মী পাতনবাসীর কর্তব্য। সেই মর্যাদাদান করছি আমরা প্রতি প্রত্যেকে।—মস্তক আনত করে অভিবাদন করল মঙ্গল সেন। গদগদ তার চক্ষু তারকা, পারিষদের কণ্ঠ তার বক্তব্যে।

পুলকেশী শির সঞ্চালনপূর্বক মহাসচিবের বক্তব্যকে সমর্থন জানাল। পুলকিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করল মঙ্গল সেনের দিকে।

অপরাপর মন্ত্রী সকল নিয়োগ বিষয়ে, প্রভুর অনুজ্ঞা জানতে চেয়েছেন মহামান্য রাষ্ট্রশীর্ষ। সত্বর তৎবিষয়ে অবহিত হয়ে ব্যবস্থা করুন।—পুনরায় নিবেদন করল মঙ্গল সেন।

মৃদুহাস্য সঞ্চারিত হল পুলকেশীর অধরোষ্ঠে। তার কণ্ঠ থেকে একটি মাত্র শব্দ নির্গত হল যাবনিক ভাষায়, হবে।

মহাসচিব মস্তক অবনত করে কক্ষত্যাগ করল।

শীঘ্রই রাষ্ট্রশীর্ষের প্রাসাদ হতে ফরমান জারী হল। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সহমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর তালিকা মুদ্রিত হল সেই রাজকীয় ফরমানে। জয়ধ্বনি শোনা গেল পথে ঘাটে, বিজয়ডঙ্কা বাজল গৃহে গৃহে। অবশ্যই মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য নয়, বিগত দুইশত বৎসর যাবত পাতনরাজ্য ছিল যবনাধীন। সম্প্রতি যবনাধিপতি পাতন পরিত্যাগ অথবা পরিহারপূর্বক যবনদেশে প্রত্যাগমনের পর পাতনবাসী গণ-ভোটে প্রজারাজ্যের প্রথম মহামাত্য নির্বাচিত করেছে পুলকেশীকে। এই উৎসব স্বাধীনতালাভের উৎসব, তৎসহ মন্ত্রীমণ্ডল গঠনেরও উৎসব। জনতা আজ ক্ষিপ্ত। উৎসবকে পূর্ণাঙ্গ করতে নৃত্য ও কুঁদনে ব্যস্ত। সবার মুখে একটি মাত্র বাক্য 'জয় পাতনের জয়', আর 'জয় পুলকেশীর জয়'। এই জয়ধ্বনিতে মুখরিত আকাশ বাতাস।

যবনাধিপতির প্রতিনিধির সঙ্গে বহু আলোচনার পরে ক্ষমতা হস্তান্তর, তথা স্বাধীনতালাভ। যবনাধিপতি বিশেষ বিব্রতবোধ না করলে এই অভাবনীয় ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটবার কোন অবকাশ ছিল না। বিজ্ঞ কূটনীতিবিদ্‌রা বহুচিন্তা করে তবেই এই ঐতিহাসিক স্বাধীনতাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কারণ, যবন রাজ্যের আর্থিক নিরাপত্তার প্রশ্নেই প্রয়োজন হয়েছিল শোষণ ও শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। সেই কারণেই যবনাধিপতি ও তদীয় অনুচরবৃন্দ উপযুক্ত বশম্বদ ব্যক্তির অনুসন্ধান করছিল। অনুসন্ধান ব্যর্থ হয়নি। তারা আবিষ্কার করল জননেতা পুলকেশীকে। যবন সংস্পর্শে যাবনিক চরিত্র গড়ে উঠেছিল পুলকেশীর। তার স্বভাবে

পাতনরাজ্যের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য না থাকলেও পাতনীয় মুখোসটা ছিল শক্ত ভাবে আঁটা। যবনরা বুদ্ধিমত্তায় সকলকে টেক্কা দেয়। ব্যক্তি নির্বাচনে তারা ভুল করেনি, তবুও তারা নিশ্চিন্ত হতে পারল না। তারা তাদের বৈষয়িক স্বার্থরক্ষার চিন্তায় মগ্ন। মানব ও রাক্ষস অধ্যুষিত পাতনরাজ্যে যাবনিক স্বার্থ কায়েম রাখতে হলে নর ও রক্ষঃকুলের বিসম্বাদ সৃষ্টি অনিবার্যরূপে প্রয়োজন। তাই রক্ষঃকুলের অদ্বিতীয় নেতা মিস্টার শুষ্কচঞ্চুকে উৎসাহ দিয়ে বিদ্রোহ ঘটাল যবনগণ। অবশ্য এই বিদ্রোহ কোন ক্রমেই বিপ্লব নয়, আবার অহিংসও নয়। স-হিংস এবং তা নর-বিরোধী যবনপক্ষীয়। ভিক্ষাপাত্রের অংশীদারিত্ব দাবী করল রক্ষঃকুলপতি। যবনগণ বলল, ভাল কথা, মানব ও রাক্ষস হল ভোজ্য ও ভক্ষক। সব সময়ই তাদের মধ্যে এমন ব্যবধান থাকা উচিত, যে ব্যবধান হবে দৃঢ় এবং স্থায়ী। অতএব পাতনরাজ্যের সঙ্গে উৎপাতন নামে দ্বিতীয় একটি রাজ্য সৃষ্টি কর্তব্য। এবং এই সুকার্য যত ত্বরান্বিত করা যায় ততই পাতনবাসীর মঙ্গল।

গণতন্ত্রবিশ্বাসী জননেতা পুলকেশী এই মহৎ বিধান বাহ্যত সানন্দে গ্রহণ করতে পারল না। না পারলেও, বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতাদেবী যখন দ্বার প্রান্তে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন তখন তাঁকে বিমুখ করা উচিত নয়; যুক্তি-শাস্ত্রে আছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহানি ঘটিয়েও প্রাণধারণ বিধেয়। সে কারণে স্বয়ং পুলকেশী এবং তস্য গুরু শ্রীশ্রী মহাস্থবির ভণ্ডুল মহারাজ পাতন ও উৎপাতন নামক দুটি রাজ্যকেই স্বীকার করল। দাম কষাকষি করলে যদি মাল বেহাত হয় এই আশঙ্কায় বোধহয়, উভয়েই মানব ও রাক্ষসকে দুটি ভিন্ন জাতি বা নেশন বলে স্বীকার করল এবং বহু বাক্যজাল সৃষ্টি করে পাতন ও উৎপাতন নামক দু'টি রাজ্যের অপজন্মকে সমর্থন জানাল। অবশ্যই এই মহৎকার্য সম্পাদন সহজে সমাধা হয়নি। বহু অস্থিপঞ্জর ভেদ করতে হয়েছে, বহু শোনিত ক্ষয় করতে হয়েছে, বহু সম্পদ লুণ্ঠিত ও

ভস্মীভূত হয়েছে, বহু নারীর মর্যাদা হানি ঘটেছে। সেই ভিক্ষালব্ধ স্বাধীনতার জন্য ভিক্ষুকদের জীবন, মর্যাদা ও সম্পদ তুচ্ছ করে মহান নেতা পুলকেশী মহামাত্যের পদলাভ করেছে। সেই গৌরবলাভ উপলক্ষেই আজ এই মহোৎসব। উন্মত্তের মতো নরনারী গৃহকে তুচ্ছ করে পথকে গৃহের মর্যাদা দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করছে।

এই পটভূমিকায় নাটকের কাহিনী। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

ফোন বেজে উঠল।

ফোন ধরবার আগেই কনিষ্ঠ সচিবকে ডেকে পুলকেশী জানতে চাইল, আজকের প্রোগ্রাম কি?

কনিষ্ঠ সচিব সচদেব ডায়েরীর পাতা উল্টে বলল, সকাল সাড়ে সাতটায় মহিলা সমিতির দ্বার উদ্ঘাটন, সাড়ে ন'টায় শ্রমিক ভবনে বিশেষ সভা, বেলা দেড়টায় বিদেশী কূটনীতিবিদ্দের সঙ্গে সাক্ষাত, চারটেয় রাজ্যপ্রমুখদের সঙ্গে সাক্ষাত, ছ'টায় কোন বিনামা কোম্পানীর বিক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন, রাত আটটায় মন্ত্রীপরিষদের সভা।

অভিনিবেশ সহকারে দিনের কার্যতালিকা শুনে নিয়ে ফোন তুলে ধরল পুলকেশী। সাধারণত ফোন তুলে ধরা তার রীতি নয়। সঙ্গীয় একান্ত সচিব ফোন ধরে। ফোনে জেনে নিতে চায় বক্তার পরিচয়। যদি পরিচয় শুনে খুশী হয়, তবে তা নিবেদন করে মহামাত্যকে। অতঃপর মহামাত্যের অনুমোদন লাভ করলে তবেই ফোনের রিসিভার তুলে দেয় তার হাতে। অদ্য হঠাৎ তার ব্যতিক্রম।

হ্যালো!-- বললেন মহামাত্য।

বিষয়টা গুরুতর। হঠাৎ কিছু বলা উচিত নয়। আপনি আমার সচিবের সঙ্গে কথা বলুন আগে। আমাকে জিজ্ঞেস করলে পরে যথাযথ উপদেশ দেব। বলা শেষ করে মহামাত্য ফোন নামিয়ে রাখল।

মহামাত্যের গৃহভৃত্যটি এসে দাঁড়াল পাশে।

মুখতুলে মহামাত্য জিজ্ঞেস করল, কি খবর বজরংবলী ?

হুজুরের নাস্তা রেডি। এখানে আনব কি ? বাঈসাহেবা অপেক্ষা করছেন।

মহামাত্য ব্যস্তভাবে বলল, না, এখানে নয়। আমি আসছি। বাঈকে বল বিশেষ দেরী হবে না।

গৃহভৃত্য বজরং নিষ্ক্রান্ত হতেই পুলকেশী মুখ তুলে একান্ত সচিবকে জিজ্ঞেস করল, অঙ্গ রাজ্যগুলোর শান্তি-শৃঙ্খলার রিপোর্ট এসেছে কি সচদেব ?

না স্যার। দু'বার রিমাইণ্ডার দিয়েছি।

স্বরাষ্ট্র বিভাগকে তাগাদা দাও। ওরা সব সময় কাজে গাফিলতি করে তাতো জান। আর দোষতো ওদের নয়। কোন কাজটা টপ্ প্রায়রিটি তা ওদের জানা নেই। এতদিন ওরা দেশ স্বাধীন করতে জেলে জেলে জেলঘুঘু হয়ে ঘুরেছে, দেশ শাসন করার ট্রেনিং তো কারও নেই। যাক, ওদের শক্ত তাগাদা দাও।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল পুলকেশী।

একটা কথা স্যার।

আবার কি কথা ?

ধনপতিয়ালাল এসেছিল।

আবার কেন ?

প্ল্যানিং নিয়ে আপনারা ব্যস্ত। প্ল্যানিং মানেই ব্যয়। সেই ব্যয়ের কতটা অঙ্ক কাজে লাগবে আর কতটা তাদের পকেটে যাবে সেই কথা জানতে চাইছিল।

ভ্রূকুঁচকে মহামাত্য গোটা ঘরখানা দেখে নিল। বাইরের কোন লোক ছিল না বলেই মহামাত্য মুখ খুলল, বলল, ওটা আজ মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে তবেই জানাব। এখন ধৈর্য ধরতে বল। পরে আলোচনা করব।

মহামাত্য গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে ডাকল, মুনিয়া।

মুনিয়া তার আদরের কন্যা। সবাই তাকে বাঈ বলেই ডাকে। পিতার সেবা করতে মুনিয়া অলিখিতভাবে স্বামীকে পরিত্যাগ করেছে বললে ভুল হয় না। পতির চেয়ে পিতা যে বেশী কদরদান ও ক্ষমতাবান তা তার অজ্ঞাত নয়। তাই ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই মুনিয়া পিতৃদেবের আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

মহামাত্য ভেতরে আসতেই মুনিয়া বলল, তোমার খাবার ঠাণ্ডা হতে চলল। এই শীতের দিনে খাবার গরম রাখা বড়ই কঠিন, বিশেষ করে চা আর কফি। তুমি কাল থেকে নাস্তা খেয়ে তোমার অফিসে বসবে।

মহামাত্য হেসে বলল, তোর ইচ্ছা পূর্ণ হবে, তবে জানিস তো সারাদিন কত কাজ থাকে। সেই কাজের ধাক্কায় খাবার কথা মনেই থাকে না। বুঝলি? দে খাবার দে।

মুনিয়া একটা গোটা মুরগীর রোস্ট, দু পিস্ মাখন ভেজানো রুটি, চারটি সন্দেশ আর তিনটি ডিম সেদ্ধ সঙ্গে এক গেলাস দুধ রেখে সবার আগে এগিয়ে দিল এক কাপ চা।

চায়ে চুমুক দিয়ে পুলকেশী বলল, আজ চা কে করেছে রে?

কেন ড্যাডি?

দেখ মুনিয়া, সকালের প্রথম চা যদি ভাল না হয় সারাদিনটা আমার খারাপ যায়। এটা তোকে বহুবার বলেছি। চায়ের দিকে একটু নজর রাখিস। আহা একি! রোস্টটা যেন পোড়া পোড়া মনে হচ্ছে। কে রোস্ট করেছে? যে করেছে তাকে বরতরফ করে দে। হাসিম নাকি ভাল খানা পাকায়। সে যবন রাজদূতের বাবুর্চি। দু'দশ রুপেয়া বেশি দিয়ে ওটাকে আনিয়ে নে।

মুনিয়া মাথা নাড়ল।

মহামাত্য ভোজনপর্ব সমাধা করে ঢেকুর তুলল। তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে বলল, সিগারেট।

সিগারেটের প্যাকেটে হাত দিয়েই চমকে উঠল মহামাত্য। যবদ্বীপ থেকে যে স্পেশাল ব্রাণ্ড সিগারেট এসেছিল সেগুলো কোথায়? তোর জ্বালায় আর পারলাম না। ভাল ভাল সিগারেট নিজে টানলে বুড়ো বাপের কপালে এই সব বাজে সিগারেট থাকবে বইকি।

এটা বাজে সিগারেট নয় ড্যাডি। খাস আমেরিকা থেকে এসেছে। আর একটা ড্রিংক যা এসেছে! তুমি জীবনে কখনও তা খাওনি।

সত্যি বলছিস?

হ্যাঁ ড্যাডি। আমি এক চুমুক খেয়ে দেখেছি।

সাবধান করে রাখিস, নইলে তোর বজরংবলী শেষ করে দেবে। বুঝলি? যাই বলিস মুনিয়া এই মার্কিন জাতটার রুচি আছে। এরা সত্যি সত্যিই পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবার যোগ্য। আমার পোষাকের ব্যবস্থা কর। এখুনি যেতে হবে মহিলা মহাসঙ্ঘের সভায়। তুইও চল। মেয়েদের সভায় তুই থাকলে আমি মন খুলে কথা বলতে পারি। একা হলে কেমন বাধো বাধো ঠেকে, বুঝতেই তো পারিস। তোর মা বেঁচে থাকলে এত চিন্তা করতাম না।

মুনিয়া শেরওয়ানী আর চুড়িদার পাজামা নিয়ে এসে দাঁড়াতেই দু'জন ভৃত্য পোষাক পরিয়ে দিতে এগিয়ে এল। মুনিয়াও গেল শাড়ি বদলাতে। মহামাত্য পোষাক পরেই বেড়িয়ে গেল ঘর থেকে, এসে হাজির হল অফিস ঘরে।

সচদেব মহামাত্যকে দেখেই হাত কচলে বলল, মিসেস প্রেম ভাটীয়া ফোন করেছিল স্যার।

কি বললে তাকে?—জিজ্ঞেস করল মহামাত্য।

বললাম মহামাত্য নাস্তা খেতে গেছেন, পরে ফোন করবেন।

সিগারেটে আগুন দিয়ে মহামাত্য বলল, রাইট্। আমি ফিরে এলে কনেকসান দিও। অনেক দরকার রয়েছে।

মহামাত্য প্রস্তুত, অপেক্ষা করছিল মুনিয়ার জন্য। এমন সময় ফোন বেজে উঠল।

সচদেব ফোন ধরল, হ্যালো।

গুরুজি! হ্যাঁ হ্যাঁ আছেন মহামাত্য। স্যার, গুরুজি।

মহামাত্য ত্বরিতে ফোন ছিনিয়ে নিল সচদেবের হাত থেকে।

হ্যালো। হ্যাঁ আমি বলছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি মহিলা মহাসঙ্ঘের মিটিং শেষ করে আপনাকে দর্শন করতে যাব। ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা। চিন্তার কিছু নেই। যতদিন লোকের বিশ্বাস রয়েছে আমাদের ওপর ততদিন কোন চিন্তা করি না। জনতা! ওদের বুঝিয়ে দিতে পারবেন আপনি।

ফোন ছেড়ে দিল মহামাত্য।

মুনিয়া পেছন থেকে ডেকে বলল, ড্যাডি, আমি প্রস্তুত।

মুখ ফিরিয়ে মহামাত্য দেখল মুনিয়াকে। অবাক তার চাহনি।

কি দেখছ ড্যাডি?

তোকে দেখছি। এরকম লাভলি না হলে পাবলিক ফাংসনে যাওয়া উচিত নয়। এইজন্যই তো সেদিন মিস্টার জগঝম্পকে বললাম, রাষ্ট্রদূতের যোগ্যতা বিচার হবে তার সুন্দরী বউ দিয়ে। যাদের সুন্দরী স্মার্ট ওয়াইফ থাকবে তারাই রাষ্ট্রদূতের উপযুক্ত। আরসুলা রাজ্যে আমাদের যে রাষ্ট্রদূত ছিল তাকে ডেকে পাঠিয়েছি, একটা আগলি ওয়াইফ নিয়ে পার্টিতে গেলে পাতনরাজ্যের প্রেস্‌টিজ মোটেই থাকে না।

মুনিয়া মুখ চোখ লাল করে ঈষৎ হেসে বলল, ঠিকই বলেছ ড্যাডি। ওরা পাতনীয় ঐতিহ্য মোটেই রক্ষা করতে পারছে না। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেও যদি পাতনের সম্মান রক্ষা না হয় তা হলে টাকা ব্যয় করা উচিত নয়।

সচদেব ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, সময় আর হাতে নেই স্যার। গাড়ি প্রস্তুত।

মহামাত্য ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, সাত মিনিট বাকি। অল্ রাইট। চল মুনিয়া।

সামনে ছুটল পাইলট কার, মাঝে মহামাত্যের গাড়ি, পেছনে দেহরক্ষীর দল; তার পেছনে একদল পারিষদ। গাড়ির মিছিল। লন ছেড়ে গাড়ি ছুটল মহাপ্রস্থ এলাকার দিকে।

গাড়ি যখন পৌঁছল মহিলা মহাসঙ্ঘের প্যাণ্ডেলে তখন সাতটা বেজে তেত্রিশ মিনিট। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মহামাত্য খেঁকিয়ে উঠল ড্রাইভারের ওপর।

তিন মিনিট বিলম্ব হয়েছে।

মুনিয়া বলল, সামান্য সময়। সবার ঘড়িতো সমান নয়। দু'চার মিনিট এদিক ওদিক হওয়া এমন কিছু গুরুতর ঘটনা নয়। তুমি অনর্থক রাগ করছ ড্যাডি। লোকে শুনলে নিন্দে করবে।

ঠিক বলেছিস মুনিয়া। লোকে নিন্দে করবে। আচ্ছা চল।

গাড়ি থেকে নামতেই মহিলারা এসে গলায় মালা পরিয়ে দিল, কপালে এঁকে দিল চন্দন আর কুমকুমের তিলক। শাঁখ বাজিয়ে অভ্যর্থনা জানাল, একদল কিশোরী মাঙ্গলিক গেয়ে উঠল।

মহামাত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এগিয়ে এল লছমী কাউল।

ইনি হলেন রূপমতী খেঁকুরিয়া, আমাদের প্রেসিডেণ্ট। পাতন কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেকটার শুকদেব খেঁকুরিয়ার স্ত্রী। আর ইনি হলেন শিয়ালিয়া কোম্পানীর কর্তা গিদ্ধরলাল শিয়ালিয়ার কন্যা মিস্ সুমতি, আমাদের অর্গানাইজার। ইনি হলেন মিসেস্ অটল। এঁর স্বামী ছিলেন মেজর জেনারেল, সম্প্রতি দেহরক্ষা করেছেন। মিসেস্ অটল আমাদের সেক্রেটারী।

মহামাত্য সানন্দে সবার হস্তে হস্ত স্পর্শ করে ও ঝাঁকুনি দিয়ে এগিয়ে গেল ডায়াসের দিকে। সমবেত মহিলারা দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল।

মহামাত্য আসন গ্রহণ করতেই সেক্রেটারী মিসেস অটল মহিলা মহাসঙ্ঘের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করতে উঠল। ফিস ফিস করে মহামাত্য বলল, সংক্ষেপে সব শেষ করুন। সময় বড় কম। আপনারা আমাকে না ডেকে অন্য যে কোন মন্ত্রীকে ডেকে আনতে পারতেন। ওঁরা অনেক সময় দিতে পারতেন। দ্বার উদ্‌ঘাটন এমন কিছু কাজ নয়।

তাকি হয়! বলে হাসলো মিসেস অটল।

ইনকাম ট্যাক্স আর ইমামবক্স কি এক সমান, বলল সুমতি শিয়ালিয়া।

মনে মনে খুশী হলেন মহামাত্য। মুখ দেখে মনের কথা বুঝতে পারল না কেউ-ই। ইতিমধ্যে বার্ষিক বিবরণী পড়া শেষ। মহামাত্য উঠল ভাষণ দিতে।

বলল, দেশ গঠনের কাজ আমাদের সামনে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর আহার্য এই তিনটি শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের জেহাদ। আর এই জেহাদে সব চেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারেন আমাদের দেশের মহিলারা। আপনারা এগিয়ে আসুন, কঠিন পরিশ্রম করুন, তা হলেই আমাদের সাফল্য নিশ্চিত।

থামল মহামাত্য। রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো।

দম নিয়ে আবার বললো, আপনাদের সামনে অনেক কিছু বলবার ছিল, কিন্তু সময়ের বড় অভাব। আমি বিশেষ ক্লান্তও। কন্যা মুনিয়া এসেছেন, তিনিই সব বুঝিয়ে বলবেন।

মহামাত্য বিশেষ ব্যস্ততার সঙ্গে বসে পড়লেন। তাঁর অসমাপ্ত বক্তব্য শেষ করতে এগিয়ে এল মুনিয়া। তখন গোটা প্যাণ্ডেলের মহিলা কিশোরী ও শিশুরা হাততালি দিতে ব্যস্ত। মুনিয়ার কণ্ঠস্বর ডুবে গেল করতালির শব্দে। করতালির ধ্বনি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল একদল কিশোরী। তাদের কণ্ঠনিসৃত জাতীয় সঙ্গীত শুনেই মুনিয়া বুঝল, আজকের সভা শেষ। নিজস্ব বক্তব্য

বলবার অবসর আর পেলনা মুনিয়া। বাবার পেছন পেছন সে-ও নেমে এল ডায়াস থেকে।

মুনিয়ার চোখ মুখ লাল। গলায় আটকে যাচ্ছে কথা। গাড়িতে উঠেই বলল, কোন আশা নেই ড্যাডি।

মহামাত্য মুখ ফিরিয়ে বললো, কেন ?

ওরা তোমাকে দেখতে চায়, তোমার কথা শুনতে চায়। ওদের সম্পর্কে অপর কারও কোন বক্তব্য থাকলেও শুনতে চায় না।

মহামাত্য হেসে বলল, ওরা হল সোসাইটির শীর্ষমণি। ওদের ধরনই আলাদা। আমরা চাই পাবলিসিটি। লোকে জানুক আমরা জনদরদী। আমাদের কথা কেউ শুনল অথবা না শুনল, তাতে কিছু এসে যায় না। আমাদের বক্তব্য কাল সকালে যখন কাগজে ছাপা হবে, সারা পাতনরাজ্যের ঘরে ঘরে পৌঁছবে আমাদের বাণী, তখন উদার লেখনীতে সম্পাদকরা জয়গান করবে। যা আমরা চেয়েছি তাই পাব।

মুনিয়া খুশী হল কিনা বুঝতে পারল না মহামাত্য। মুখ ফিরিয়ে সিগারেটে আগুন দিয়ে বলল, আমি হাসব, আমি কাঁদব, আমি হাঁচব, আমি থুথু ফেলব, এমন কি আমি কখন বাথরুমে যাই, কখন ঘুমোই, কখন খাই তারই ফিরিস্তি লিখতে এখন ব্যস্ত রয়েছে কাগজওলারা। তারাই আমাদের পৌঁছে দেবে দেবতার আসন পর্যন্ত। আমাদের কাজ হল সেই আসনে জুতসই ভাবে উঠে বসা। সেটুকু করতে পারলেই যথেষ্ট।

মুনিয়া বোধহয় এবার বুঝতে পারল পিতৃদেবতার বক্তব্য। তাই সেও মুখ ফিরিয়ে বলতে গেল, আমি যখন যবন দেশে ছিলুম···

তুই তো ছিলি মাত্র দু'তিন বছর! আমি ছিলুম চোদ্দ বছর। সেখানকার এটিকেট আর কালচার চিন্তা করলে এদেশে বাস করা সম্ভব নয়। তবু মানিয়ে নিতে হবে। এদেশটাকে ঢেলে সাজাতে হবে। অবশ্য কাজটা সহজ নয়।

সেই জন্যই তো ভাবছি সেদেশ গিয়েই থাকব। এদেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারব বলে ভরসা পাচ্ছি না। মুনিয়া বলে।

আমারও ইচ্ছে তাই, কিন্তু সেদেশের মহামাত্য হবার তো কোন সম্ভাবনা নেই। আর ওদের আইন তো জানিস। আমরা পাতনীয় নাগরিক ও স্বাধীন এদেশে, ওদেশে গেলে আমরা যবনের প্রজা। তাই সুখ-সুবিধা অর্থবিত্ত ক্ষমতা যা কিছু আমাদের আছে এদেশে, তার এক কণিকাও পাব না সেদেশে। নইলে কি থাকতুম এদেশে। ওদেশে আজ যাকে বীর বলে সম্মান করে, সামান্য ভুলের জন্য তাকেই পরের দিনে ফুটপাতে টেনে নামায় বিনা দ্বিধায়। কিন্তু এদেশে বীর চিরকালই বীর। জনতার পূজা এদেশে বীররা চিরকালই পেয়েছে, পাবেও। এই সুযোগ হারাতে চাইনা মুনিয়া।

এবার কোথায় চলেছো ?

গুরুজির কাছে।

মুনিয়া চুপ করে বসে রইল।

গাড়ি এসে দাঁড়াল গুরু ভণ্ডুল মহারাজের আশ্রম দ্বারে।

আশ্রম অধিবাসীরা অভ্যর্থনা জানাল মহামাত্যকে, পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল গুরুজির কক্ষে। কক্ষে সবার প্রবেশ নিষেধ। বক্তা গুরুজি, শ্রোতা মহামাত্য, এমন কি মুনিয়াও প্রবেশ করতে পেলনা ভেতরে।

আমাকে স্মরণ করেছেন গুরুজি !—পদধূলি মাথায় নিয়ে মহামাত্য বসল সামনে।

দেশের অবস্থা কি বুঝছ পুলকেশী ! বললেন গুরুজি।

খারাপ কিছু নজরে পড়ছেনা।

রাক্ষসরাজ্যের কথা শুনেছ বোধহয়।

শুনেছি। রাক্ষসরাজ্য থেকে মানবদের টেনে আনতে নাজেহাল হয়েছি গুরুজি। এক লক্ষের ওপর লোক মারা গেছে। কয়েক শত কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়েছে, তিরিশ হাজারের ওপর নারী ধর্ষিতা হয়েছে।

স্বাধীনতালাভের জন্য অনেক মূল্য দিতে হয় পুলকেশী। হলদিঘাটা যুদ্ধে কত মরেছিল জানো, থার্মাপালির যুদ্ধে কত বীর শেষ শয্যা গ্রহণ করেছিল জানো! তবুও, খুবই দুঃখজনক এই অবস্থাকে জয় করতেই আমি এতদিন খুঁজে বেরিয়েছি একটি সৎমানব এবং একটি সৎরাক্ষস। কিন্তু তা আর পেলাম কোথায়! সৎমানবের যেমন অভাব ঠিক তেমনি অভাব সৎরাক্ষসের।

মহামাত্য হেসে বলল, সৎ নামক শব্দটি প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার। বর্তমান যুগে ওটা হল মুখোস। সৎ সেজে অসৎ কাজ কর। ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ কর, লাম্পট্যকে প্রশ্রয় দাও গোপনে। এই তো যুগধর্ম। যুগধর্মকে বাদ দিয়ে চলতে তো পারি না।

থাক ওসব কথা। আমার সাধনা সাফল্যলাভ করেছে। যবন বিতাড়ন করেছি। এবার অন্য কাজে হাত দেব মনে করেছি। তোমাদের এই রাজনীতি আর ভাল লাগেনা পুলকেশী। রাজনীতিক হোল সিনেমার শিল্পীর মত, বলতে পার মাঠের খেলোয়াড়। যতদিন দেহে বল থাকে ততক্ষণ খেলোয়াড়ের খ্যাতি। যতক্ষণ রূপ যৌবন থাকে ততদিন ছবির অভিনেতার খ্যাতি, তেমনি যতদিন গদীতে বসার সুযোগ থাকবে ততদিন রাজনীতিবিদ্‌দের খ্যাতি। এরচেয়ে এইসব ধর্মভীরু, মানে যারা দেব-দেবতার পূজারী, তাদের দেশে ধর্মের ভেক নেওয়া ভাল। মৃত্যুকাল অবধি আসর জমাট থাকে। তাই ভাবছি। ওদিকে রক্ষঃকুল অর্থের অংশ দাবী করে হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছে। তাদের তোষণও দরকার।

কিন্তু অতটাকা দিলে দেশের লোক শুনবে কেন?

তাও তো ঠিক। গীতা উপনিষদ পুরাণ পাঁচালি থেকে শ্লোক আর তথ্য হাজির করে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে হবে দেশের লোককে। সে দায়িত্ব আমার, তুমি তাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।

আপনি যদি জনমত ঠেকাতে পারেন তা হলে অর্থদান আমার পক্ষে মোটেই কষ্টকর হবেনা। আমি তার ব্যবস্থা করব।

গুরুজি হেসে বললেন, তোমার কোন চিন্তা নেই। বাইরের চেহারা দেখে যেন কেউ বুঝতে না পারে আমাদের মনোগত অভিপ্রায়। আরেকটা খবর এই বানিয়াদের নিয়ে। বানিয়াদের যোগ্য আসনে না বসালে ভবিষ্যতে কষ্ট পেতে হবে, বুঝলে। ওদের নিতে হবে তোমাদের মন্ত্রীসভায়, বিশেষ করে তোমাদের অঙ্গরাজ্যে। যদি অঙ্গরাজ্যে বানিয়া মন্ত্রী না রাখতে পার তা হলে বানিয়াদের স্বার্থহানি হতে পারে। তাতে ভবিষ্যতে ওরা টাকা দেবে না, তোমাদের ভোট পেতে অসুবিধে হবে। দেশের জনতা হল মূর্খ। তাদের হাতে টাকা তুলে দিতে পারলে ভোটের অভাব হবেনা। বিশেষ করে দরিদ্র দেশের মানুষ একবেলা খেতে যদি পায়, তা হলে ভোটের কি মূল্য তা আর মোটেই চিন্তা করে দেখবে না। তুমি ওদের চটিও না, তাহলে ভবিষ্যতে কিন্তু অন্ধকার।

মহামাত্য মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

গুরুজি বললেন, সীমান্ত রক্ষা তোমার দায়িত্ব। দেশ বিদেশে পাতনের মহিমা প্রচার তোমার দায়িত্ব। এসব দিকে নজর দিতে কখনও ভুল কর না।

সীমান্ত নিয়ে আমি মোটেই চিন্তিত নই। রাক্ষসকুল উপদ্রব সৃষ্টি করতে পারে, তবে সেটা সাময়িক। আমাদের তথা রাক্ষসদেরও নীতি হল সহাবস্থান। তবে সব দেশেই বিপক্ষ বিরোধী রয়েছে। যখন এই বিরুদ্ধপক্ষ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং জনমত তাদের অনুসরণ করবে তখন আমরা সব দোষ অপরের স্কন্ধে তুলে দিয়ে সীমান্তে হাঙ্গামা সৃষ্টি করব। তাতে জনমন মূল দাবী ও কর্মধারা থেকে অন্য খাতে ছুটবে। সাময়িক অশান্তি এই ভাবেই রোধ করতে পারব। আমাদের আর রাক্ষসদের একই ফর্মূলা অনুধাবন করে রাজ্য পরিচালনা করতে হবে। আর প্রচার ব্যবস্থা জোরদার করতে দেশে দেশে দূত পাঠিয়েছি, কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি প্রচার যন্ত্রকে চালু রাখতে।

বিদেশে প্রচার করলেই যথেষ্ট নয় পুলকেশী। স্বদেশেও তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

তার ত্রুটি হচ্ছে না গুরুজি। প্রচারের বড় অস্ত্র হল সংবাদপত্র। তারা আমাদের অতি বশম্বদ। আমাদের কাঠামো বজায় রাখতে তারা প্রতি নিয়ত ব্যাকুল। তারা অবিরাম আমাদের স্তবপাঠ করছে। কোন ক্রমেই তারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করতে হলে সংবাদ-পত্রকে সব সময়েই নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে হবে, তারজন্য উপযুক্ত দক্ষিণা দেবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

গুরুজি মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, কূটনীতিতে তুমি অতুলনীয়। যাইহোক এবার রাক্ষস রাজ্যের সমস্যাটা সমাধান করতে সচেষ্ট হও। আর কিছু বলার নেই।

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পুলকেশী উঠে দাঁড়াল।

গুরুজি আশীর্বাদ করলেন, জয় হোক।

মহামাত্য ধীরে ধীরে গুরুজির কক্ষ ত্যাগ করে বাইরে আসতেই জয়ধ্বনি করল সমবেত জনতা।

মুনিয়ার হাত ধরে মহামাত্য গাড়িতে উঠল।

গাড়ি ছুটল শ্রমিক ভবনের দিকে। বেলা তখন নটা বেজে বিশ মিনিট।

শ্রমিক ভবন লোকে লোকারণ্য।

মহামাত্যের গাড়ি এসে দাঁড়াল ঠিক সাড়ে নটায়।

পরিচয়পর্ব শেষ করে মহামাত্য ডায়াসে উঠল। পাশে স্থান পেল শিল্পপতির দল, পেছনের সারিতে রইল শ্রমিক সংস্থার নেতারা। তারও পেছনে রইল পারিষদ ও কর্মচারীর দল।

শিল্পপতি শিয়ালিয়া ফিস্ ফিস্ করে বলল, ধর্মঘটের হুমকি শোনা যাচ্ছে মহামাত্যজি। তার জন্য কিছু ভাষণ দিন। যাতে শ্রমিক মালিক বিরোধটা আমাদের স্বপক্ষে ফয়সালা হয় তার ব্যবস্থা করুন।

মহামাত্য মাথা নাড়লেন।

মুনিয়া তখন শ্রমিক সংস্থার নেতাদের নিয়ে ব্যস্ত।

গিরিধারীলাল প্রথম শ্রেণীর নেতা। সেই বলল, দেশের বৈষয়িক উন্নতি ঘটাতে হলে শ্রমিক-মালিক সৌহৃদ্য বজায় থাকা দরকার। সে বিষয়ে মহামাত্যকে একটু দৃষ্টি দিতে বলবেন মুনিয়াবাঈ।

অবশ্যই বলব। কিন্তু ধর্মঘট কি এই সমস্যা সমাধানের পথ?

মোটেই নয়, বলে রুমাল দিয়ে গিরিধারীলাল মুখ মুছে নিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, তাইতো ভাবছি, এর জন্য আইন দরকার। ধর্মঘট হল দেশের স্বার্থের পরিপন্থী। আমরা আপোষ আলোচনার পক্ষপাতী।

সব সময় আপোষ আলোচনার দিকে ঠেলে দিতে পারলে সমস্যা সমাধান সম্ভব। আইনের প্যাঁচে শ্রমিকরা যদি নাজেহাল হয়, তা হলে আর অশান্তি সৃষ্টি করতে সাহস পাবে না।

শিয়ালিয়া মুখ ফিরিয়ে বলল, শিল্পপতিদের স্বার্থহানি করে যদি আইন হয় তা মেনে নেওয়া উচিত হবে কি! তা যদি হয় তা হলে দেশের শিল্প ব্যাহত হবে, উৎপাদনে ঘাটতি ঘটবে, আমরা মূলধন খাটাতে পারব না।

মহামাত্য বললেন, ওসব ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না। নতুন আইন করছি শিল্প-বিরোধ মেটাতে। সেই আইনে থাকবে সালিশী ব্যবস্থা। অবশ্য সালিশীর রায় মান্য করা শিল্পপতির পক্ষে হবে স্বেচ্ছামূলক। আর শ্রমিক ততদিন কোন ধর্মঘটে যোগ দিতে পারবে না যতদিন সালিশী শেষ না হবে। শ্রমিক থাকবে আইনের ফাঁসে জড়িয়ে আর শিল্পপতি চলবে সুবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে। তবে তাড়াতাড়ি কিছু করতে যাওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ধৈর্য ধরতে হবে।

নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনি যখন বলছেন, আপনার মত হিতকারী কখনও কি আমাদের স্বার্থহানি ঘটাতে পারে। আপনিই দেশের

একমাত্র ভরসা। গুরুজি আমাদের যথেষ্ট অনুকম্পা করেন, আপনার কাছেও তেমনটি পাব আশা করছি। ভরসা আছে, নইলে আমরা কি নতুন নতুন উদ্যোগে টাকা দিতাম।

সভার উদ্যোক্তা রামভরস খাণ্ডেলওয়াল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাদের নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র, এই রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়েছেন শ্রীমান পুলকেশী অমিত্রারি। বর্তমানে দেশের যে অবস্থা তা অনুধাবন করতে পারছেন সবাই। দেশের উন্নতি ঘটাতে হলে প্রয়োজন শিল্পের উন্নতি। ভোগ্যপণ্য যদি যথেষ্ট উৎপাদন না হয়, তা হলে জীবিকার মান উন্নত হতে পারবে না। এর জন্য প্রয়োজন বহু বহু কলকারখানা স্থাপন, নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদন এবং সেই সব দ্রব্যের জন্য স্বদেশে ও বিদেশে বাজার পাওয়া। এতে শিল্পপতির অর্থলাভ হবে, শ্রমিকের জীবনের মান উন্নত হবে, দেশের বেকার সমস্যা নিবারিত হবে। আমাদের মহামান্য মহামাত্য আজ সরকারের নীতি আলোচনা করবেন। আশা করি সেই নীতি সকলের তুষ্টি সাধন করতে পারবে।

বলা শেষ করে রামভরস আসন গ্রহণ করল। বজ্রধ্বনি শোনা গেল সমবেত জনতার করতালিতে।

মহামাত্য উঠে দাঁড়াল।

আবার করতালি।

জয়ধ্বনি উঠল।

হাত তুলে জনতাকে থামতে বলে ভাষণ আরম্ভ করল মহামাত্য।

দেশবিদেশের উন্নতির কারণ বিশ্লেষণ করে মহামাত্য বলল, আমাদের এই দরিদ্র ও অনগ্রসর দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে হলে চাই শিল্পের উন্নতি। বিরাট বিরাট শিল্প গড়ে তুলতে হবে। আমাদের গুরুজি বলেন, কুটির শিল্পই দেশের উন্নতির পথ। আমরা দুভাবেই পরীক্ষা চালাব। একদিকে যেমন ভারী শিল্প গড়ে তুলব তেমনি কুটির শিল্পের দিকেও নজর দেব। ভারী শিল্প গড়ে তুলতে হলে চাই অর্থ। সরকারী কোষাগারে এত অর্থ নেই যা দিয়ে আমরা ভারী

শিল্প সরকারী প্রচেষ্টায় গড়ে তুলি, সেজন্য প্রয়োজন বে-সরকারী উদ্যোগ এবং বিদেশী অর্থ সাহায্য। তাই এদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখছি আমরা। কেবল মাত্র শিল্প গড়লেই হবে না, শিল্পে শান্তি-রক্ষার দায়িত্বও আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য আমরা বিশেষ আইন প্রণয়ন করছি।

করতালির শব্দে মুখরিত হল শ্রমিক ভবন।

মহামাত্য থামল।

টেবিলের ওপর থেকে জলের গেলাস তুলে নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে জল খেলো।

শিয়ালিয়া কাতর নয়নে তাকাল মহামাত্যের দিকে। মহামাত্য তার নীরব বক্তব্য বুঝতে পেরে চোখ টিপে বুঝিয়ে দিল, কোথাও কোন অসুবিধা হবে না।

মহামাত্য আবার বলতে লাগল।

শিল্পে প্রয়োজন অর্থ, প্রয়োজন কাঁচামাল, প্রয়োজন শ্রম ও পরিচালনার দক্ষতা। আমাদের বলতে গেলে সবই আছে, শুধুমাত্র adjustment দরকার, বিশেষ করে শ্রম ও অর্থের। যদি শ্রমিক-মালিকের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়, যদি strike, lockout প্রভৃতি অশান্তি দেখা দেয়, তা হলে আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। সেজন্য, শ্রমিকরা যেমন মালিকদরদী হবে, তেমনি আশা করি মালিকরাও শ্রমিকদরদী হবেন। যাতে কোনরূপ অশান্তি দেখা না দেয়, দিলেও যাতে তা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সালিশের মাধ্যমে মীমাংসিত হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় আইনের খসরা আমরা তৈরী করছি। সে আইন কার্যকরী হলে উভয় পক্ষই উপকৃত হবে।

আবার করতালির ধ্বনিতে মুখরিত হল শ্রমিক ভবন।

মহামাত্য থামল।

করতালি থামলে আবার বলতে লাগল, আমাদের বৈদেশিক নীতি হল সবার সঙ্গে সৎভাব রক্ষা করে চলা। সেদিকে আমরা

অনেকটা অগ্রসর হয়েছি। আমাদের এই নীতিতে পৃথিবীর তাবৎ দেশ আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। নতুন ভারী শিল্প গড়তে সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। শুধু শ্রমই নয়, অন্যান্য বিষয়েও অনেক কিছু করবার আছে আমাদের। সেগুলো যথাস্থানে আলোচনা করব। বর্তমানে কি ভাবে দেশের উন্নতি হয় সেই চিন্তায় আমরা মগ্ন। আশা করি আমাদের এই মহাযজ্ঞে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা পাব। আপনারা কঠিন পরিশ্রম করতে নিশ্চয় পশ্চাদ্‌পদ হবেন না। জয় পাতনের জয়।

মহামাত্য বক্তব্য শেষ করে আসন গ্রহণ করল। করতালি শোনা গেল বজ্রনির্ঘোষে।

পরবর্তী বক্তা গিরিধারীলাল। উঠেই বলল, আমার প্রিয় বন্ধুগণ, বিশেষ করে শ্রমিক বন্ধুগণ, আপনারা আমাদের মহামাত্যের বক্তব্য শুনলেন। আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। দু'একটা কথা বলে শেষ করতে চাই। সেই বিশেষ কথা হল, শ্রমিকরা ধর্মঘট করবেন কি না? কেউ বলবেন নায্য দাবী আদায়ের জন্য ধর্মঘট হল উপযুক্ত পথ, আবার কেউ বলবেন ধর্মঘট মোটেই সমস্যা সমাধানের পথ নয়। আমিও বলব দু'দলই ঠিক বলেছেন, তবে মাঝে একটু কিন্তু থেকে গেছে। ধর্মঘট আমিও চাই না, তবে নিরুপায় মানুষ যদি ধর্মঘট করে তার জন্য তাকে দোষারোপ করতেও চাই না। তবে কখন ধর্মঘট প্রয়োজন আর কখন তা অপ্রয়োজন তাই হল বিবেচ্য। বর্তমানে যে সব শ্রমিকসংগঠন কাজ করছে তারা এই অতি প্রয়োজনীয় যুক্তিটি অগ্রাহ্য করে চলতে চাইছে। সেজন্যই আমরা পাতন জাতীয় শ্রমিক-সংগঠন নামে নতুন একটি শ্রমিকমঙ্গল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি। আপনারা দলে দলে আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। আমরা মালিক-শ্রমিক বিরোধ সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা করতে চাই এবং সত্যই ধর্মঘট প্রয়োজন কি না তা আমরাই নির্ধারণ করব।

ফিস্ ফিস্ করে মহামাত্য বলল, রাইট্।

গিরিধারীলাল আবেগের সঙ্গে বলল, আমাদের কর্তব্য হল শ্রমিক মঙ্গল সাধন, আমাদের লক্ষ্য হল শ্রমিকের জীবনমান উন্নত করা, সেদিকেই আমরা নজর দিয়েছি। আপনাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমরা চাই। আশা করি তা পাব। জয় পাতনের জয়।

গিরিধারীলাল রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বসে পড়ল।

করতালি শোনা গেল আবার।

উঠল গিদ্ধরলাল শিয়ালিয়া, বলল।

মাননীয় মহামাত্য ও উপস্থিত বন্ধুগণ!

শিয়ালিয়ার গলায় আটকে গেল পরবর্তী বক্তব্য। তাড়তাড়ি গেলাস থেকে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিল।

আমি মালিক পক্ষ। আমার বহুত দরদ আছে শ্রমিক মজুরদের ওপর। তাদের কষ্ট যাতে না হয় সেদিকেও আমার নজর আছে। তাদের মজুরী দিতে আমরা কার্পণ্য করি না। সমগ্র পাতনরাজ্যের মাথা প্রতি মাসিক আয় মাত্র এগার টাকা, আর আমি প্রত্যেক মজুরকে দৈনিক বেতন দেই সোয়া রুপিয়া। ভেবে দেখুন আমরা মজুরী কত বেশী দেই। কিন্তু শ্রমিক ভাইরা তবুও গাফিলতি করে, production কমিয়ে লাভ করতে চায়। এসব মোটেই উচিত নয়। এসব দেশদ্রোহিতার সামিল। এই সব দেশদ্রোহিতা যাতে প্রশ্রয় না পায় সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আজ শ্রমিকরা যা চিন্তা করছে, আজ তারা যেভাবে production নষ্ট করছে, এভাবে চললে ভবিষ্যতে শিল্প ধ্বংস হবে। দুনিয়ার বাজারে পাতনের মাল পৌঁছবে না, prestige নষ্ট হবে। এসব চিন্তা করে আপনাদের ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ করা উচিত। আমাদের ভাই গিরিধারীলালজি যা বললেন তাতে আমার যথেষ্ট সম্মতি আছে। এই নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে দু' দশ লাখ রুপেয়া দরকার হলে আমরাই তা দেব। গিরিধারীলালজির জয় হোক। আমাদের মহামাত্য যা বললেন তাও

আপনারা শুনেছেন। নতুন করে বলার কিছু নেই। নতুন যে আইন প্রণয়ন হচ্ছে তাতে মালিকদের সর্বনাশ যাতে না হয় সেদিকে সরকারের নজর যেন থাকে। আমার আর কিছু বলার নেই। জয় পাতনের জয়।

বলা শেষ করে হাঁপাতে লাগল গিদ্ধরলাল।

আহ্বায়ক ফেকুরাম আগরওয়ালা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করল।

জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ভরে উঠল।

মহামাত্য মুনিয়ার হাত ধরে ডায়াস থেকে নামল, সোজা গিয়ে উঠল গাড়িতে।

সোফার, অফিস চল। আদেশ দিল মহামাত্য।

সচদেবের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, এবেলায় আর কোন প্রোগ্রাম আছে কি না। মহামাত্যের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সে জানাল, এবেলায় আর কোন এনগেজমেণ্ট নেই।

গাড়ির মিছিল ছুটল পাতনরাজ্যের সদর কার্যালয়ের দিকে।

মহামাত্য ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, এগারটা বাজতে চলল অথচ এখনই আবার অফিসে না বসলেই নয়। কাজের আর শেষ নেই। দম ফেলবার অবসর পাচ্ছি না।

মুনিয়া বলল, তুমি অফিসে বস, আমি চকোলেট মিল্ক পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটু জিরিয়ে নিয়ে তবেই ফাইলপত্র দেখবে, কেমন!

মহামাত্য মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

অফিসের দরজায় তখন ভীড় জমেছে। ভীড় ঠেলে মহামাত্য ঢুকলো তার অফিসে। গাড়ি নিয়ে মুনিয়া ফিরে গেল মহামাত্য ভবনে।

মহাসচিব দ্বারে অভ্যর্থনা জানাল।

বাতাবরণ গৃহের নিভৃত কক্ষে মহামাত্য বসতেই ট্রে সাজিয়ে নানাজাতীয় বিদেশী পানীয় নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো খাস বেয়ারা

অভিরাম। মহামাত্য পছন্দমত পানীয় গেলাসে নিয়ে ধীরে ধীরে গলায় ঢেলে দিয়ে ডাকল, মিস্টার ফেচুসিং।

দরজার পরদা নড়ে উঠল।

বিশাল দেহী ফেচুসিং ফাইল হাতে হাজির হল সামনে।

আজ ফরেন ডিপ্লোম্যাটরা আসবে। তাদের সঙ্গে যে সব আলোচনা হবে তার খসরা তৈরী হয়েছে?

ফেচুসিং মাথা নত করে বলল, হাঁ স্যার।

বিশেষ করে খাদ্য বিষয়ের আলোচনাটা আজই শেষকরতে চাই। সেটা যেন ঠিক থাকে।

খাদ্যসচিবকে পরিসংখ্যন আনতে বলেছি। এখুনি ফোন করে-ছিলাম, তিনি আসছেন।

বিরক্তির সঙ্গে মহামাত্য বলল, এতক্ষণ আসা উচিত ছিল।

আপনি অফিসে অনুপস্থিত ছিলেন বলেই এতক্ষণ তাকে ডাকি নি। আপনার গাড়ির শব্দ পাওয়া মাত্র তাকে ডেকেছি। দু'চার মিনিটের মধ্যেই উনি আসবেন আশা করছি।

আশা করছ। সাবাস ফেচুসিং! আশা নিয়েই মানুষ বাঁচে। তুমিও বাঁচবে, আমিও আশার দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে বাঁচব।

পর্দা নড়ে উঠল।

কে দেখতো।

গোরওলা ধীরে ধীরে প্রবেশ করল।

খাদ্য সম্বন্ধে তোমাদের কাগজপত্র তৈরী হয়েছে গোরওলা? জানতে চাইলো মহামাত্য।

হাঁ স্যার।

গোরওলা চেয়ার টেনে বসে ফাইল খুলে ধরল মহামাত্যের টেবিলে।

ফাইল ওল্টাতে ওল্টাতে মহামাত্য বললো, দশলক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি এবছরে!

এই রকমই আশঙ্কা আছে।

তা হলে বিদেশ থেকে এই পরিমাণ খাদ্য আনাতেই হবে?

উপায় দেখছিনা স্যার। তবে।—থামল গোরওলা।

তবে কি?

দেশে যাতে অধিক উৎপাদন হয় তার জন্য কিছু পরিকল্পনাও দরকার মনে করছি।

বিরক্তির সঙ্গে মহামাত্য বলল, সেটা তো পরের কথা।

ঠিক। তবে বিদেশ থেকে আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে যদি এদেশের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয় তা হলে ভবিষ্যতে আর অপরের দরজায় হাত পাততে হবে না।

তা ঠিক। কিন্তু একটা কথা কি ভেবে দেখেছ গোরওলা? আমরা খাদ্য আমদানী করব সেই সব দেশ থেকে যে দেশে খাদ্য উদ্বৃত্ত। ওসব দেশে উদ্বৃত্ত খাদ্যসম্ভার দিয়ে তারা গরু ঘোড়ার পেট ভড়াতো, আর সেইটেই এখন মহৎ কাজে দরকার হচ্ছে আমাদের দেশের মানুষের পেট ভড়াতে। ভেবে দেখ এটা কত বড় মহৎ কাজ।

তা বটে। মাথা নাড়ল গোরওলা।

ধর বিদেশ থেকে খাদ্য আনতে হবে। তাতে উদ্বৃত্ত খাদ্যের অপব্যবহার বন্ধ হবে। সমুদ্রপথে খাবার আসবে, তারজন্য জাহাজ কোম্পনীর একটা আয় হবে। সেই মাল মজুত করতে দেশের মজুত-দার, পরিবহন ইত্যাদিও উপকৃত হবে। তারপর সুষ্ঠুভাবে সেগুলো বিতরণ করতে হলে বহু ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে তারজন্য। তাতে বহুলোকের উপার্জন বৃদ্ধি পাবে। কর্মসংস্থানও হবে। আর খাদ্য সংগ্রহই বড় কথা নয়। খাদ্যের সঙ্গে মিত্রতাবন্ধন সৃষ্টি হবে বিদেশের সঙ্গে।

অবশ্যই। কিন্তু দু'টাকা মূল্যের খাদ্যশস্যের মূল্য যে দশটাকা দিতে হবে।

মানুষের সর্বাধিক প্রয়োজন আহার্য। তার মূল্য দশ হোক আর বিশ হোক তাতে কিছুই এসে যাবে না।

মুদ্রাস্ফীতি হবে স্যার।

দেশে মুদ্রাই নেই তার আবার স্ফীতি। কাগুজে টাকার দাম কি? ছাপাবে আর দেবে।

বিদেশীরা তো তা শুনবে না। স্বর্ণমানে মূল্য চাইবে।

বর্তমানে সে চিন্তা করে লাভ নেই। যবন দেশে আমাদের প্রচুর অর্থ সঞ্চিত আছে। তা থেকেই খাদ্যমূল্য দিতে পারব।

দেশের চাষীরা অধিক উৎপাদনে উৎসাহ পাবেনা।

সেটাও বিবেচনা করেছি। আমাদের দেশে অধিক উৎপাদনের অর্থ হল অপব্যয়। তোমরা কি চাও দেশে অপব্যয় ঘটুক। আমি মিতাচারী করতে চাই আপামর জনসাধারণকে। তার ওপর আরও একটা বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে। আমাদের খাদ্য যারা জোগাবে তারা হল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি। তাদের সঙ্গে সৌহৃদ্য রাখতে হলে খাদ্য আমদানী অপরিহার্য। ওদের দেশে যা অখাদ্য তাই আমরা নিচ্ছি মূল্য দিয়ে, এতে ওদের সহানুভূতি ও অন্যান্য বৈষয়িক সাহায্য নিশ্চয়ই পাব। পাতনরাজ্যের লোক খেতে পেলেই বর্তে যাবে। তারা চিন্তাও করবে না এই খাদ্য কোথা থেকে কী দামে এসেছে। সে খাদ্য, অখাদ্য হোকনা অপর দেশের, আমার দেশে তা নয়। সবদিক ভেবে কাজ করতে হয় গোরওলা। তুমি মনে করনা তোমার চেয়ে আমি কম দেশদরদী। আমাদের একটা আদর্শ আছে, চাকুরিজীবীর তা নেই।

গোরওলার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। বিনীত ভাবে বলল, তা ঠিক।

কোনটা ঠিক?

আপনার দেশপ্রেম, নিখুঁত, নির্ভেজাল।

মৃদু হাসি দেখা দিল মহামাত্যের ঠোঁটে।

ফাইলের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, আজ বেলা দেড়টায় মার্কিন আর ভালুক রাজ্যের রাষ্ট্রদূতরা আসবেন। তুমি খাদ্যের জন্য যে পরিকল্পনা তৈরি করেছ তা নিয়ে দেড়টার সময় হাজির থেকো। আমি মোটামুটি দেখলাম, বাকিটুকু তুমি তাদের কাছে বিশ্লেষণ ও ব্যাখা করবে, কেমন ?

হাঁ স্যার।

মহামাত্য কলিংবেলের বোতাম টিপলো।

গোরওলা ধীরে ধীরে ফাইল গুঁটিয়ে বেরিয়ে গেল মহামাত্যের কক্ষ থেকে।

প্রবেশ করল খাস বেয়ারা অভিরাম।

শিল্পসচিব। সংক্ষেপে উচ্চারণ করল মহামাত্য।

অভিরাম পুরানো লোক। মহামাত্যের বক্তব্য বুঝতে পেরেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ফ্ল্যাস্ক নিয়ে ঘরে ঢুকলো মুনিয়া, পেছনে বজরংবলী।

এখন আর দুধ খাব না মুনিয়া। লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। শিল্পসচিবের সঙ্গে কথা বলেই বাড়ি যাব। তুই বরং এই ফাইলটা দেখে কিছু নোট দে। এই যে মিস্টার সামারসল্ট। তোমার ফাইল রেডি ?

হাঁ স্যার, বলে এগিয়ে এল সামারসল্ট। সামারসল্ট যবন আমলের পাতনিক যবন। এর পূর্বপুরুষের কেউ ছিল যবন, আর মাতৃকুলের সবাই ছিল পাতনীয়। উভয় দেশের রং-এর মিশ্রনে যে রংটি লাভ করেছে তা নিকষ কালও নয়, আবার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণও নয়। বিশাল উদর, চ্যাপ্টা নাক আর কেশবিহীন তার মাথাটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সামারসল্ট ব্যাক্তিগতভাবে ভালমানুষ। যবন দেশে বহুবার ঘুরে এসেছে, যাবনিক ভাবধারায় বেশ অভ্যস্ত। বিভিন্ন সার্ভিসে যোগ দিয়েছিল যবন যুগে। যবন এদেশ পরিহার করলেও সামারসল্ট এদেশ পরিত্যাগ করতে পারেনি। উভয়দেশেই

সে অপাংক্তেয়। তবুও এদেশে রুজি রোজগারের জন্য চিন্তা করতে হচ্ছে না, যবন দেশে বেকার থাকার চেয়ে এও ভাল। তবে মিসেস সামারসল্ট ও তার পুত্রকন্যারা যবন দেশেই বাস করে। তার গৃহের সংবাদ নিয়ে জানা গেছে, মিসেসের স্থান দখল করেছে এখন তার ভাঙ্গী চাকরাণী মছুয়া। সামারসল্ট মাঝে মাঝে যবন দেশে টাকা পাঠায়, এর বেশী আর কিছু করণীয় তার নেই। মহামাত্য সামারসল্টকে বিশেষ অনুগ্রহ করে। কেন করে তা জন সমাজে অজ্ঞাত।

সামারসল্ট চেয়ার চেপে বসতেই মহামাত্য জিজ্ঞেস করল, যবনদের সঙ্গে যোগাযোগটা তুমিই রক্ষা করছ?

আপ্যায়িতভাবে সামারসল্ট বলে, স্যার যা বলেছেন। আপনারই কৃপা।

জান তো, দেশে হেভী ইন্‌ডাস্‌ট্রি গড়তে চাই আমি?

জানি স্যার।

যবন সাহায্য ভিন্ন তা সম্ভব নয়।

তাও জানি স্যার।

শাপুরে জমি নেওয়া হয়েছে। সেখানে ইস্পাতের কারখানা তৈরি স্থির। কিন্তু যন্ত্রপাতি প্রয়োজন।

তাও জানি স্যার।

যন্ত্রপাতি দিতে স্বীকার করেছে যবন দেশ। বিনিময়ে আমাদেরও দিতে হবে কিছু। অবাধগতিতে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের লভ্যাংশকে তাদের দেশে যেতে দিতে হবে।

এতো নায্য কথা কথা স্যার।

আমিও তাই মনে করি। উপরন্তু তাদের দেশে আমাদের অনেক টাকা জমা আছে তারও একটা হিল্লে হবে এবার।

অবশ্যই।

তোমার স্কীম যেন তৈরি থাকে। ওদের মনে প্রত্যয় জন্মাতে

কোন ত্রুটি যেন না থাকে। শোন সামারসল্ট, বেলা দেড়টায় আসবেন রাষ্ট্রদূত, সে সময় তুমি হাজির থেকো।

নিশ্চয় স্যার নিশ্চয়।

মুনিয়া তোর কাজ হল ?

হাঁ ড্যাডি। এবার খেতে চল। সাড়ে বারোটা বাজতে চলল।

সামারসল্ট ফাইল গুঁটিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

মহামাত্য বলল, যাই বল সামারসল্ট, যবন একটা জাত বটে। ওদের কালচার, ওদের দেশপ্রেম, ওদের জাতীয়তাবোধ আর প্রতিশ্রুতি পালন ঐতিহাসিক ব্যাপার। ওদের দেশেই আমার প্রথম জীবন কেটেছে। ওদের কোন রাজনৈতিক অধিকার দিতে আমি চাইনি ঠিকই, কিন্তু ওদের অনুকরণ না করে উপায় নেই। আমাদের দেশের উন্নতি যদি করতেই হয়, তা হলে ওদের আদর্শই অনুসরণ করা উচিত।

যা বলেছেন স্যার। আমার মিসেস্ এই জন্যই এদেশে আসতে চান না। বেশ আছেন। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে বড় হতে পারবে। লেখাপড়া শিখলেই, বাই জোভ, আপনার পরমায়ু অক্ষয় হলে ওদের পেটের ভাতের জন্য চিন্তা করতে হবে না কখনও।

মহামাত্য মৃদু হেসে মুনিয়ার হাত ধরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পেছন পেছন বেরিয়ে এল সামারসল্ট তার ফাইল পত্র নিয়ে।

দেড়টা না বাজতেই মহামাত্য উপস্থিত হল তার সদর দপ্তরে। তার কক্ষটি নতুন করে সাজানো হয়েছিল ইতিমধ্যে। আসন গ্রহণ করে বারবার ঘড়ি দেখছিল মহামাত্য।

সর্বপ্রথম এল যবন রাষ্ট্রদূত।

মহামাত্য সাদরে হাত বাড়িয়ে তাকে বসতে বলল। প্রশ্ন করল, ইওর একসেলেন্সির কুশল তো ?

রাষ্ট্রদূত হোয়াইটরোগ করমর্দন করতে করতে বললেন, কুশল, আপনার ?

মহামাত্য হেসে বলল, কুশল বললেই সব কথা ফুরিয়ে যায়। সমগ্র পাতনরাজ্যের চিন্তা মাথায় ঘুরছে, কুশল কখনও হতে পারে কি মিস্টার রোগ ? রাজমুকুট মাথায় দিলেই তো রাজা হয় না, প্রজার সুখ দুঃখের মুকুট মাথায় নিতে পারলেই রাজা হওয়া যায়। আপনার দেশের মহামাত্যকে জিজ্ঞেস করলেই বুঝতে পারবেন, একটা রাজ্য পরিচালনা কত বড় কঠিন কাজ। আপনাদের দেশের রাজার মত আমাদেরও রাষ্ট্রপতি আছেন। এদের চিন্তা করতে হয় না সাধারণ মানুষের কথা। এরা কত সুখী বলুন, আর রাজ্যের সব চিন্তা মহামাত্যের। নেয়ে খেয়ে শুয়েও শান্তি নেই।

ঠিকই বলেছেন মিস্টার অমিত্রারি। কিন্তু রাষ্ট্রদূতের কাজও নেহাত সুখের নয়। আপনার দেশে আমি আছি, আপনাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে হয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে এ-দেশের প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করার কঠোর কঠিন কর্তব্য। সঙ্গে সঙ্গেই বিচার বুদ্ধি দিয়ে সে সব ঘটনা বিশ্লেষণ করা এবং তার যথাযথ রিপোর্ট স্বদেশে পাঠানো। একি কম কষ্টসাধ্য কাজ !

তা বটে। রাত ন'টার পর দেশ বিদেশের রাষ্ট্রদূতদের রিপোর্ট পড়তে পড়তে যখন চোখ জড়িয়ে আসে তখন ভাবি, এত সংবাদ সংগ্রহ কি করে সম্ভব হল। অবশ্য আরও ভেবেছি, এসব সংবাদ জানবার প্রয়োজনই বা কি। তবুও রাষ্ট্রনীতি হিসেবে বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত রাখতে বাধ্য হয় পৃথিবীর সব দেশ-ই। যাক ওসব কথা, আপনার মিসেস তো গেছেন হোমে, কবে আসছেন তিনি ?

শীগ্‌গীরই আসবেন। বড় মেয়েটাকে হোস্টেলে রেখে আসবেন, ছেলেটাকে তার য়ান্টির হেপাজতে দিতে হবে। আমাদের চাকরি বদলীর চাকরি। আজ এদেশে কাল ওদেশে। যার ফলে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে পারি না। বার বার ব্রেক, তার ওপর

বিভিন্ন দেশের ভাষা আর কালচারের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো মোটেই সহজ কাজ নয়। তাই শিশুদের দেশেই রাখতে হয়। মিসেসকে সব সময় দৌড়দৌড়ি করে ব্যালান্স রক্ষা করতে হয়। পারিবারিক জীবনটা সত্যি সত্যি যন্ত্রণাময় হয়ে ওঠে।

মহামাত্য হেসে বললো, দেশ সেবা করতে হলে এসব সহ্য করতে হয় মিস্টার রোগ। আমার তিনজন কাজিনকে পাঠিয়েছি রাষ্ট্রদূত করে বিভিন্ন দেশে। তাদের অনুযোগ শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে গেছি। আমার পরিবারের আমি আর মুনিয়া বাদে সবাই রয়েছে বিভিন্ন দেশে। স্ত্রীর পিতৃকুলের একজনও এদেশে নেই, সবাই বাইরে।

এদেশেও রাখতে পারতেন ?

পারতাম ঠিকই, কিন্তু তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করলে অনেক আপত্তি উঠত। তার চেয়ে ফরেন সার্ভিসে পাঠালে ওসব হাঙ্গামা থাকে না। আর উপার্জনের দিক থেকে ফরেন সার্ভিস লোভনীয়ও বটে। আমি আগে চেয়েছি পরিবারের পুনর্বাসন, কিন্তু পুনর্বাসন করেও শান্তি নেই। ওরা ওদের প্রাপ্যের চেয়েও বেশি পেয়েছে, তবুও তুষ্ট করতে পারি নি। আপনি হয়ত বলবেন নেপোটিজম্, আমি বলব তা নয়, কারণ, বিদেশের সংবাদ সংগ্রহ, বিদেশের সঙ্গে সখ্যতা বজায় রাখতে হলে নিজের লোক প্রয়োজন। ওরা যত বেশি আমার সম্বন্ধে প্রচার করবে, অপর বেতনভূক লোকেরা তা করবে না। তাই নিজের স্বার্থে ও দেশের স্বার্থে আমার পরিবারের সঙ্গে যুক্ত সবাইকেই কাজ দিয়েছি ফরেনে।

মিস্টার হোয়াইটরোগকে চিন্তিত মনে হল।

মহামাত্য হেসে বলল, আপনাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে ?

খাস বেয়ারা অভিরাম চা-খাবারের ট্রে রাখল সামনে।

বাধা দিয়ে রোগ বললেন, এখুনি লাঞ্চ খেয়ে এসেছি।

সমান্য চা !

সহ্য হবে না।

ড্রিংক !

তাও লাইট।

অভিরাম চায়ের ট্রে তুলে নিয়ে গেল। তখুনি ফিরে এল ড্রিংকের ট্রে হাতে করে।

মহামাত্য নিজের হাতে গেলাসে ঢেলে পরিবেশন করল।

রোগ সামান্য আপত্তি করতেই বলল, না না আপত্তি করবেন না। এটা খাস ফ্রান্স থেকে আনা। এরজন্য বছরে আমরা পঁচিশ কোটি রুপেয়া দেই ফরাসীকে দেশকে।

সত্যি ?

নিশ্চয়। ফিগারটা আরও একটু বেশি হতে পারে। অডিট-রিপোর্ট দেখা হয় নি।

মহামাত্য বেল টিপল।

ছুটে এল বেয়ারা।

মিস্টার সামারসল্ট।

পর্দা ঠেলে সামারসল্ট ভেতরে প্রবেশ করেই শুভেচ্ছা জানাল।

সামারসল্ট, আমাদের শাপুর ইস্পাত প্রজেক্টটা দেখাও তো হিজ একসেলেন্সিকে।

ফাইলের পাতা উল্টে সামারসল্ট ফাইলটা রাখল রোগের সামনে।

রোগ পাতার পর পাতা উল্টে বললেন, সব ঠিক আছে। আমাদের হিজ ম্যাজেসটির সরকার আপনাদের এই প্রজেক্ট মঞ্জুর করেছেন। তবে একটা ঘটনার জন্য কাজটা মোটেই এগোয় নি।

কি ঘটনা ?

আমাদের ইয়াংকি বন্ধুরা একটা আপত্তি তুলেছেন।

তাদের সঙ্গে এই স্কীমের কোন সম্পর্ক তো নেই ইওর একসেলেন্সি।

আপনি তো জানেন যবন দেশ আর মার্কিন মুলুকের স্বার্থ একই সুতোয় বাঁধা। তাদের কোন অসুবিধা ঘটিয়ে আমরা কিছুই করতে পারি না।

তা জানি। কিন্তু তাদের অসুবিধা কোথায়?—বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল মহামাত্য।

আজ্ঞে মহামাত্য, সেটা বলতেই আমি এসেছি। সেই অসুবিধে দূর হলেই আমাদের স্কীম কার্যকরী হবে।

বলুন তা হলে।

আপনাদের অনেকগুলো বন্দুকের কারখানা আছে।

আছে। সবগুলোই অঙ্গরাজ্যে।

বন্দুক প্রচুর তৈরী হচ্ছে সেখানে।

তা হচ্ছে।

আপনাদের চাহিদার চেয়েও বেশি বন্দুক তৈরী হচ্ছে।

তাও ঠিক।

সেই বন্দুক দিয়ে কি করছেন?

বিক্রি করছি।

কোথায়?

আরসুলারাজ্যে, মালয়ে।

আপনি জানেন আরসুলারাজ্য এই বন্দুক ব্যবহার করছে মার্কিনদের বিরুদ্ধে?

অত সংবাদ আমি জানি না।

জানা উচিত। দেশের মহামাত্যকে সর্বজ্ঞ হতে হয়।

অত চিন্তা করে দেখি নি।

বন্দুক বিক্রি করা বন্ধ করতে হবে মহামাত্য।

তারপর?

আর আপনাদের বাজারে দেশী বন্দুক বিক্রি সংযত করতে হবে। আমাদের দেশের বন্দুক-শিল্প গোল্লায় যাবার উপক্রম। তাকে রক্ষা

আপনাদের সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে বহু সমস্যা, তার মধ্যে বড় সমস্যা হল খাদ্য। সে সমস্যা মেটাতে আমরা সব সময়ই রাজি।

আমরা কিন্তু কোন রাজনৈতিক সর্ত মানতে রাজি নই।

নিশ্চয়। রাজনৈতিক সর্ত দিয়ে আমরা সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করি নি। মার্কিন আদর্শও তা নয়। তবে আমরা চাই দুই দেশের ভাব, কৃষ্টি, শিল্পকলা, জ্ঞানবিজ্ঞানের আদানপ্রদান। সে কাজ করতে আমরা সর্বদাই আগ্রহী ও প্রস্তুত। আপনাদেরও সে বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন আপত্তি নেই?

আনন্দের সঙ্গে আমরা আপনাদের এই সহযোগিতাকে গ্রহণ করব। আরও একটা বিষয় রয়েছে, সেটা হল এদেশে শিল্প প্রসার। মূলধনের অভাবে আমরা তা পারছি না। আমরা চাই বিদেশী মূলধন নিয়োগ। এ বিষয়ে আপনারা কতটা সাহায্য করতে পারেন সেটাও জানতে চাই।

মার্কিন দূত হেসে বললেন, এ বিষয়েও আমরা চিন্তা করছি। মার্কিন সরকার মূলধন খাটাতে রাজি কিন্তু নিরাপত্তার প্রশ্ন রয়েছে। আমরা যদি মনে করি পাতন রাজ্যে মূলধন খাটালে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না, তা হলেই তা করব। ইতিমধ্যে আমরা উৎপাতন রাজ্যে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেছি, সেদেশকে শিল্পসমৃদ্ধ করতে মোটেই ত্রুটি করছি না। আপনারা যদি সে গ্যারান্টি দিতে পারেন তা হলে মূলধন নিয়োগে আমাদের সরকার কোন আপত্তি করবেন না।

গ্যারান্টি তো সব সময়ই দেওয়া আছে। আপনারা লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করুন। আমি সব দায়িত্ব নিয়ে ব্যবস্থা করব। মূলধন-খাতের আয় যাতে নিরাপদে আপনাদের দেশে পৌঁছয় তাও করব। বর্তমানে খাবারের ব্যবস্থাটা করুন, তা হলেই আমাদের গুরুতর চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে পারবেন।

সে ব্যবস্থা শেষ হয়েছে। আপনাদের দুশ্চিন্তা করতে হবে না। তবে মাল আসবে আমাদের জাহাজে।

আমাদের জাহাজে পাঠাতে আপত্তি কি ?

খাতককে মহাজনের দু' চারটে সর্ত মানতে হয় বইকি।

তা বটে।

বেল টিপল মহামাত্য।

বেয়ারা আসতেই বললো, গোরওলা।

গোরওলা দরজার সামনেই ছিল। ফাইলটা হাতে করে এসে দাঁড়ালো সামনে।

তোমার স্কীমগুলো নিয়ে হিজ একসেলেন্সির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কর।

মার্কিন দূত আপত্তি জানিয়ে বললেন, আর আলোচনার কিছু নেই মহামাত্য। সব কথাই তো শেষ হল। ফাইল-টাইলগুলো আমি সহ্য করতে পারি না। ওসব নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের ট্রেড কমিশনারকে পাঠিয়ে দেব। তার সঙ্গেই আলোচনা করে যা ভাল মনে করবেন তা জানাবেন। আমি এসে তার রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করব। আচ্ছা আসি, শুভরাত্রি।

এবার এল ভালুক রাজ্যের রাষ্ট্রদূত।

গদগদভাবে মহামাত্য তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে চিরাচরিত প্রথায় কুশল জানতে চাইল।

কুশল তো বটেই, আপনার কুশলও প্রার্থনা করি মিস্টার মহামাত্য, বললেন সেতাভস্কি।

পরম করুণাময়ের আশীর্বাদে ভালই আছি ইওর এক্সেলেন্সি।

আমাদের মন্ত্রীপ্রধান, রাষ্ট্রপতি তথা আপনার দেশবাসীর মঙ্গল কামনা করেছেন।

মহামাত্য হেসে বলল, আশা করি আমাদের শুভেচ্ছাও আপনাদের দরজায় পৌঁছবে।

সেতাভস্কি বিনীতভাবে বললেন, আপনি আমাদের রাজ্য পরিভ্রমণে যাবেন এরকম পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমরা অবহিত হয়েছি।

আশা করি আপনি এবার দিন স্থির করে আমাকে জানাতে বিলম্ব করবেন না।

আমিও আপনাদের দেশ দেখে নিজেকে ধন্য করতে চাই। তবে কিছুকাল যাবত উৎপাতন রাজ্যের রাক্ষসরা বড়ই বিব্রত করে তুলেছে। আমার জন্মভূমি আক্রান্ত হয়েছে, কারণ সেই অঙ্গরাজ্যটি রাক্ষস-প্রধান। সেখানকার শতকরা সত্তর জনই রাক্ষস। আমাদের দাবী হল ওটা আমাদের রাজ্য আর উৎপাতন রাজ্য বলছে ওটা ওদের রাজ্য। এই নিয়ে গোলমাল চলছে কিছুকাল যাবত। আইন অনুসারে রাজ্যটি আমাদের। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এ সমস্যার কথা আমরা জানি। জানি আপনাদের ঐ অঙ্গরাজ্যটি পাতনরাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেজন্য আপনাদের স্বার্থরক্ষা করতে আমরা সর্ব সময় প্রস্তুত।

মহামাত্য ডাকলো সচদেবকে আর সামারসল্টকে।

তারা আসতেই বললো, আমাদের বৈষয়িক উন্নতির স্কীমটা হিজ একসেলেন্সিকে দাও।

সামারসল্ট ইতস্তত করে ফাইলটা বের করল।

আরও ইস্পাত কারখানা চাই। নইলে দেশের উন্নতি তথা বেকার সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। তাই আপনাদের দ্বারস্থ হচ্ছি। আমাদের স্কীমগুলো দেখুন। আশা করি এতে আপনাদের আপত্তি হবে না।

এ বিষয়ে আমি আমাদের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করব। মতামত পরে জানাব। আমরা চাই পাতন আর ভালুকরাজ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সৃষ্টি হোক। আমাদের দেশ থেকে একদল লোকশিল্পী আসবেন আপনার রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত পরিবেশন করতে। আমাদের বন্ধুত্ব দৃঢ় করার পথে আমরা এগিয়ে যেতে পারব এইভাবেই।

উত্তম প্রস্তাব। আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমরাও

পাঠাব একদল পাতনীয় নৃত্যশিল্পীকে আপনাদের দেশে। তারাও আপনাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পাতনীয় কৃষ্টি ও রুচির পরিচয় দেবে।

সেতাভস্কি উৎফুল্লভাবে বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়। এ বিষয়ে আমি আমাদের সরকারী অভিমত শীগ্‌গীরই জানাতে পারব আশা করছি। আজকের মত আসি, কেমন। নমস্কার।

সবাই চলে যেতেই মহামাত্য সিগারেট ধরাল।

পর্দা ঠেলে সচদেব ঢুকল।

কি সংবাদ?—প্রশ্ন করল মহামাত্য।

রাক্ষস রাজ্য থেকে দলে দলে মানব আসছে আমাদের সীমান্ত পেরিয়ে।

তাইতো। উৎপাতনের অত্যাচার দিন দিন অসহ্য হয়ে পড়ছে। কি করা যায় সচদেব। এই সব লোকের আশ্রয় চাই, আহার্য চাই। আমাদের সামর্থ কি অতদূর পৌঁছতে পারবে?

চেষ্টা করতে হবে স্যার। উৎপাতনরাজ্য সৃষ্টিতে যখন মত দেওয়া হয়েছিল তখন স্থানচ্যুত মানবদের পুনর্বাসনের দায়িত্বও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আজ সেই দায়িত্ব যথাযথ পালন করতেই হবে।

তা ঠিক সচদেব, কিন্তু দেশে ভিখিরীর সংখ্যা বৃদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই হবে না।

কিন্তু অখণ্ড পাতনে ওরাই ছিল সর্বাগ্রগণ্য। ওদের ত্যাগের মহিমাই আপনাকে এই আসনে বসিয়েছে।

ক্রুদ্ধভাবে মহামাত্য বলল, মিথ্যে কথা!

সচদেব সঙ্গে সঙ্গে মহামাত্যের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলল, মিথ্যে কথা।

মহামাত্য নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলতে থাকে, ত্যাগ! মহিমা! পুনর্বাসন!

সচদেব ধীরে ধীরে ক্রুদ্ধ মহামাত্যের সামনে থেকে পেছন হেঁটে পর্দার ওপারে আত্মগোপন করল।

মহামাত্য ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছিল ঘন ঘন।

চারটেয় আসবে এগারটি অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপ্রমুখরা।

ডাকল বেয়ারাকে।

জানতে চাইলো, হল ঘর সাজানো হয়েছে কিনা?

বেয়ারা সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বিদায় নিল।

মহামাত্য নিজে কক্ষ ত্যাগ করে হল ঘরের দিকে গেল। প্রথম একান্ত সচিব রামহরণ পাণ্ডে পেছন পেছন চলল ফাইলপত্র বয়ে নিয়ে।

হলঘরে প্রবেশ করতেই দেওয়াল ঘড়িতে চারটে বাজল।

প্রবেশ করল ইমলিপুর অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপ্রমুখ সামন্ত সেন।

সামন্ত সেন যবন রাজ্যের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। যবনরাজ্য শেষ হবার পর চিন্তা করেছিল পাতন পরিত্যাগ করে মার্কিন মুলুকে ঘর বাঁধবার। সংবাদটি মহামাত্যের কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তার সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলো মহামাত্য। দেশত্যাগের অসুবিধা বুঝিয়ে বলেছিলো, আরও বলেছিলো তার মর্যাদারক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করবে।

সামন্ত সেনের পূর্বপুরুষ যবনদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছিল। যবনরা তার সেই পূর্বপুরুষকে সিংহাসনচ্যুত না করে কেবলমাত্র তার ক্ষমতা অপহরণ করে নিয়েছিল। পাতন রাজ্যে সামন্ত সেনের মত বহু স্থানীক রাজ্য সৃষ্টি করে যবন শাসকরা দেশ শাসন করেছিল শতাধিক বৎসর যাবত। যবনরা চলে যাবার পর এই তাসের দেশের রাজারা অনেকেই শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, পাততাড়ি গুঁটিয়ে তারাও বিদেশে আশ্রয় নেবার চিন্তা করেছিল। মহামাত্য তাদের মধ্যে যারা প্রভাবশালী তাদের নানা পদে বসিয়ে সাময়িক অশান্তি নিবারণ করে কৃতিত্বের দিয়েছে।

সামন্ত সেন আসতেই নির্দিষ্ট আসন দেখিয়ে দিল প্রথম একান্ত সচিব রামহরণ।

মহামাত্য হেসে বলল, মহারাজাবাহাদুরের কুশল তো ?

ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় ক্লিক করে শব্দ হল।

করমর্দন শেষ করে সামন্ত সেন হাসতে হাসতে বলল, মহামাত্যের জয় হোক। অধীনের সব কিছুই কুশল। আপনাদের কুশল জানতে চাই।

মহামাত্য বলল, বর্তমানে কুশল।

প্রবেশ করল ওড্র অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপ্রমুখ বিরঙ্গদেব।

তাকেও সাদরে গ্রহণ করল মহামাত্য। যথারীতি কুশল জানতে চাইলো।

কুশল প্রশ্নাদির পর এল পূর্বায়তন অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপ্রমুখ।

পর পর এল খোটাই অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপ্রমুখ, বাদশাপুরের রাজ্যপ্রমুখ, অবন্তিকার রাজ্যপ্রমুখ, জখম অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপ্রমুখ, বেণীধ্বজের রাজ্যপ্রমুখ, ইকরে তিরকের রাজ্যপ্রমুখ, নর্মচর অঙ্গ-রাজ্যের রাজপ্রমুখ এবং সর্বশেষে এল মধ্যভুক্তি রাজ্যপ্রমুখ। সকলে আসন গ্রহণ করতেই মহামাত্যের ইঙ্গিতে বৈকালিক জলপানের ব্যবস্থা হল।

আপনাদের ব্যক্তিগত ভাবে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, বলল মহামাত্য পুলকেশী।

রাজ্যপ্রমুখরাও তারস্বরে বলল, আমরাও অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকে।

আপনাদের সমষ্টিগত কোন সমস্যা থাকলে তা বলুন সর্বাগ্রে। অঙ্গরাজ্যের অন্যান্য বিবরণ পরে শুনব।

উঠে দাঁড়ালো মধ্যভুক্তির রাজ্যপ্রমুখ নরেশ নারায়ণ। বলল, মহামাত্য যে পবিত্র সংবিধান দেশকে উপহার দিয়েছেন তার জন্য বিশকোটি বছর পর্যন্ত মহামাত্যের নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে পাতনের ইতিহাসে। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে আমরা দ্বিধা বোধ করছি।

মহামাত্য বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করলো, কোন ক্ষেত্রে ?

উত্তর দিল ওড্র অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপ্রমুখ ভেংকটেশ্বর। মহামাত্য, আমাদের এই পবিত্র সংবিধানে রাজ্যপ্রমুখদের কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নি একমাত্র ফিতে কাটা ভিন্ন।

মহামাত্য হেসে বললো, গণতন্ত্রী দেশে ক্ষমতা চিরকালই থাকে গণের হাতে, কোন ব্যক্তির হাতে নয়। সেই জন্যই অঙ্গারাজ্যের শীর্ষে রাজ্যপ্রমুখদের ক্ষমতা সংহত করতে হয়েছে, তাও শুধু মাত্র আমার ইচ্ছায় নয়, তা করা হয়েছে সংবিধান প্রণেতা সভার সকল সদস্যের ইচ্ছায়। এমনকি পাতন রাজ্যের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাও আমরা সীমাবদ্ধ করেছি। বলতে গেলে যবন দেশের রাজা যেমন শোভা-বর্ধনকারী তেমনি শোভাবর্ধন করার জন্যই পাতনরাজ্যে এবং তার অঙ্গরাজ্যে আমরা রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপ্রমুখের পদ সৃষ্টি করেছি।

বেণীধ্বজের রাজ্যপ্রমুখ সরগম সিং মাথার পাগড়ি ঠিক করতে করতে উঠে দাঁড়াল, বিনীত কণ্ঠে বলল, এই শোভাবর্ধনকারীর প্রয়োজন কি ?

রাষ্ট্রের মর্যাদা রক্ষা করতে। কোন মাননীয় বিদেশী অতিথি এলে তাকে রাজকীয় মর্যাদায় রাখবার দায়িত্ব রাজ্যপ্রমুখের।

অন্য কোন কাজ নেই ? প্রশ্ন করল ইরকে তিরকে রাজ্যের রাজ্যপ্রমুখ বলয়শোভন।

অনেক কাজ আছে মিস্টার শোভন। জনসংযোগ রক্ষা করা তার মধ্যে অন্যতম। কোথাও কোন উৎসব হলে রাজ্যপ্রমুখরা যাবেন, ভাষণ দেবেন, প্রয়োজন মতো সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করবেন। আবার যদি প্রয়োজন কখনও হয় তখন কেন্দ্র-সরকারের প্রতিভূরূপে অঙ্গরাজ্য পরিচালনা করতে হবে। এসব কাজ কি তুচ্ছ! ভেবে দেখুন আপনারা। ফিতে কাটা রাজ্যপ্রমুখ নয়, ফিতে কাটার সঙ্গে জনসংযোগও একটি কাজ, যার মূল্য নিরুপন করা খুবই কঠিন।

সমবেত রাজ্যপ্রমুখরা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

মহামাত্য হেসে বলল, আপনাদের বয়স, পদ মর্যাদা, দেশের

জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা বিবেচনা করে আমরা আপনাদের উপযুক্ত আসনে বসিয়েছি। বর্তমানে আপনারা পাবলিক ফিল্ডে কাজ করার উপযুক্ত নন। জনসমাজে আপনারা স্থান করতে পারেন নি, ভোট যুদ্ধে আপনারা পরাজিত অথচ আপনাদের দান রয়েছে রাজনৈতিক কার্য ক্ষেত্রে। আমরা বেইমান নই তাই আপনাদের উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে স্থাপন করেছি রাজ্যপ্রমুখের সম্মানীয় পদে।

খোটাই অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপ্রমুখ শ্যামেশ্বর রামচাঁদ বলল, আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। সত্যিই আমাদের বাণপ্রস্থে যাওয়া উচিত ছিল অথবা পিঁজরাপোলে। তার চেয়ে এই ব্যবস্থা অনেক ভাল।

মহামাত্য হাসল।

তার হাসির সঙ্গে হাসি মিলিয়ে দিল এগারজন রাজ্যপ্রমুখ।

মহামাত্য বলল, আপনারা গণভোটে নির্বাচিত নন। তার অর্থ আপনাদের ওপর অঙ্গরাজ্যের অমাত্যদের কোন এক্তিয়ার নেই, আপনারা যদিও ক্ষমতাহীন তবুও আপনাদের কাজ হল কেন্দ্রের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং কেন্দ্রের নির্দেশ পালিত হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখা। আশা করি তা করতে আপনারা মোটেই ভুল করবেন না।

নিশ্চয় নয়, নিশ্চয় নয়।—বলে উঠল এগারজন রাজ্যপ্রমুখ।

বিদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অটুট প্রীতিপূর্ণ রাখতে চাই। সে কাজেও আপনাদের সহযোগিতা দরকার। মাননীয় অতিথিদের সম্যক মর্যাদা দান করে এবং প্রয়োজন মত তাদের তোষণ করাও আপনাদের কাজ। সে কাজ যে কোন ভাবেই হোক আপনাদের করতে হবে। সে সব ক্ষেত্রে আপনাদের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যেমন জখম অঙ্গরাজ্যের উপজাতির মঙ্গলের জন্য সে সব ক্ষমতা প্রয়োগ করা। এবার আপনারা বলুন নিজ নিজ অঙ্গরাজ্যের সংবাদ।

একমাত্র পূর্বায়তনেব রাজ্যপ্রমুখ মিস্টার ফরেস্টার উঠে দাঁড়াল। অপর সবাই বলল, কোন সংবাদই নেই তাদের।

মিস্টার ফরেস্টার বলল, আপনাদের প্রগতিবাদী ডিসগ্রেস পার্টি এতকাল নিরঙ্কুশ আধিপত্য নিয়ে বাস করছিল আমার রাজ্যে, বর্তমানে সেখানে বহুদলের আবির্ভাব হয়েছে মহামাত্য।

যেমন ?—প্রশ্ন করলেন মহামাত্য।

সেলাম পার্টি প্রথম। তারা চাষী মজুরদের খেপাতে সুরু করেছে। তারা বলছে ডিসগ্রেস পার্টি দেশের সর্বনাশ করেছে, তাদের হটাও।

মহামাত্য হেসে বলল, কথাটা বলা যত সহজ হটানো অত সহজ নয়। এখনও একশ' বছর। তার আগে কিছু করতে পারবে না।

কিন্তু অসন্তোষ ধীরে ধীরে জমায়েত হচ্ছে।

এই অসন্তোষ দমন করার অস্ত্রও রয়েছে আমাদের হাতে।

তাতে লাভ হবে বলে মনে করিনা। বরং অসন্তোষ বৃদ্ধি পাবে। যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে দু'চার জনের মনে তা ধীরে ধীরে সংক্রামিত হবে।

হবে না।—জোর দিয়ে বললেন মহামাত্য।

বাকি দশজন রাজ্যপ্রমুখ সঙ্গে সঙ্গে বলল, হবে না, হতে পারে না।

পূর্বায়তনের রাজ্যপ্রমুখ মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, না হওয়াই উচিত তবুও আপনাকে জানিয়ে রাখা উচিত মনে করি।

সেটা ভাল কথা। আমিও নোট নিলাম। রামহরণ নোট নাও। অঙ্গরাজ্যের মূখ্য অমাত্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাচাই করে নিও।

ইয়েস স্যার।—রামহরণ ফাইলের পাতা উল্টে লিখতে থাকে।

আর কিছু বলবার আছে কারও ?—প্রশ্ন করল মহামাত্য।

রাজ্যপ্রমুখরা পরস্পরের মুখ দেখতে থাকে। সাহস করে নর্মচর অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপ্রমুখ বিল্লীরাম বলল, আমাদের যে বেতন দেওয়া হয়!

হোয়াট্! চিৎকার করে উঠল মহামাত্য।

বলছি সে বেতন খুবই কম।

কেন। আপনাদের কোন ট্যাক্স দিতে হয় না দ্রব্যক্রয়ে। আপনাদের অতিথিবাস চলে রাজকোষ থেকে, আপনাদের হাঁচি কাশির ব্যয় পর্যন্ত বহন করে সরকার। ভাল ভাল ড্রিংক সরবরাহ করা হয় বিনামূল্যে। চাকর বেয়ারা, সোফার, গাড়ি, তেল, চলাচলের সর্বপ্রকার ব্যয় বহন করে সরকার। এরপরও আপনাদের বেতন দেওয়া হয়। জানেন এই সব সুযোগ সুবিধা পেলে যে কোন লোক বিনা বেতনে রাজ্যপ্রমুখের চাকরি করতে রাজি। আমরা যদি সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে রাজ্যপ্রমুখের পদ পূরণ করতে চাই তা হলে লক্ষাধিক দরখাস্ত প্রতিদিন পাব। তবুও আপনারা খুশী নন। আশ্চর্য! পাতনের ইতিহাসে একমাত্র অতীতের বাদশাহরাই এরকম সুবিধা নিয়ে রাজত্ব করেছে, আপনারা রাজত্ব করেন না অথচ সুখ সুবিধা ভোগ করেন, এরচেয়ে আরও সৌভাগ্যলাভ করতে চান! আপনারা নিজের জন্য মাসে একশত থেকে দুইশত টাকা ব্যয় করেন, বাকি টাকা সঞ্চিত হয় নিশ্চয়ই। এই যে অধিক অর্থের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা শুধু আপনাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। আপনাদের অবসর জীবনে যাতে কোন প্রকার আর্থিক দৈন্য না ঘটে তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

এরপর রাজ্যপ্রমুখরা আর মুখ খুলতে সাহস পেল না।

বিদায় নিয়ে সবাই ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল হল থেকে।

মহামাত্য তাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে রামহরণকে বললো, শুনলে তো ঐ সব বেকার অকর্মণ্য লোকের কথা। ওদের ভাল করলেও ওরা খুশী হয় না। আরে আমি তোদের হর্তাকর্তা বিধাতা। আমি বেতন পাই তোদের চেয়েও কম। তবুও তো আমি বেশি বেতনের জন্য আইন সভার মজলিসে বিল উঠতে দেই নি। টাকা তোরা পাবিই কিন্তু বেতন হিসেবে দিলে লোকের চোখ টাটাবে। আমরাও তো লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করি কিন্তু বেতন নেই কম। আমাদের অন্য ব্যয়ের হিসেব জনসাধারণ জানে না, জানতেও

পারবে না। বোকা লোক। ওদের সামলাতেই গলদঘর্ম হতে হবে দেখছি।

রামহরণ মাথা নেড়ে বলল, ঠিক বলেছেন স্যার। তবে চতুর লোক অত বেতন আর ভাতা পেলেও ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে থাকতে রাজি হত না। বোকা আর অকর্মণ্যদের উপযুক্ত চাকরি হল রাজ্যপ্রমুখের চাকরি। তাই ওদের বোকামি দেখে রাগ করলে ভুল হবে স্যার।

ঠিক বলেছ রামহরণ, বলে আত্মতৃপ্তিতে শেরওয়ানীর ধুলো আঙ্গুলের টোকা দিয়ে ঝাড়তে থাকে মহামাত্য।

নেক্সট্ প্রোগ্রাম? আবার জানতে চাইল মহামাত্য। সচদেব, নেক্সট্ প্রোগ্রাম।

সচদেব দ্রুত পদক্ষেপে এসে দাঁড়াল, ছটায় বিনামা কোম্পানীর দ্বার উদ্‌ঘাটন।

বিরক্তির সঙ্গে মহামাত্য বলল, এই সব ছোট কাজের প্রোগ্রাম নাও কেন?

স্যার।

কি?

এই কোম্পানীর মালিকরা গত নির্বাচনে ছয় লক্ষ রুপেয়া দিয়েছিল। ওদের অখুশী করতে পারি নি।

মাথা নাড়তে নাড়তে মহামাত্য বললো, পরবর্তী নির্বাচনে কি দেবে তা জানো?

অন্তত বিশ লক্ষ রুপেয়া। তবে একটা সর্ত আছে। ওরা বলছে, বিদেশে যত জুতো যায় তার অধিকাংশের কনট্রাক্ট যেন ওরা পায়।

আর একটু বেশি দাবী কর সচদেব। পুরো পঁচিশ। তা হলে কনট্রাক্টা ওদের দিতে পারি।

এ আর এমন কি বেশি কথা। ওরা রাজি হবেই। বিকেলে আপনার সঙ্গে গিয়ে কথাটা পাকা করে আসব।

তাই হবে। এখনও ছটা বাজতে অনেক দেরী। ফাইলপত্র যা আছে নিয়ে এস। একবার চোখ বুলিয়ে নিতে চাই।

সচদেব ফাইল আনতে গেল।

মুনিয়া বজরংবলীর সঙ্গে এসে দাঁড়াল।

মহামাত্য জিজ্ঞেস করল, খাবার সময় হয়েছে বুঝি?

হ্যাঁ ড্যাডি, তুমি তো নাওয়া খাওয়ার কথাও ভুলতে চলেছ।

যা বলেছিস মুনিয়া। রাতদিনে কতটা সময় থাকে ঘুমোবার। সেই সকাল থেকে কাজের পর কাজ। এটা না সেটা, শেষ করতে পারছি না। দে খাবার দে। সচদেব ফাইল আনতে গেছে। আরও মুস্কিল হয়েছে যত অমাত্য রয়েছে বিভিন্ন দপ্তরে তারা কাজ করতে ইতস্তত করে। শেষপর্যন্ত তাদের সব ফাইল আমার কাছে পাঠায় সম্মতির জন্য। তাদের বিষয়েও আমাকে নাক গলাতে হয়।

তাদের আর দোষ কি ড্যাডি। ওরা চিরকাল ভলেনটিয়ারি করেছে, রাজনীতির ক-খও কখনপড়ে নি, প্রশাসন পরিচালনা বহু-দূরের কথা। তারা ব্যক্তিগতজীবনে যেমন অসহায় ছিল কর্মজীবনেও তেমনি অসহায় রয়েছে। ব্যক্তি নামক বস্তুটি তাদের নেই, আর নেই যোগ্যতা। তাই তারা তোমার দুয়ারে হানা দেয় বারবার।

মহামাত্য মৃদু হেসে খাবারের প্লেটে মন দিল।

মুনিয়া প্লেটের দিকে তাকিয়ে বলল, ওকি! খাচ্ছ না কেন? এইতো মাত্র চারটে সাণ্ডউইচ, এক গেলাস চকোলেট মিল্ক আর ছটা কলা, একটা পেঁপে, দুটো ডিম আর সামান্য সফট্ ড্রিংক। খেয়ে নাও, নইলে শরীর টিকবে কেন? শরীর না টিকলে কাজ করবে কি করে? নাও খেয়ে নাও।

নিচ্ছি নিচ্ছি, ব্যস্ত হোস না। হার্ড ড্রিংক কিছু আনিস নি?

আছে। খাওয়া শেষ কর তবেই তো।

মাঝে মাঝে সিপ্ দিতে পারলে হজমে সাহায্য করে, বুঝলি।

ফ্ল্যাক্স থেকে তরল পানীয় ঢেলে দেয় মুনিয়া।

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে মহামাত্য বলে, গুরুজি প্রহিবিশন চান। উনি বুঝতে চান না এই ড্রিংক যেমন সুখের সাথী তেমনি তা দুঃখেরও সাথী। সুখীলোকের চিরসঙ্গী, আর দুঃখীজনের একমাত্র বন্ধু এই ড্রিংক। একে দেশ থেকে বিদেয় করলে কোন ক্রমেই মানুষ বাঁচতে পারে না। জানিস তো উৎপাতন রাজ্যের আইন। তাদের ধর্ম বলছে ড্রিংক বেধর্মী কাজ, অথচ সেখানকার রাজকোষে কোটি কোটি টাকা আসে ড্রিংকের ট্যাক্স হিসেবে। যদি সাগর ভর্তি ড্রিংক থাকত তা হলেও মানুষের পরিতৃপ্তি আসত না।

মুনিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছিল।

পর্দা নড়ে উঠল।

কে ?

সচদেব।

একটু পরে আসুন। মহামাত্য ভোজন করছেন।

পর্দার কম্পন বন্ধ হল।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও ড্যাডি।

মহামাত্য গোগ্রাসে গিলতে থাকে। চটপট ড্রিংকের গেলাস খালি করে বজরংবলীর হাতে গেলাস তুলে দিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছল।

খাওয়া শেষ করে মহামাত্য ডাকল, সচদেব।

ইয়েস স্যার। সচদেব উত্তর দিল পর্দার ওপার থেকে।

পর্দা ঠেলে ঢুকল সচদেব, বগলে তার ফাইল। ফাইল খুলে ধরল মহামাত্যের সম্মুখে।

পাতা উল্টোতে উল্টোতে মহামাত্য অভিনিবেশ সহকারে পড়তে পড়তে এক জায়গায় থেমে গেল।

এটা কি হয়েছে সচদেব ?

কোনটা স্যার ?

এই পূর্তকার্যের পরিকল্পনা। দেখছি তোমরা বিশেষ অগ্রসর হতে পার নি।

রামু নদীতে বাঁধ দিলে খোটাই আর পূর্বায়তন রাজ্য উপকৃত হবে ঠিকই কিন্তু নদী বিশারদরা বলছেন, এতে বন্যার প্রকোপ চিরতরে বিনষ্ট হবে না।

মানে ?

ওরা বলছে, জলাধারের জল ধারণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। যেবার বেশি জল সঞ্চয় হবে সেবার জল ছেড়ে না দিলে জলাধারগুলো নষ্ট হবে, তার পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর।

মহামাত্য মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, তার জন্য পরিকল্পনা বন্ধ রাখতে হবে না কি ?

না, তা বলছে না, ওরা বলছে নতুন করে নক্সা করতে হবে।

মানে আরও দু' বছর। পর্যবেক্ষণেই যাবে আরও পঞ্চাশ লক্ষ রুপেয়া। তা হবে না। এই স্কীমকেই চালু করতে হবে। যদি বন্যার প্রকোপ দেখা দেয় তা হলে তখন বন্যারোধের ব্যবস্থা হবে। বর্তমানে এটা এই নক্সা অনুসারেই করতে হবে। কোন পরিবর্তন শুনতে রাজি নই।

সচদেব মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

তুমি পূর্তসচিবকে জানিয়ে দাও আমার মতামত। আর কি আছে ?

কয়েক হাজার চিঠি।

আর পারি না। চিঠি পড়তে দশজন উপসচিব আছে। তাদের কাছে পাঠাও।

পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্যে কিছু আপনার পড়া উচিত মনে করছে তারা।

রাতের বেলায় পাঠিয়ে দিও। কেমন! ওহো পৌনে ছটা বাজতে চলল। গাড়ি রেডি কর। আমাকে আবার বিনামা কোম্পানীতে যেতে হবে। তুমিও তো যাবে। চল মুনিয়া, তুইও চল।

সচদেব ফাইল নিয়ে বের হতেই মহামাত্য মুনিয়ার হাত ধরে বের হল।

বিনামা কোম্পানীর নতুন বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করতে উপস্থিত হল পাতনরাজ্যের মহামাত্য। যথারীতি গাড়ির মিছিল এসে দাঁড়াল দোকানের সামনে। রুপোর কাঁচি দিয়ে দরজার ফিতে কেটে মহামাত্য প্রবেশ করল বিক্রয় কেন্দ্রে। অভ্যর্থনা জানাল কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিস্টার নটনবীশ।

সচদেব এগিয়ে এসে নটনবীশকে পাশের ঘরে ডেকে নিল।

মহামাত্য কি বললেন ?—প্রশ্ন করল নটনবীশ।

তিরিশ লক্ষ। ফিস্ ফিস্ করে বলল সচদেব।

চমকে উঠল নটনবীশ।

তিরিশ !

হ্যাঁ।

বিনিময়ে কি পাব ?

পুরো কনট্রাকটা যাতে পান তার ব্যবস্থা করা হবে।

বেশ তাই হবে। পুরো হলে তিরিশ, আধা হলে বিশ।

সচদেব হেসে বলল, পুরো হলে চল্লিশ দিতে আপত্তি কিসের ?

লজ্জিত হল নটনবীশ।

আমাদেরও কিছু থাকা উচিত।

তা একলাখ রুপেয়া ইনাম মিলবে কাজ হাসিল হলে।

সচদেব খুশী মনে বলল, তা হলে মনে রাখবেন তিরিশ।

কথা শেষ করে দু'জনে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

মহামাত্যের সঙ্গে চোখে চোখে কথা হল সচদেবের।

বেশ জুতসই একটা ভাষণ দিয়ে মহামাত্য সমবেত জনতাকে বুঝিয়ে দিল জুতোর উপকারিতা। আরও বুঝিয়ে দিলো কতবড় দেশপ্রেমী এই নটনবীশ। তার দেশপ্রেম চিরস্মরণীয়। ইনি বিদেশে জুতোর বাজার দখল করতে সচেষ্ট, আমরা তাঁকে সে কাজে

সাহায্য করব স্থির করেছি। আগামী মরশুমে ষাটলক্ষ জুতোর চাহিদা আছে ভালুকরাজ্যে। সেখানে যাতে নটনবীশ জুতো পাঠাতে পারেন তারজন্য বিশেষ ব্যবস্থা করছি। বিদেশের বাজার দখল করা হল আমাদের পহেলা কাজ। সে কাজে নটনবীশ উপযুক্ত। তার জয় হোক্। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এরপর হাততালি।

কেউ কেউ শুনতে পেল পাশের গলি থেকে ছুড়ে দেওয়া শিস্। কোন কোন বদখত চ্যাংরা শিস্ দিয়ে মহামাত্যের ভাষণকে অভ্যর্থনা জানাল। মহামাত্যকে অভ্যর্থনা জানাতে বিরাট আয়োজন করেছিল নটনবীশ। ভোজের ব্যবস্থাও নেহাৎ কম নয়। মহামাত্য সামান্য পানীয় গলাধঃকরণ করে বিদায় নিল। জনতা জয়ধ্বনি দিল।

সোফার এবার মোকাম চল।

আটটায় মন্ত্রীপরিষদের সভা।

সাতটার মধ্যে ঘরে ফিরে মহামাত্য ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। সারাদিনের কাজকর্ম তাকে পরিশ্রান্ত করেছে। ক্লান্তি অপনোদনের জন্য চোখ বুঁজে শুয়ে রইল। মুনিয়া তাড়াতাড়ি বরফ জলে ওডিকোলন ঢেলে এনে কপালে পটি দিয়ে দিল।

ঘড়ির কাঁটা এগোতে থাকে।

বাইরে গাড়ির শব্দ। এক-দুই-তিন, অনেক।

সব মন্ত্রী হাজির।

মুনিয়া ডাকল, ড্যাডি, মন্ত্রীরা এসেছেন।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মহামাত্য বলল, আরও সাড়ে তিন মিনিট দেরী।

মুনিয়া আস্তে আস্তে মহামাত্যের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। মহামাত্য ঘড়ি দেখে। আটটা বাজতে আধ মিনিট আগে উঠে বসল নিজের আসনে, বেল বাজাল।

ছুটে এল অভিরাম।

সবাইকে ডাক। মহাসচিব যেন হাজির থাকে। খবরের কাগজের লোকদের ঢুকতে দিওনা।

আচ্ছা হুজুর।

ধীরে ধীরে প্রবেশ করল মন্ত্রীগণ।

প্রথম এল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চৌঘটলাল ঝাঁঝোরিয়া।

তার পেছনে রক্ষামন্ত্রী কণ্ঠকণ্টকম।

তারপর অর্থমন্ত্রী চতুর্বেদী।

এবার দল বেঁধে ঢুকল শিল্পমন্ত্রী হোসেন আলি, শ্রমমন্ত্রী পদ্মাবতী, শিক্ষামন্ত্রী অচেতন রায়, খাদ্যকৃষিমন্ত্রী ন্যাসপাতিলাল, বাণিজ্যমন্ত্রী শাহুকার সর্দার।

তাদের পেছন এল খনিমন্ত্রী সঞ্চরণ সিং সাহেবজাদা আর পূর্তমন্ত্রী অগ্রমপিল্লাই।

সবাই আসন গ্রহণ করতেই মহামাত্য জিজ্ঞসে করল, প্রচার -মন্ত্রী পানিগ্রাহী আর বিদ্যুৎমন্ত্রী আমেদ হোসেনকে তো দেখছিনা?

উত্তর দিল কণ্ঠকণ্টকম, ওরা ফিতে কাটতে গেছে স্যার।

আজকের এই জরুরী সভায় সকলের উপস্থিতি কামনা করেছিলাম।

উপায় ছিল না স্যার। ওরা নিজ নিজ নির্বাচন এলাকায় গেছে। ভবিষ্যতে ওদের কাছেই হাত পাততে হবে। ওদের খুশী রাখাই আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ।

তা ঠিক। মিস্টার মঙ্গল সেন আজকের এজেণ্ডা।

মহাসচিব ত্বরিতে ছাপা কাগজ হাজির করে বলল, এইযে স্যার।

সবাইকে এক কপি করে দিল।

এজেণ্ডা হাতে পেয়ে সবাই অভিনিবেশ সহকারে পড়ে নিল।

প্রথম হল শ্রমনীতি। বলল মহামাত্য।

পদ্মাবতী উঠে দাঁড়াল।

শুনুন আসল হল লেবার পলিসি। আমাদের শাসন কাঠামো

রক্ষা করতে হলে শিল্পপতিদের হাতে রাখতেই হবে। নির্বাচনের সময় টাকা দরকার। সে টাকার জোগান দেবে এইসব শিল্পপতিরা। আমরা নতুন একটা আইন করতে চাই। সে আইনে শিল্পপতিদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে রাজনৈতিক দলকে অর্থ সাহায্য দেবার।

সবাই বলে উঠল, সাধু সাধু।

পদ্মাবতী বলল, অপর দলকেও তো দিতে পারে?

ধনী শিল্পপতিরা তা কখনও দেবে না। তারা দেখে দেবে। যারা তাদের স্বার্থরক্ষা করছে তাদের দলকেই অর্থ সাহায্য দেবে। আমরা সে কাজ বেশ ভাল ভাবেই করে আসছি এতকাল। সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করার কিছু নেই।

মঙ্গল সেন স্টেনোগ্রাফারকে নোট নিতে বলল।

কালকে একটা ড্রাফট্ বিল তৈরী করে পদ্মাবতীকে পাঠাবেন, আর সেখান থেকে চতুর্বেদীর সম্মতি নিয়ে আমার কাছে আসবেন ফাইন্যাল ওপিনিয়ন নিতে। কেমন!

ইয়েস স্যার।

এরপরই আসছে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক। আমরা সবাই জানি এই সম্পর্ক ধীরে ধীরে কলুষিত হচ্ছে। শ্রমিকদের লোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় তাই বলুন?

শাহুকার সর্দার উঠে দাঁড়াল।

আমার মনে হয় একটা নতুন শ্রমবিরোধ আইন প্রণয়ণ করা উচিত।

পদ্মাবতীও সমর্থন করল তাকে।

মহামাত্য বললো, তাতে শ্রমিকদের আইনের আশ্রয় নিতে বলা হবে। তার জন্য প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যে একটা করে ট্রাইবুন্যাল থাকবে। শ্রমিক বিরোধ আরম্ভ হলেই ট্রাইবুন্যালে পাঠান চলবে। ট্রাইবুন্যালে যতদিন নিষ্পত্তি না হয় ততদিন ধর্মঘট করা বে-আইনি হবে।

অতি সুন্দর সাজেস্যান।

মঙ্গল সেন নোট নিতে বলল স্টেনোগ্রাফারকে।

যদি ট্রাইবুন্যালে নিষ্পত্তি না হয়?

নিশ্চয় হবে। আর ট্রাইবুন্যালের রায় শ্রমিকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হবে।

শ্রমিকরা তা শুনবে কেন! বলল সঞ্চরণ সিং সাহেবজাদা।

আমরা হলাম আইনের দাস। যবনরা আমাদের আইন মানতে শিখিয়েছে। আইন না মানলে তাদের কয়েদ করা হবে, তাদের শাস্তি পেতে হবে।

কিন্তু মালিকরা যদি অমান্য করে।

তা হলে বুঝিয়ে কাজ আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। মালিকদের চটিয়ে আমাদের কাজ এগোতে পারে না। তাদের তোষণ করতে হবে। আইনের প্যাঁচে শ্রমিকরা ঘোল খাবে আর মালিকরা যা উপায় করার তা করবে।

সবাই সম্মতি দিলেও অনেকের মনে খিঁচ থেকে গেল।

অগ্রম পিল্লাই বলল, ভবিষ্যতে অশান্তি হতে পারে মহামাত্য।

তখন নতুন আইন করে অশান্তি দমন করতে হবে, নির্বিকার ভাবে উত্তর দিল মহামাত্য।

মঙ্গল সেন দ্বিতীয় আইটেম তুলল।

শাপুর স্টিল প্রজেক্ট।

মহামাত্য বলল, যবন সরকার এই প্রজেকট তৈরী করে দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাদের একটি সর্ত আছে। সর্ত, আমরা বিদেশের বাজারে বন্দুক বিক্রি করতে পারব না। আর দেশের বাজারেও বন্দুক বিক্রি সীমাবদ্ধ হবে।

ঠিক বুঝলাম না মহামাত্য, বলল কণ্ঠকণ্টকম।

আমাদের বন্দুকের কারখানায় যথেষ্ট বন্দুক তৈরী হচ্ছে। আমাদের দেশরক্ষী অথবা পুলিশের যত বন্দুক প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি বন্দুক তৈরী হওয়াতে তা বিক্রি করতে হচ্ছে বিদেশের

বাজারে। এটা বন্ধ করতে চায় যবনরাজ, কারণ তাদের বাজার নষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু বহুলোক ছাঁটাই হবার আশঙ্কা আছে, বলল হোসেন আলি।

চৌঘটলাল হেসে বলল, তোমার সেচ বিভাগে তাদের পাঠিয়ে দেব।

ঠাট্টা নয় ঝাঁঝোরিয়াজি। সত্যি সত্যিই খুব অসুবিধে হবে তাতে। তাদের বিকল্প কাজ দিতে হবে, ওরা সব দক্ষ শিল্পী। কাজ থেকে ছাড়া পেয়ে যদি ঘরে বসে বন্দুক তৈরী করতে থাকে তা হলে অভ্যন্তরীণ শান্তি নষ্ট হবে। সে সব দিকে খেয়াল রেখে কাজ করা উচিত।

চতুর্বেদী বলল, তারও উপায় আছে কণ্ঠকন্টকমজি। তোমার বন্দুকের কারখানায় বালতী আর লালটিন তৈরী করতে দাও। ওদের বেকার হবার কোন সম্ভাবনা থাকবেনা, আর ট্রেড বদলে ওরা আর বন্দুক তৈরীও করতে পারবে না।

অচেতন রায় চিৎকার করে বলল, রাইট, মোস্ট সাইকোলজিক্যাল।

তা হলে এবিষয়ে আপনারা সব একমত? মহামাত্য জানতে চাইলো।

উপায় নেই মহামাত্য। শাপুর ইস্পাত কারখানা গড়তে যদি দু'দশ হাজার লোক বেকার হয় তাতে আমাদের দুঃখ নেই। বড় কাজে কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়।

ন্যাসপাতিলাল ঠিকই বলেছেন। আমরা বৈষয়িক উন্নতি চাই। আর বন্দুক দিয়ে কি হবে। আমরা তো যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না। তার চেয়ে ভারী শিল্প গড়া বড় কাজ।

মহামাত্য মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, আপনাদের বিবেচনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মঙ্গল সেন, এসব নোট নিল। ফাইলের অর্ডার লিখল, আমাদের বন্দুক বাইরে যাবে না। কারণ স্বরূপ বললো, আমাদের নতুন টাইপের বন্দুক শত্রুরা যাতে তৈরী করতে না পারে তারজন্য এই সতর্কতা।

হোসেন আলি বলল, রাইট্।

থার্ড আইটেম কৃষির উন্নতি, বলল মঙ্গল সেন।

মহামাত্য আপত্তি জানিয়ে বলল, আজ বড়ই ক্লান্ত, পরবর্তী অধিবেশনে বাকি আইটেমগুলো আলোচনা করব।

মন্দ কি ? বলল সবাই।

আজকের ডিনারটা আমার এই গরীবখানায় সম্পন্ন করুন।

মহামাত্য উঠে গেল পাশের ঘরে।

সচদেব সেখানে অপেক্ষা করছিল। তাকে জিজ্ঞেস করল, বিনামা কোম্পানী রাজি হল ?

হাঁ স্যার। পঁচিশ দিতে রাজি, তবে গোটা কন্ট্রাকটা চায়।

গোটা কন্ট্রাক্ট্ !

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভেবে দেখতে হবে।

এর মধ্য ভাববার কিছু নেই মহামাত্য। আপনার মুখের কথা পেলে কালকেই অর্থ সংগ্রহ হতে পারে।

সচদেব মনে মনে হিসেব করে নিল, পঁচিশ দিলে পাঁচ আর ইনাম এক। ব্যয় নেই এক পয়সাও।

দেখা যাক, বলে মহামাত্য বিদায় দিল সচদেবকে।

বাইরে শোনা গেল মঙ্গল সেনের গলা।

ফরেন নিউজগুলো তৈরী হয়েছে কি ফুচা সিং ?

হ্যাঁ স্যার।

মহামাত্যের শোবার ঘরে পাঠিয়ে দাও।

মুনিয়া এসে বলল, তোমার শোবার সময় হয়েছে ড্যাডি।

কতকগুলো চিঠি লিখে ফরেন ডেসপাচ্‌গুলো দেখতে হবে মুনিয়া। সারা দুনিয়াতে পাতনের জয় জয়াকার হয়েছে শুধু আমাদের ফরেন পলিসির জন্য। আমরা সহাবস্থান আর শান্তিতে বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাস নিয়ে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। তাই ফরেন ডেসপাচ্‌গুলো ভাল করে দেখা দরকার। কোন দেশের কি ওপিনিয়ন তা জানতে হবে। আর ব্যক্তিগত কয়েকখানা চিঠি লেখাও দরকার। স্টেনো আছে তো?

আছে। ডাকব তাকে?

পাঠিয়ে দাও।

স্টেনো আসতেই ডিকটেশ্যন দিতে লাগল মহামাত্য। পাঁচ সাতখানা চিঠির বক্তব্য শেষ করে ফরেন মেল নিয়ে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। ফোন বেজে উঠল।

হ্যালো। গুরুজি। আপনার ঐ বিষয়টি মন্ত্রীসভায় আলোচনা করতে সময় পাইনি। কালকে আলোচনা করব। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমিই নির্দেশ দেব কালকে। পরে অনুমোদিত করিয়ে দেব মন্ত্রীসভায়। আর শুনুন, চারদিকে যে জয়ধ্বনি উঠেছে তাতো শুনতে পাচ্ছেন। দেশ বিদেশে আমার জয়গান শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। সাবধানে চলতে হবে বইকি। আচ্ছা। শুভরাত্রি।

ফোন ছেড়ে দিয়ে আবার মনোযোগ দিল ফরেন মেলে। পড়তে পড়তে অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল পাতনরাজ্যের মহামাত্য। রাত তখন দুটো।

মুনিয়া দুবার এসে দেখে গেছে।

বাবাকে ঘুমোতে দেখে ডেকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজেও শুতে গেল পাশের ঘরে।

সচদেব মাঝরাতে বাড়িতে ফিরেই তরল পানীয় নিয়ে বসল।

নাজুকবাঈ তখনও পতিদেবতার জন্য না খেয়ে বসেছিল।

সচবেদের হাতে গেলাস দেখে খেঁকিয়ে উঠল। এতরাতে মাতলামি সহ্য করতে পারব না। শীগ্‌গীর উঠে এসে খেতে বস।

আজ অনেক খেয়েছি। আর খাবার ইচ্ছে নেই। একটু স্বাদ নিচ্ছি নতুন আমদানী এই ভডকার। শুনেছি হজমের খুব সাহায্য করে। তার ওপর শীতের রাতে গা'টা গরম করতে ভডকা নাকি অতুলনীয়।

তুমি যে খাবে না তা কেন ফোনে বললে না। আমি তোমার জন্য না খেয়ে বসে আছি।

ভুল ডারলিং ভুল। আমাদের জীবনে পতিপ্রেম বা পত্নীর প্রতি ভালবাসা থাকতে পারে না। আমাদের জীবনে দুটো কাজ, প্রথমটি হল প্রভুর মনোরঞ্জন, আর দ্বিতীয়টি হল অর্থ উপার্জন। তার কোনটাই বাদ দিতে চাই না। আজকের ট্রিপ যদি সাকসেসফুল হয় তা হলে আর প্রভু তোষণের প্রয়োজনও হবে না। যাক ওসব কথা। তুমি খানা খাও, আমি বোতলটা শেষ করি। মেয়েটা নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছে।

ঘুমিয়েছে। বলে নাজুকবাঈ খাবার থালা টেনে নিল।

সচদেব নিঃশব্দে বোতল উজাড় করতে থাকে।

হোল তোমার খাওয়া?

তোমার তো হয়েছে।

আরেকটা বোতল খুলব কিনা ভাবছি!

আর দরকার নেই। এতেই তো উঠতে পারছ না। এদিকের খবর শুনেছ?

সচদেব টেনে টেনে বলল, কি খবর?

সুমতি শিয়ালিয়ার এনগেজমেণ্ট আগামী কাল য়্যানাউন্স হবে।

তা ভাল কথা। তোমার কোন এনগেজমেণ্ট হয়েছে কি নতুন করে?

নাজুকবাঈ কুপিতভাবে বলল, মুখে যা আসে তাই বল দেখছি।

আহা দোষের কি বলত? আমাদের মঙ্গল সেন মুখ্যসচিব। তার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী সতীদেবী নন্-য়্যাগ্রেশন প্যাক্ট্ করেছে মহামাত্যের একজন সহচরের সঙ্গে, আর প্রৌঢ় মঙ্গলসেন চেষ্টা করছে হোমের ডেপুটি সচিবের নতুন বিয়ে করা স্ত্রী শকুন্তলাকে কব্জায় আনতে। সারা পাতনরাজ্যেই চলছে ঘর বদলের পালা। তুমি আর কেন সতী সেজে থাকবে বল! এইতো বগল কাটা ব্লাউজ পড়তে শিখেছ। পেটের তিনপোয়াই তো খোলা। ঠোঁটে রং দিতে তুমিও তো পেছপা নও। সাজগোজের অভাব তো ঘটে নি। এবার মনের মত মানুষ খুঁজে নিতে পার নিশ্চয়ই।

নাজুকবাঈ কোন উত্তর না দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

সচদেব কাঁপতে কাঁপতে এসে বসল পাশে। হাত দিয়ে নাজুকের মুখ ঘুরিয়ে বলল, রাগ করলে ডারলিং? যুগ ধর্ম। জীবনকে ভোগ করতে হবে। তারজন্য চাই অর্থ। অর্থ থাকলেই পাবে নারী ও মদিরা। ক'দিনের এই জীবন। ভোগ করতে হবে বইকি! তুমি লজ্জা পাচ্ছ। তা বটে। ওটা ট্রাডিশ্যন। আমরা ট্রাডিশ্যন ভাঙ্গতে প্রস্তুত। নতুন আইন কি হচ্ছে জান?—নতুন আইনের বড় সম্পদ হল বিবাহ বিচ্ছেদ।

নাজুকবাঈ মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে রইল।

ও বাবা! এখনও রাগ! আমাদের এই স্বাধীন দেশ হবে ধর্মনিরেপক্ষ। বহুবিবাহ প্রথা রইবে না মানব সমাজে।

নাজুক মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, আর রক্ষঃকুলে?

তাদের চার বিবি মঞ্জুর। ওটা ধর্মীয় ব্যবস্থা। ওতে হাত দিতে সাহস নেই আমাদের মহামাত্য অথবা তার সাঙ্গাতদের।

কেন?

ভোট! মহামাত্য জানে মানবকুল তাদের বেশি দিন সহ্য করবে

না। ব্যালান্স অব পাওয়ার রক্ষা করবে রাক্ষসকুল। তাদের ভোট পেতে হলে চার বিবির ব্যবস্থা রাখতেই হবে। সেদিক থেকে কোন ত্রুটি যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করছেন মহামাত্য।

মানবদেরও তো বহু বিবাহ ধর্মীয় ব্যবস্থা।

মহামাত্য তা বিশ্বাস করেন না। মানব সমাজে বহু বিবাহ বন্ধ, বিবাহ বিচ্ছেদ আর সম্পত্তির সম বণ্টন হল মহামাত্যের লক্ষ্য। আমরা তারই অনুবর্তী।

সমাজে ব্যাভিচার দেখা দেবে।

গোপনে। আত্মগোপন করতে পারবে দুষ্কৃতকারীরা।

নাজুকবাঈ বলল, বহুবিবাহ বন্ধ হলেও বহুপতিত্বকে আইন করে সম্মানদান মোটেই উচিত নয়। বহুবিবাহের চেয়েও ভয়ঙ্কর হল পতি অথবা পত্নী বদল। এককালীন দুটি স্বামী বা দুটি স্ত্রী না থাকলেও এতেও বহুবিবাহের ফললাভ ঘটবে।

রাইট্ ইউ আর। মুখ বদল, রুচি বদল, স্বাদ বদল করতে পারবে পুরুষ ও নারী। একঘেয়ে জীবন হবে না কারও। তুমিও যদি চাও আইন পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তোমার মনোমত লোকের গলায় মালা দিতে পার।

তোমার স্পর্দ্ধা একটু যেন বৃদ্ধি পেয়েছে। কাকে কি বলতে হয় তা ভুলে গেছ।

তা নয় সুন্দরী। তোমার বগলকাটা ব্লাউজ, সুউন্নত স্তন আর ঠোঁটের লিপষ্টিক দেখে যদি কেউ তোমাকে প্রেম নিবেদন করে তাতে মোটেই আশ্চর্য হব না। মনে করব এটাই স্বাভাবিক পরিণতি। পরবর্তী ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমি নিশ্চয়ই সে অবস্থাকে মেনে নেব।

ক্রোধে নাজুকবাঈ কোন কথা বলতে পারল না।

তোমার সুমতি শিয়ালিয়ার গল্প শোনাও।

রাত একটা বেজে গেছে। আর নয়, শুয়ে পড়।

সচদেব সোহাগের সঙ্গে নাজুকের গালে হাত বুলিয়ে লেপ টেনে দিল সর্বাঙ্গে।

ফিস্ ফিস্ করে বলল, বিনামা কোম্পানীর কাজটা করতে পারলে ছয়লক্ষ টাকা নগদ লাভ।

কাজটা কি ?

বিদেশে অনেক জুতো যাবে এবার। তার পুরো কনট্রাক্ট তারা চায়। যদি পুরো কনট্রাক্ট পায় তাহলে মহামাত্যের পঁচিশ, আমার কমিশন পাঁচ আর ইনাম এক, বুঝলে।

একাজ তো তুমিই করতে পার। মহামাত্যকে বুঝিয়ে কাজ গোছানো তোমার পক্ষে মোটেই কষ্টকর নয়।

আগে তাই ভাবতাম। এখন দেখছি খুবই কঠিন। তিরিশ লাখ যদি এক চেকে দিয়ে দেয় তা হলে পাঁচ লাখ ফাঁকি। তুমি একটু ম্যানেজ করতে পার না।

আমি কি করে করব ?

মুনিয়ার সঙ্গে তোমার জানাশোনা আছে। দু' চারবার মুনিয়ার কাছে ঘোরাঘুরি করে তাকে দিয়ে মহামাত্যকে ভজাতে হবে। আর তুমি নিজেই যদি পার তা হলে তো কথাই নেই।

আমি পারব না।

তা পারবে কেন ? আমার জন্য সারা দিন না খেয়ে থাকতে পারবে আর আমার ছয়লাখ টাকা লাভ যাতে হয় তার জন্য কিছুই করতে পারবে না। আশ্চর্য তোমার পতিভক্তি।

নাজুকবাঈ কোন উত্তর দিতে পারল না।

কথা বলছ না কেন ?

অনেক রাত হয়েছে। ঘুমোও। কালকে সুস্থ মস্তিষ্কে এসব ভাবতে হবে।

সুস্থ মানুষ এসব ভাবতে পারে না বাঈ। মানুষের মন অসুস্থ, অপবিত্র না হওয়া অবধি লোভকে প্রশ্রয় দেয় না। সাদা চোখে

ওসব দেখা পাপ, চোখ লাল থাকলে ওগুলো হল পূণ্য। তোমার মতামত জানতে হলে আজই শুভক্ষণ। আমার মনেও আঁচড় কাটবে না এই মৌজ ভরা রাতে।

নাজুকবাঈ লেপ টেনে মুখ ঢেকে বলল, কালকে ভেবে বলব।

নো, নো। আজই শুনতে চাই।

তারপর চুপচাপ

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নাজুকবাঈ বলল, বেশ, মুনিয়ার কাছে যাব, তবে কতটা কি হবে তা তো বলতে পারি না।

সচদেব উঠে বসল, বিউটি এণ্ড বিস্‌ট্‌। তোমার বিউটি ওদের বিস্‌ট তৈরী করবে। কোন ভয় নেই। তোমার সাকসেস নিশ্চিত। এবার ঘুমোতে পারব নিশ্চিন্ত মনে।

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য।

যবনিকা উঠল সকাল ছটায়।

প্রাত্যহিক সংবাদপত্র হাতে মহামাত্য। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে ফোন তুলে ধরল।

হালো! মর্ণিং নিউজ পত্রিকা। আমি মহামাত্য পুলকেশী অমিত্রারি বলছি। কাল আমার খবর যে রিপোর্ট করেছে তাকে এখুনি পাঠিয়ে দিন আমার কাছে। বাড়ি গেছে? খবর দিন। এখুনি দরকার।

ফোন ছেড়ে দিল মহামাত্য।

ব্রেকফাস্টের তখনও দেরী। খবরের কাগজের পাতা উল্টে সংবাদগুলোর হেড লাইন দেখতে থাকে মহামাত্য।

কাগজ দেখা শেষ করে স্নান করতে যায়।

বজরংবলী খাবার নিয়ে প্রস্তুত।

মুনিয়া তদারক করছে।

তিনজন ভৃত্য মহামাত্যের পোষাক নিয়ে প্রস্তুত।

স্নানাগার থেকে বের হলেই পোষাক পরিয়ে দেওয়া তাদের কাজ।

মহামাত্য স্নান শেষ করল।

পোষাক পরল।

খেতে বসল।

মুনিয়া জানতে চাইল, আজ চা কেমন হয়েছে?

অতি উত্তম। তোর তৈরী নিশ্চয়।

খাওয়া শেষ হতে না হতেই সংবাদ এল, মর্ণিং নিউজের সংবাদ-দাতা বাইরে অপেক্ষা করছে।

তাকে এখানে নিয়ে এস। বজরং এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা কর।

মর্ণিং নিউজের স্টাফ রিপোর্টার আকালুচাঁদ ঘরে ঢুকেই আভূমি প্রণাম করে দাঁড়াল।

বস। আমার খবরটা তুমিই রিপোর্ট করেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রমিক ভবনের জন সমাবেশ কত লিখেছ?

তা হাজার তিন চার হবে।

ননসেন্স। আমি দেশের মহামাত্য। আমি যেখানে যাব সেখানে কম করেও একলক্ষ লোক সমাবেশ হয়।

কিন্তু স্যার কাল তা হয় নি।

না হলেও কাগজের রিপোর্টে তাই থাকবে। পাতনের রাজধানীতে সবাই আসে না। অঙ্গরাজ্যের মানুষ এই রিপোর্ট দেখে আমার পপুলারিটি স্থির করবে। তুমি তিন-চার হাজার লোকের সমাবেশ লিখেছ, তার অর্থ হল আমাকে ছোট করে দেখানো। কখনই হতে পারে না। কালকেই সংশোধন করে দেবে। আচ্ছা, আমিই রিপোর্টটা লিখিয়ে পাঠিয়ে দেব। এরকম ভুল যেন আর কখনও না হয়।

ইয়েস স্যার।

শুধু ইয়েস স্যার নয়। একেবারে পাকা কথা। তা যদি না কর তা হলে সরকারী বিজ্ঞাপন যাবে না তোমাদের কাগজে, তোমার চাকরিও থাকবে না। মহামাত্য হোক আর অন্য কোন অমাত্য হোক, তাদের কোন মিটিং সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখতে হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে দেখাতেই হবে; দেশের মানুষ আমাদের পাঠিয়েছে দেশ শাসন করতে, তাদের কাছে আমরা ছোট হতে পারি না, সে কথা মনে রেখ। আর দলীয় সভায় কোন সময়েই তিন লক্ষের কম জন সমাবেশ লিখবে না। সাবধান, নইলে বিপদে পড়বে।

আপনার আদেশ শিরোধার্য।

যাও। আচ্ছা শোন, উৎপাতন রাজ্যের দাবী ছিল দুহাজার কোটি রুপেয়া। আমরা স্থির করেছি দুশ' কোটি টাকা তাদের দেব। অবশ্য নগদে নয়, দ্রব্য বিনিময়ে। আমরা দেব কিছু অস্ত্রশস্ত্র। প্রতিবেশি শক্তিশালী হলে বাইরের উৎপাত কখনও হয় না। তাই উৎপাতন রাজ্যকে অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছি।

ভবিষ্যতে এই অস্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে না তো?

আশা করছি তা হবে না। যদি তা হয়, প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হব। যাইহোক খবরটা বেশ গুছিয়ে লিখে দিও। এটা করতেই হবে, কেননা এটা গুরুজির নির্দেশ।

আকালুচাঁদ কোন রকমে বিদায় নিয়ে বাঁচল। সাক্ষাৎ যমের হাত থেকে যেন মুক্তি পেল। বজরংবলী চায়ের কাপ রেখেছিল তার সামনে, সেই চা খাবার সাহস পর্যন্ত হল না। পালাতে পারলে বাঁচে এরকম অবস্থা।

খাস বেয়ারা অভিরাম এসে মুনিয়াকে সংবাদ দিল সচদেব সাহেবের মেমসাহেব এসেছে দেখা করতে। মুনিয়া তাকে বসতে দেবার আদেশ দিয়ে মহামাত্যের প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিস গুছিয়ে দিতে লাগল।

সচদেব মানে আমাদের সচদেব ? জানতে চাইল মহামাত্য।

মুনিয়া হেসে বলল, আমারও তাই বিশ্বাস।

বজরং সচদেবকে ডেকে নিয়ে এস।

প্রভুর আদেশ পাওয়া মাত্র বজরংবলী সচদেবকে খুঁজতে গেল দপ্তরে।

মুনিয়া বলল, আজকের প্রোগ্রাম ?

প্রোগ্রাম তো সচদেবের কাছে। তাকে সেইজন্যই তো ডাকিয়ে পাঠালাম।

কথা শেষ হবার আগে পর্দা নড়ে উঠল। সচদেব ফাইল হাতে করে সামনে দাঁড়াতেই মহামাত্য জানতে চাইল আজকের প্রোগ্রাম।

সকালে মাত্র একটা প্রোগ্রাম। ভীষণপুরে ফৌজী মহড়া সাড়ে সাতটায়, সেখানে যেতে হবে।

মহামাত্য জিজ্ঞাসা করল, ওবেলার প্রোগ্রাম ?

হেভি। দেড়টা থেকে রাত নটা অবধি।

ভাল কথা। তোমার মিসেস বুঝি এসেছেন ?

ঠিক বলতে পারছিনা স্যার। তবে কদিন আগে শুনছিলাম সে নাকি মুনিয়াবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসবে। পুরানো সহেলি। আসতেও পারে। জানেন তো আজকাল আমাদের সঙ্গে ওদের কতটুকু সম্পর্ক। পরোয়াই করতে চায় না।

তা বটে। আমি বাপু বেঁচে গেছি। মুনিয়ার মা থাকলে এত কাজ করতে পারতাম না!

মুনিয়া চটে গিয়ে বলল, কেন পারতে না ড্যাডি। মা বেঁচে থাকতে দেশের কাজ করতে কতবারই তো তুমি জেলে গেছ। মা তোমাকে কখনও ভাল কাজে বাধা দেয়নি।

তা বটে তা বটে। তুই রাগছিস কেন। আমাদের যুগে যা ছিল আজতো আর তা নেই। সবই বদল হয়ে গেছে রে মুনিয়া। এখন

মেয়েরা হল লীডার আর আমরা হলাম ফলোয়ার। তারা যা বলবে তা শুনতেই হবে। তাই না সচদেব ?

ঠিক বলেছেন স্যার।

আমি কিন্তু আপনার মিসেসকে এসব কথা বলে দেব।

আপত্তি নেই, তবে গৃহে অশান্তি যাতে না হয় সে দিকে একটু নজর রেখে যা হয় করবেন।

সচদেবের কথা বলার ভঙ্গীতে রাশভারী মহামাত্যও হেসে ফেলল। বলল, আচ্ছা তুমি যাও। আমি প্রস্তুত হয়ে এখুনি দপ্তরে আসছি।

সচদেব চলে যেতেই মহামাত্য বলল, চল মুনিয়া।

ভেতর বাড়িতে নাজুকবাঈ বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে, তাকে দেখেই মুনিয়া ভাল করে দেখল তাকে, চেনাচেনা মনে হল।

বলল, তুমি, তুমি, নাজুকবাঈ।

চিনছে পেরেছ মুনিয়া। ভেবেছিলাম মহামাত্যের মেয়ে বোধহয় বাল্যসঙ্গিনীকে ভুলেই গেছে। যাক বাঁচা গেছে। তা কেমন আছ ?

ভালই। তবে ড্যাডিকে নিয়ে বড়ই অশান্তিতে দিন কাটে। এত কাজ অথচ তাকে দেখবার মত একটিও লোক নেই। আমার ছেলেটা আবার রয়েছে মার্কিন মুলুকে, তারজন্যও চিন্তা, ছেলের বাবা তো কোন দিকেই লক্ষ্য করে না। সে আছে তার ব্যবসা নিয়ে। শুধু টাকার চিন্তা। আশ্চর্য। এই রকমই আছি। তোমার খবর বল নাজুক।

আমার আবার খবর। মহামাত্যের সর্বকনিষ্ঠ একান্ত সচিবের পত্নী। মাসকাবারে একমুঠো দক্ষিণা। তাই দিয়ে বাড়িভাড়া, মেয়ের প্রয়োজন মেটানো, নিজেদের খরচ চালানো। এই সব নিয়ে সুখে দুঃখে কাটছে।

হঠাৎ কি মনে করে ?

দেখা করতে এলাম। সময় পেলে আমার ওখানেও যেও।

তোমার ওখানে যেতে পারব কিনা তা বলতে পারিনা, তবে তুমি মাঝে মাঝে এস। এখন ওঠ, ভেতরে গিয়ে বস। অনেক দিন পর দেখা। আমরা ছোটবেলায় মিশন স্কুলে যখন পড়তাম তখনই আমাদের পরিচয়। তুমি যে পরিচয় ভোলনি এটাই আনন্দের কথা।

নাজুককে সঙ্গে করে ভেতরে নিয়ে গেল মুনিয়া।

বাহির থেকে মহামাত্যের গলা শোনা গেল, মুনিয়া।

ইয়েস ড্যাডি। ভেতরে এস। আমার এক বান্ধবী এসেছে। তার সঙ্গে পরিচয় কর।

মহামাত্য ঘরে ঢুকল।

নাজুকবাঈয়ের গলা তখন শুকিয়ে গেছে। পাতনের মত বৃহৎ রাষ্ট্রের ভাগ্যবিধাতা তার সামনে দাঁড়িয়ে। ভয়ে পা দুটো কাঁপছিল।

আমার ড্যাডি।

হাত তুলে নমস্কার করল নাজুক বাঈ।

আমার বাল্যের সহপাঠিনী সহেলি নাজুক বাঈ। তোমার একান্ত সচিব সচদেবের স্ত্রী।

ও, আচ্ছা। তোরা গল্প কর। আমি দপ্তরে যাচ্ছি। ফৌজী কুচকাওয়াজ দেখতে যাব সাতটা পনর মিনিটে, তুই প্রস্তুত হয়ে আসিস।

তুমি যাবে নাজুক? জিজ্ঞেস করল মুনিয়া।

নাজুক মাথা নাড়ল।

আমরা দু'জনেই যাব ড্যাডি। আলাদা একটা গাড়ির কথা বলে দিও।

গাড়ির জন্য চিন্তা করতে হবে না। তোরা প্রস্তুত হয়ে আয়। বলতে বলতে মহামাত্য বেরিয়ে গেল।

মুনিয়া পরিপাটি করে সাজগোজ করে নাজুকের হাতধরে হাজির হল দপ্তরে।

মহামাত্য বলল, য়্যু আর লেট বাই টু মিনিটস্।

স্যরি, বলে মুনিয়া গাড়িতে গিয়ে উঠল।

পেছন পেছন মহামাত্য উঠল গাড়িতে।

সবার পেছনের গাড়িতে উঠল নাজুক বাঈ।

গাড়ির মিছিল চলল ভীষণপুর ফৌজী ব্যারাকের দিকে।

রাস্তায় সামান্য দু'চারটে কথা ভিন্ন বিশেষ কিছু আলোচনা হল না মুনিয়া আর নাজুকের।

গাড়ি ফৌজী এলাকায় ঢুকতেই প্রধান সেনাপতি এগিয়ে এসে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। গাড়ি থেকে নামতে নামতে মহামাত্য বলল, জেনারেল অর্কপন্থ আপনাকে ধন্যবাদ।

জেনারেল স্যালুট করে বলল, আমরা আপনার শুভ পদার্পণে কৃতজ্ঞ।

ডায়াস তৈরী ছিল, তার ওপর দাঁড়াল মহামাত্য।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্ষা অমাত্য কণ্ঠকণ্টকম এল তার দল বল নিয়ে। ডায়াসের পেছনে সারিদিয়ে বসল সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ও স-পার্ষদ রক্ষা অমাত্য।

মহামাত্য ডায়াসে উঠতেই মিলিটারী ব্যাণ্ডে জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠল। এই সঙ্গীত শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে ফৌজী কুচকাওয়াজ আরম্ভ হল। ফৌজী সেলাম দিল মহামাত্যকে।

মহামাত্য মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিল, আমাদের দেশ শান্তি চায়। আমরা যুদ্ধ চাই না। তবুও ফৌজ রাখতে হয়েছে, কেননা কখন যে বিপদ আসে তার ঠিক নেই। আমরা হিংসাকে ঘৃণা করি কিন্তু যারা হিংস্র, যাদের স্বভাব সাপের মত তাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকা আমাদের কর্তব্য। তাই আমাদের এই দেশরক্ষা বাহিনী। শান্তির সময় আমাদের এই বাহিনী অসামরিক নাগরিকদের কাজে সাহায্য করবে, প্রয়োজনে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবে। আমাদের এই রক্ষী বাহিনী হল দেশের সম্পদ, দেশ সেবার ব্রতে এরাই অগ্রগণ্য। এদের মঙ্গল কামনা করে দেশের প্রত্যেক

নাগরিক। আমরা আপনাদের অর্থাৎ দেশরক্ষী বাহিনীর কাছে চিরঋণী। এই ঋণ অপরিশোধ্য।

জেনারেল অর্কপন্থ হাততালি দিয়ে চিৎকার করে উঠল, হিয়ার হিয়ার।

মহামাত্য আবার বলল, দেশের জোয়ান ছেলেরা যাতে দলে দলে দেশরক্ষী বাহিনীতে যোগ দেয় তারজন্য আমরা চেষ্টা করছি। সৈনিক বৃত্তি যে মহান বৃত্তি সে সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রচার করছি। সৈনিক জীবন যে সুখের জীবন সেটাও তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। আশাকরি দেশরক্ষায় নব পাতনের যুবসমাজ এগিয়ে আসবে। জয় পাতনের জয়।

রক্ষা অমাত্য কণ্ঠকণ্টকম এবার উঠল ডায়াসে।

আবার ব্যাণ্ডে নতুন সুর বেজে উঠল।

কণ্ঠকণ্টকম বলল, আপনাদের বিষয় মহামাত্য যথেষ্ট বলেছেন। আপনাদের কত বেশি সুখ সুবিধা দিতে পারি সেই চিন্তাই করছি। বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, সেজন্য আমরা মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করেছি, আপনাদের বেতন শতকরা তিনভাগ বৃদ্ধি করেছি। ভবিষ্যতে আরও সুখ সুবিধা দেবার ইচ্ছা আমাদের রয়েছে। আপনারা যে ভাবে দেশ সেবা করেন তারজন্য সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জয় পাতনের জয়।

জেনারেল অর্কপন্থ পরিসমাপ্তি ভাষণ দেবার পর মহামাত্যকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল ফৌজী ভোজনালয়ে। সেখানে সারি বদ্ধ ফৌজীদের থালায় খাবার দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। স্বয়ং মহামাত্য একজনের থালায় পরিবেশন করল, রক্ষা অমাত্য কণ্ঠকণ্টকম অপর একজনকে খাবার দিল। ফৌজী সেপাইরা জয়ধ্বনি দিয়ে মহামাত্যকে ধন্যবাদ জানাল।

এতক্ষণ মুনিয়া ও নাজুক ছিল দর্শক। সবকাজ শেষ হবার পর নাজুক বলল, বাপরে।

মুনিয়া হেসে বলল, কি বাপ্‌রে।

এত বন্দুক কামান!

কথাটা মহামাত্যের কানে পৌঁছতেই মুখ ফিরিয়ে বলল, এতো অতি সামান্য। আমাদের তুলনায় অন্যান্য দেশে এর পাঁচশত থেকে হাজারগুণ বেশি অস্ত্রশস্ত্র আছে। সে তুলনায় আমরা অত্যধিক দুর্বল।

তাই নাকি!

হ্যাঁ।

ফৌজী ব্যারাক ঘুরেফিরে মহামাত্য এসে উঠল গাড়িতে।

আমারও সফল হবার চেষ্টা করছি। কিন্তু অর্থের অভাবে এগোতে পারছিনা। বিদেশ থেকে আমাদের অস্ত্র কিনতে হচ্ছে, চাই টাকা। টাকার বড় অভাব! মন্তব্য করল মহামাত্য।

আমাদের দেশে অস্ত্র তৈরী করা যায়না?

হয়তো যায়, কিন্তু কারখানা দরকার; দক্ষ কারিগর দরকার। কিছুই নেই আমাদের।

গড়ে তুলুন।

ওটা রাজনৈতিক ব্যাপার। এখনই যদি আমরা তা করতে যাই তা হলে আমরা অনেকের সহানুভূতি হারাব। যার মানে হবে অনাহার। তার চেয়ে কিনে আনাই শ্রেয়।

কিন্তু অনেক লোকের কর্মসংস্থান হোত তাতে।

তা জানি বাঈ। জেনেও কিছুই করতে পারছি না। ভবিষ্যতে পারার আশাও নেই। একটা সাইকেল তৈরীর কারখানা করার ইচ্ছে আছে এ-বছরে।

মোটর নয়?

ধীরে হবে। বিদেশী সহযোগিতা ভিন্ন তা হতে পারেনা। সুযোগ বুঝে তাও করব।

বর্তমানে আমাদের চেয়ে থাকতে হবে বিদেশের দয়ার কণা পেতে! নাজুক কথাটা বলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

উপায় নেই মিসেস সচদেব। আমরা ধীরে ধীরে দেশকে গড়ে তুলতে চাই।

নাজুক কথা না বলে চুপ করে বসে রইল।

তোমাকে ড্রপ দিয়ে আসব কি?—মুনিয়া জানতে চাইল।

মন্দ কি! বলল নাজুক।

মহামাত্য ফিরে এসে প্রাত্যহিক কাজ শেষ করতে বসলো।

প্রতিদিনকার মত সামারসল্ট আর গোরওলা ফাইল নিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে।

ফোন বেজে উঠল।

হ্যালো। কি বলছেন, গুরুজিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? আশ্চর্য। চারদিকে তল্লাসী করুন।

সকাল বেলায় নদীতে গিয়েছিলেন স্নান করতে, স্নান করে গীতা পাঠ করতে করতে ভাঙ্গী অঞ্চলে আসছিলেন। সবাই তাকে দেখেছে। অথচ ঘরে ফেরেন নি।

ফোন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো মহামাত্য।

কিছুক্ষণ পায়চারি করে ডাকলো গোরওলাকে।

আই জিকে ফোন কর। শুনলাম গুরুজিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

গুরুজিকে পাওয়া যাচ্ছে না! আশ্চর্য! বিস্মিত হল গোরওলা।

সামনের ফোনটা হাতে তুলে নিয়ে ডাকল আই জিকে।

হ্যালো হ্যাঁ। মহামাত্যের দপ্তর থেকে আমি গোরওলা বলছি। এইমাত্র মহামাত্য খবর পেয়েছেন যে গুরুজি শ্রীশ্রী ভাণ্ডুল মহারাজজি নিখোঁজ হয়েছেন। আশ্চর্য হচ্ছেন, আমরাও আশ্চর্য কম হইনি। অবিলম্বে তদন্তের ব্যবস্থা করুন। মহামাত্য বিশেষ চিন্তিত। প্রতি ঘণ্টায় এই দপ্তরে সংবাদ দেবেন। নমস্কার।

ফোন ছাড়ল গোরওলা।

মহামাত্য ডাকল, গোরওলা, গাড়ি রেডি করতে বল। আমি

দেখতে যাব। কিছুই বুঝতে পারছি না। কোথায় যেন অলৌকিক কিছু ঘটেছে।

গোরওলা বেরিয়ে গেল গাড়ি ঠিক করতে।

মহামাত্য বের হচ্ছিল, বাধা পেলো মুনিয়ার আগমনে।

কোথায় যাচ্ছ ড্যাডি!

গুরুজি নিখোঁজ সকাল থেকে।

মুনিয়া বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে রইল মহামাত্যের দিকে।

বিশ্বাস করতে পারছিস না? আমিও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি, কিন্তু গুরুজির আশ্রম থেকেই খবরটা দিয়েছে দীনদয়াল। তাই আমি নিজেই যাচ্ছি। গোরওলা।

ইয়েস স্যার।

সব অমাত্যকে খবরটা দাও। তাদেরও গুরুজির আশ্রমে যেতে অনুরোধ কর। চল মুনিয়া, আমরা সরজমিন দেখে আসি কি ঘটনা।

মুনিয়াকে সঙ্গে করে বের হলো মহামাত্য।

ঘণ্টা খানেক পরে মুখ কালো করে ফিরে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসলো।

আবার ফোন ধরল মহামাত্য।

হ্যালো। আমি মহামাত্য। পাতনের সর্বত্র সংবাদ পাঠানো হয়েছে? কোন হদিস পাওয়া যায়নি? রেলপথ, মোটর পথ সর্বত্র নজর রাখতে বলুন। ইয়েস, ডেভালপমেণ্ট প্রতি ঘণ্টায় জানাবেন। আচ্ছা, আচ্ছা।

ফোন ছেড়ে দিয়ে হতাশ ভাবে গা এলিয়ে দিলো ইজি চেয়ারে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হল মন্ত্রীপরিষদের সদস্যরা, প্রতি অমাত্য ও অর্ধ অমাত্য দল। সবার চোখে উৎকণ্ঠা। মহামাত্যের অবস্থা দেখে সবাই আরও ঘাবড়ে গেল।

অমাত্য পানিগ্রাহী বলল, বেতারে সারা পৃথিবীতে সংবাদটি প্রচার করা হয়েছে।

তাতেও ফল হবে না। গুরুজি কদিন থেকেই রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের কথা চিন্তা করছিলেন। কিন্তু এভাবে সকলের অজান্তে যে চলে যাবেন তা ভাবতে পারি নি। তবু ও তাকে খুঁজে বের করা হল আমাদের ধর্ম।

নিশ্চয় নিশ্চয়। সবাই বলল।

পানিগ্রাহী মৃদুস্বরে বলল, জাতির উদ্দেশ্যে আপনি যদি একটা ভাষণ দিতেন।

লাভ ?

লাভ লোকসান নয় মহামাত্য। লোকে বিশ্বাস করবে না। তারা মনে করবে গুরুজির আত্মগোপনের পশ্চাতে আমাদের হাত আছে এবং তা উদ্দেশ্যমূলক। সেজন্য অবস্থাটা পরিষ্কার করে জাতিকে জানিয়ে দেওয়া দরকার মনে করি। সামনে নির্বাচন। এর প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে হতে পারে।

এখুনি একটা ভাষণ লিখে দিন। তাতে যেন এনকোয়ারি কমিশন বসাবার ব্যবস্থাটার উল্লেখ থাকে। আমরা তা হলে জন-সাধারণকে বলতে পারব যে গুরুজির অন্তর্ধান একটা আকস্মিক ঘটনা।

পানিগ্রাহী ডেকে পাঠালো স্টেনোগ্রাফারকে।

বক্তৃতার খসরা তৈরী হল।

বিশেষ ঘোষণায় বেতার মারফত জানিয়ে দেওয়া হল মহামাত্য আজ রাত আটটায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন।

গুরুজির নিরুদ্দেশ সংবাদ তখন সমগ্র দেশে পৌঁছে গেছে। সর্বত্র শোকের ছায়া।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফোন আসছে মহামাত্যের দপ্তরে কিন্তু গুরুজির কোন হদিস দিতে পারছে না পুলিশ।

রাতের বেলায় মহামাত্য ভাষণ দিলো জাতির উদ্দেশে। ঘোষণা করলো, গুরুজির অন্তর্ধান একটা গুরুতর ঘটনা। এটা হল জাতির

পক্ষে সব চেয়ে দুঃখদায়ক। আগামী দিনটি শোক দিবস রূপে পালিত হবে। তদন্ত চলছে গুরুজিকে খুঁজে বের করবার। এর জন্য একটি অনুসন্ধান কমিশনও গঠন করা হল।

নাজুক বাঈকে আজকাল আর ঘরে পাওয়া যায় না। অনেক রাতে যখন ফিরে আসে তখন সচদেব শুধু শুনতে চায়, কাজ কতদূর এগোলো।

নাজুক বলে, এগোচ্ছে। তোমাদের মহামাতা যেমন কড়া লোক, সহজে কাজ আদায় করা যায় কি!

মদের ঘোরে সচদেব বলে, তা ঠিক।

ধীরে ধীরে কাজ উদ্ধার করতে হয়। তাড়াতাড়ি করতে গেলে গলায় ফাঁস পড়বে, বুঝেছ।

বুঝেছি। কিন্তু ছয়লাখ টাকায় কথা ভুলতে পারছি না নাজুক।

তা পাবে। তবে অপেক্ষা করতে হবে।

দিনের পর দিন কাটে। এইভাবে পেরিয়ে গেল ছ'টা মাস।

অস্থির হল সচদেব।

মনের কথা মুখে প্রকাশ করতে পারছিল না।

হঠাৎ এক রাতে নাজুক ফিরে এসে বলল, বিনামা কোম্পানী কনট্রাক্ট পেয়েছে, এবার তোমার টাকা আদায় করে নিয়ে এস।

কি করে সম্ভব হল?

সে কথা শোনার তোমার এক্তিয়ার নেই।

সচদেব কোন কথা না বলে পরের দিন সকালে গেল বিনামা কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেকটারের কাছে। সহর্ষে বলল, কাজ হাসিল?

হাঁ সাব।

এবার আমার ইনাম আর পার্টির টাকা।

অবশ্যই পাবেন।

চেক বই বের করতেই সচদেব বলল, তিনটি চেক হবে। এক -লাখের, পাঁচলাখের আর পঁচিশলাখের। সব গুলো সেল্‌ফ চেক। একটা আমার, একটা মহামাত্যের ব্যক্তিগত, আরেকটা তার পার্টির। বুঝলেন তো।

বেশ বুঝেছি।

চেক লিখে তুলে দিল সচদেবের হাতে।

একলাখ আর পাঁচলাখের চেক দুটো পকেটে রেখে সচদেব গেল মহামাত্যের দপ্তরে। মহামাত্য সবে দপ্তরে বসেছিল। সচদেব তাঁর টেবিলের ওপর রাখল পঁচিশলাখের চেকখানা।

মহামাত্য একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, ধন্যবাদ।

এর বেশি প্রাপ্য সচদেবের নয়।

পড়িমরি করে সচদেব ব্যাঙ্কে গেল চেক ক্যাশ করতে। সেখান থেকে টাকা নিয়ে সোজা নিজের ফ্ল্যাটে। নাজুক তখন ঘরে নেই। ড্রয়ারে টাকাগুলো বন্ধ করে ফিরে গেল দপ্তরে।

রাতের বেলায় নাজুক দুখানা কাগজ সামনে ধরে বলল, নতুন খবর আছে।

কি খবর ?

মহামাত্যের দপ্তরে রিসেপস্যানিস্টের চাকরি পেয়েছি আমি, এই তার নিয়োগপত্র।

একখানা কাগজ এগিয়ে দিল নাজুক।

সচদেব বলল, ভালই হল, লছমী দেবী এইভাবেই দয়া করেন।

আরও দয়া করেছেন লছমী দেবী। এই দেখ, কানাডায় সেকেণ্ড সেক্রেটারী পদে তোমাকে বহাল করে ট্রান্সফার অর্ডার দিয়েছেন স্বয়ং মহামাত্য।

মুখ শুকিয়ে গেল সচদেবের।

তুমি এখানে থাকবে আর আমি যাব কানাডা।

তাই তো তুমি চেয়েছিলে মিস্টার সচদেব। তুমি চেয়েছিলে

টাকা, তুমি চেয়েছিলে ভোগ। তুমি তো সংসার চাওনি, আমাকে চাওনি, সন্তান চাওনি, চেয়েছ ভোগ আর অর্থ। তার ব্যবস্থাই করেছি পতিব্রতা নারীর মত, এর চেয়ে বেশি কি চাও।

সচদেব কোন উত্তর দিতে পারল না। করুণ ভাবে নাজুকের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কঠিন গলায় নাজুক বলল, এর বিনিময়ে এমন কিছু দিতে হয়েছে আমাকে, যেটা তোমাকে বলতে পারব না। যুগধর্মকে সম্মান করেছি। বর্তমান পাতন রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করতে যা করেছি তা তোমার পক্ষেও অকল্পনীয়।

নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে যবনিকা উত্তোলিত হল পূর্বায়তন রাজ্যের রাজধানী চোরকাটায়।

মহামান্য মহামাত্য আসছে। পথঘাট সাজানো হয়েছে। রাজ্যপ্রমুখ ফরেস্টার অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত হয়েছে। অমাত্য, তিনপোয়া অমাত্য, অর্ধ অমাত্যরা ট্রেনিং নিচ্ছে কি করে পা-ফাঁক করে দাঁড়াতে হবে, কি করে মহামাত্যের গলায় মালা পরিয়ে দিতে হবে, কি ভাবে তোষণ বাক্য শোনাতে হবে তাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে পথ দিয়ে মহামাত্য রাজগৃহে আসবে সে পথটি মেরামত করা হয়েছে। আশেপাশে যত ভিখিরী ছিল তাদের বিতাড়িত করার দায়িত্ব নিয়েছে নগরপাল। পুলিশ বাহিনী পথ ও পথিপার্শ্বে রং মাখাচ্ছে পথকে মনোরম করতে। চারিদিকে সাজ সাজ রব। সবাই সেই নির্দিষ্ট দিনটির প্রতীক্ষা করছে অধীর আগ্রহে।

কর্মতালিকাও ঠাসা। সামনে নির্বাচন। যে নির্বাচনী ইস্তাহার তেরী হয়েছে, সেই ইস্তাহার অনুসারে বক্তব্য রাখবে মহামাত্য। তার ডিসগ্রেস পার্টির সদস্যরা গোবিন্দপুরের মাঠে বিরাট প্যাণ্ডেল বাঁধছে। কয়েক শত লরী ভাড়া করা হয়েছে দর্শক ও শ্রোতাদের

শহরের উপকণ্ঠ থেকে ময়দানে নিয়ে আসার জন্য। অনুষ্ঠানের ও ব্যবস্থার কোথাও ত্রুটি নেই।

বিমান ক্ষেত্রে নামলো মহামাত্য।

পুলিশ ব্যাণ্ডে জাতীয় সঙ্গীত শোনা গেল।

বিমান ভূমি স্পর্শ করতেই এগিয়ে গেল রাজ্যপ্রমুখ আর অমাত্য মণ্ডলী। রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাল তাকে। গাড়ির মিছিল চলল মহামাত্যকে নিয়ে। শতাধিক গাড়ির মাঝে খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে জনতার অভিবাদন গ্রহণ করতে করতে এগিয়ে চলল মহামাত্যের গাড়ি। মহামাত্যের সঙ্গে এসেছে তার ব্যক্তিগত কর্মচারীর দল আর কন্যা মুনিয়া, রিসেপস্যানিস্ট নাজুক সচদেব।

গাড়ির মিছিল শেষ হল রাজগৃহে।

গোপন কক্ষে আলোচনা হল অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রীদের সঙ্গে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে মহামাত্য গেল হরেক গৃহের উদ্বোধন করতে।

দুপুর বেলায় ফিরে এসে মিলিত হল পার্টি মেম্বারদের সঙ্গে।

সামনে নির্বাচন।

আজ নির্বাচনী সভার উদ্বোধন করবে মহামাত্য।

দুপুর তিনটে না বাজতেই হাজার দুয়েক প্রাইভেট গাড়ি এসে দাঁড়াল গোবিন্দপুর ময়দানের রাস্তায়। পরপর দু হাজার লরীতে করে হাজার হাজার মানুষ এল উপকণ্ঠ থেকে। তাদের ভাষা আর পূর্বায়তনের ভাষা এক নয়। ময়দান লোকে লোকারণ্য। স্থানীয় লোকের ভিড় বড় কম। অবশ্য এই সামান্য ঘটনা চোখে পড়েনি মহামাত্যের। বেলা পাঁচটা বাজতেই মহামাত্য উপস্থিত হল ময়দানে। জয়ধ্বনি দিল জনতা। সভায় পা দিয়েই তারা বুঝতে পারল, সভার শ্রোতারা সব মেকি আসল শ্রোতারা আসেনি কেউ।

ডায়াসে দাঁড়িয়ে মহামাত্য ব্যাখ্যা করলো পাতন রাজ্যের উন্নতি ও তার কারণ। বললো, কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল লোক সরকারের বিরূপ সমালোচনা করে থাকে, কিন্তু তারা কখনও বলে না আমাদের

এই মহান ডিসগ্রেস পার্টির সরকার দেশের কত উন্নতি করেছে। আমরা রামুনদীতে বাঁধ দিয়ে চাষের প্রসার করেছি, আমরা তিনটে নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপন করেছি। গ্রামে গ্রামে শত সহস্র প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আমরা সর্বদা সচেষ্ট। আমরা নতুন কারখানা বসিয়ে বৈষয়িক উন্নতি ঘটিয়েছি। জন সাধারণের মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি হয়েছে, ভোগ্যপণ্য যথেষ্ট উৎপাদন করছি। এসব কোন কথাই ওরা স্বীকার করেনা। ওরা শুধু আমাদের ত্রুটি গুলোই খুঁজে বেড়ায়। মক্ষিকা যেমন ব্রণ খুঁজে বেড়ায়, ওদের কাজও তাই।

চিৎকার শোনা গেল, শেম্ শেম্।

আমরা ভোট ভিক্ষা করতে আসিনি। পাতন রাজ্যের নাগরিক-দের আমরা ভোটের অধিকার দিয়েছি। সেই ভোট পেয়ে আমরা প্রশাসনে এসে দেশেব উন্নতি ঘটিয়েছি। এখন আমরা ভোট দাবী করতে পারি। আজ আমরা আপনাদের কাছে এসেছি সেই দাবী জানাতে। আশাকরি আপনারা সবদিক বিবেচনা করে আমাদের ভোট দিতে কুণ্ঠিত হবেন না

জয়ধ্বনি উঠল।

করতালি দিয়ে জনতা সম্বর্ধনা জানাল সেই ভাষণকে।

ডিসগ্রেস পার্টির বিশেষ সভায় মহামাত্য বিশেষ উদ্বেগের সঙ্গেই বললো, পূর্বায়তন রাজ্যের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, পাতন রাষ্ট্রের যা রাজস্ব আদায় হয় তার শতকরা তিরিশ ভাগ আসে পূর্বায়তন রাজ্য থেকে। অথচ আমি দেখছি সেলাম পার্টি ধীরে ধীরে বেশ শক্ত বনিয়াদ গড়ে তুলছে এ রাজ্যে। এতে মনে হচ্ছে এদেশে থেকে ডিসগ্রেস পার্টি কিছুদিনের মধ্যেই অবলুপ্ত হবে। এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী পার্টির গঠনমূলক দুর্বলতা।

একাক্ষিবাবু পাশেই বসেছিল। মুখ গম্ভীর করে বলল, মহামাত্য যদি অভয় দেন, তা হলে একটা কথা বলতে চাই।

বলুন।

সেলাম পার্টিকে সিধে করতে কয়েক ঘণ্টা সময়ের দরকার। সে সময় দিতে আপনি কি রাজি?

তাতে খুনোখুনি হবে, বললো মহামাত্য।

তা হবে, মন্তব্য করল একাক্ষিবাবু।

সেকসপীয়রের উপদেশ মনে আছে কি! একজন খুনী সহস্র খুনী সৃষ্টি করে। তাতে লাভ হয় না। ভবিষ্যতে নিজেদেরও মূল্য দিতে হয় অপকার্যের শামিল হয়ে।

তা বিনা রাস্তা নেই।

তবে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। সরকার কিন্তু আইন মেনে চলবে।

তাতেও আপত্তি নেই। বিচরালয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করা সহজ নয়। যবনেরা যে আইন করে গেছে তাতে অপরাধী চিরকালই খালাস পায়।

ভেবে দেখুন। বেশি হঠকারিতা পতনের পথ খুলে দেয়। তাতে পাতন রাষ্ট্রের ক্ষতি। যদি এ রাজ্য আমাদের হাত ছাড়া হয় তা হলেও আমাদের গুরুতর ক্ষতি।

এতেও যদি না হয় তা হলে বিভেদ সৃষ্টি করব।

দাঙ্গা হবে একাক্ষিবাবু।

তা না হলে জনমত পরিবর্তন করাতে পারব না। জনমতকে বৃহৎ চিন্তা থেকে ক্ষুদ্র চিন্তায় টেনে আনতে হলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা না বাধিয়ে উপায় নেই। তাই করতে হবে শেষ পর্যন্ত।

এটা কি পথ? প্রশ্ন করলো মহামাত্য।

নিরুপায়ের ঐ গুলোই পথ, বলল একাক্ষিবাবু।

অসম্মতি জানাতে পারলো না মহামাত্য। পূর্বায়তন রাজ্যের ভাগ্য পার্টির হাতে ছেড়ে দিতেও ভরসা পাচ্ছিলো না, অথচ করবারও কিছুই ছিলনা।

সভা শেষ হবার আগে আবার মনে করিয়ে দিলো, এরাজ্য যদি হাত ছাড়া হয় তা হলে গোটা পাতনরাজ্যই হাতছাড়া হবে ধীরে ধীরে। ডিসগ্রেস পার্টির অস্তিত্বই থাকবে না এখানে।

মহামাত্য ফিরে গেলো রাজধানীতে।

একাক্ষিবাবুর দল ব্যস্ত হয়ে উঠল নিজেদের ক্ষমতা রক্ষা করতে। গোপনে আদেশ ও নির্দেশ দিল, সেলাম পার্টি যেন কোন ক্রমেই কোন সভা করতে না পারে। ওদের সভা পণ্ড করতে গড়ে তুলল লোকসেবী দল। তাদের বেতন দিয়ে, ভাতা দিয়ে, ভাল ভাবে ট্রেনিং দিয়ে ছেড়ে দিল মাঠে ময়দানে। সেলাম পার্টিকে উৎখাত করতেই সে আয়োজন।

পাতনের রাজধানীতে বসেই সংবাদ পেল মহামাত্য।

সংবাদ পেল, পূর্বায়তন বড়ই চঞ্চল। জনমত ডিসগ্রেস পার্টির বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তবুও তার আশা, পার্টি আবার ক্ষমতায় ফিরে আসবে।

মুনিয়াও খুব আশাবাদী।

সেও ভরসা রাখে পার্টির ওপর। তবুও মাঝে মাঝেই তার মনে হয়, পূর্বায়তনের প্রশাসন ব্যবস্থায় বিশেষ গলদ রয়েছে। যার পরিণামে জন মনে অশ্রদ্ধা জন্মেছে তাদের পার্টির ওপরে।

খাবার নেই ড্যাডি পূর্বায়তনে।

জানি। খাবার দিলেও সমস্যার সমাধান হবে না বেটি। উৎপাতন রাজ্য থেকে যে কয়েক লক্ষ মানুষ এসেছে ঐ রাজ্যে তারাই অশান্তি বেশি সৃষ্টি করছে।

উপায় ?

ওদের আশ্রয় ও জীবিকার দিকে নজর না দেওয়া।

তাতে আরও অশান্তি সৃষ্টি হবে।

উত্তর রাজ্যে উৎপাতনরাজ্য যে ভাবে অশান্তি সৃষ্টি করেছে তাতেই আমরা বিব্রত। আবার যদি পূর্বদিকেও এই অশান্তি

প্রসারিত হয় তা হলে ভবিষ্যতে দক্ষিণ ও পশ্চিমেও অশান্তি সৃষ্টি হবে।

ভাবতে হবে বেটি। মন্ত্রী পরিষদের সভায় আলোচনা করে স্থির করতে হবে কি করণীয়।

মহামাত্য চিন্তিত। গত পাঁচ বছরে একদিনও তাকে এত চিন্তিত কেউ দেখেনি। সব কাজ ফেলে মহামাত্য শুধু পূর্বায়তনের ফাইল দেখে আর চিন্তা করে প্রতিকারের পথ।

নাজুক সচদেব আজ কাল বাইরের কাজে ব্যস্ত।

মাঝে মাঝেই অন্যান্য অমাত্যদের সঙ্গেও তাকে দেখা যায়।

মুনিয়া অনুযোগ করে, কোথায় যাও তুমি ?

নাজুক শুধু হাসে।

আজকাল ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে নাজুক ওঠা বসা করে। বিশেষ করে তাকে দেখা যায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ভবনে। মাঝে মাঝেই মার্কিন দূতাবাসের কর্মচারীদের সঙ্গে জেনারেল অর্কপন্থের গৃহেও যায় নাজুক।

সচদেবের চিঠি আসে মাঝে মাঝে।

যথাসময়ে সেসব চিঠির উত্তর দেবার অবসরও পায় না নাজুক। আজকাল রাজধানীর সবচেয়ে ব্যস্ত মহিলা সে। মহামাত্যের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ স্থানে যেমন যেতে হয় তেমনই তাকে বড় বড় সার্কেলে ঘুরতে হয়।

ছুটি পেয়ে কয়েক দিনের জন্য সচদেব এসেছিল পাতনের রাজধানীতে। এসে দেখে নাজুক আর সে নাজুক নেই। তার কাজের ফিরিস্তি শুনে সে অবাক।

বলল, এই ভাবে কত কাল চলবে নাজুক।

যত কাল চলে !

মেয়েটার যে দুর্দশা হচ্ছে।

নাজুক হেসে বলে, টাকা চাই, ভোগ চাই। এইতো তুমি শিখিয়েছ আমাকে।

তারও মাত্রা থাকা দরকার। মন্তব্য করে সচদেব।

রাশ আগলা করলে তাকে টেনে ধরা কত কঠিন তাতো তুমি জান। শেষ পর্যন্ত আর টানাই যায় না। আমারও সেই অবস্থা।

কিন্তু মার্কিন দূতাবাসে যাতায়াত কি অসঙ্গত হচ্ছে না?

নাজুক হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল।

হাসছ কেন?

টাকা।

মানে?

ওরা টাকা দেয়, আমি যোগাযোগ সৃষ্টি করে দিই, এ ভাবেই ওরা গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে।

কারা এ সংবাদ জোগায়?

যারা মোটা মোটা মাথা। কেউ অমাত্য, কেউ দলের নেতা, কেউ জেনারেল, কেউ সামান্য ছোট। আমার এত সবে দরকার কি। আমার চাই অফুরন্ত টাকা। টাকার পাহাড় দেখতে চাই। আমার দেশ নেই, জাতি নেই, আমার নীতি নেই, শুচিতা নেই, আমার প্রয়োজন টাকা। সেই টাকার সাধনা করছি মিস্টার সচদেব। আর সে শিক্ষা পেয়েছি তোমার কাছে।

সচদেব আর কিছু বলার মত ভাষা খুঁজে পেল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল নাজুকের দিকে।

কি দেখছ? ভেবেছ আমি মদ খেয়েছি। তা খাই তবে সামান্য। আজ খাইনি। মাতালও হইনি। সত্যি কথা বলছি। আর কেউ জানতে পারেনি, তুমি স্বামী তাই তোমাকেই বলছি।

সচদেব কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালেই বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে গিয়ে ছুটি বাতিল করে বিমানে চেপে বসল। যাবার সময় নাজুকের সঙ্গে দেখা করারও কোন চেষ্টাই করল না। বিমান বন্দরে বসে বিদায় পত্র লিখে ডাকে দিল।

নাজুকের কাছে সচদেবের চিঠি গেল পরদিন বিকেলে, চিঠি পেয়ে হেসেই বাঁচে না নাজুক। নীতিজ্ঞানটা আরও দু'বছর আগে যদি জন্মাতো সচদেবের মনে, তাহলে আজ তাকে টাকার নেশায় পথে পথে ঘুরতে হত না। স্বামী আর কন্যাকে নিয়ে সুখেই ঘর করতে পারত সে।

মুনিয়া তাকে বলেছিল, টাকার নেশা হল সর্বনাশা নেশা। যার মনে একবার টাকার নেশা জন্মে যায়, সে টাকার জন্য ভালমন্দ সব কাজই করতে পারে।

নাজুক সেদিন তার কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। আজ সে বিশ্বাস করে। টাকার জন্য দেশের ও দশের কত বড় সর্বনাশ সে করছে তা সে জানে।

জেনে শুনেই নাজুক নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে অপকর্মের পথে। সচদেব তার কৃতকর্মের ফললাভ করে মুখ বুজে ফিরে গেছে তার কর্মস্থলে। নাজুক এখন উঁচুতলার মানুষদের উপাস্য দেবী। তার মিঠে হাসি আর চটুল নয়নের কটাক্ষ কণার কৃপা লাভ করতে করজোড়ে অপেক্ষা করে বহু উঁচুদরের মানুষ।

একমাত্র মেয়ে অলিকে পাঠিয়েছে কোন পাহাড়ী স্বাস্থ্যনিবাসে। সেখানেই একটা হোটেলে থাকে সে। নাজুকের ফ্ল্যাট খালি। ঘরের আলমারিগুলোয় নানাজাতীয় বিভিন্ন দেশের সুরাভর্তি বোতল, অতিথি আপ্যায়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছে নাজুক। সারাদিনের কর্মক্লান্তি নিয়ে নাজুক যখন ফিরে আসে তখন পুরুষ সঙ্গী কেউ না কেউ তাকে পৌঁছে দিয়ে যায় তার ঘরে। অনেক সময়ই অস্থির থাকে তার পদক্ষেপ।

নাজুক ভেবেছে চাকরির প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে। তবুও চাকরি ছাড়তে পারেনি। মহামাত্যের সঙ্গে যোগাযোগ থাকাটাই তার বহির্জীবনের সবচেয়ে বড় লাভ। অনেক খুঁজে পেতে দেখেছে, মহামাত্যের পোষা কুকুরটা বাদ দিয়ে কোন জীবিত মানুষ ছিল না

মহামাত্যের ও তার স্ত্রীর পরিবারে, যে কোন না কোন উঁচু রাজপদে বসে নি। যেহেতু কুকুরটা নাম সই করতে পারে না সে-হেতু সে কোন চেয়ারে বসবার অধিকার পায় নি। অবশ্য মহামাত্যের কোলে বলার অধিকার তার অক্ষুণ্ণই আছে। মহামাত্য স্বজন পোষণ করছেন, অর্থ সংগ্রহ করছেন বিশেষ ব্যবস্থা করে, তা যদি দোষের না হয়, তা হলে নাজুকের পক্ষেও অর্থোপার্জনের এই বর্তমান পদ্ধতি মোটেই আপত্তিজনক নয়।

সেদিন মার্কিন দূতাবাসের উঁচুপদের কর্মচারী জোনাথানের গাড়িতে করে নাজুক এসে নামল তার ফ্ল্যাটের দরজায়।

বিদায় নেবার সময় জোনাথান সাগ্রহে নাজুককে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে রাক্ষসের মত চুম্বন দিল তার ঠোঁটে।

কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে নাজুক বলল, এটা আমার পছন্দ নয়।

জোনাথান হেসে বলল, আমারও নয়। কিন্তু যে সার্ভিস দিচ্ছ তুমি মার্কিন জাতিকে, তার মূল্য অর্থ দিয়ে নিরুপিত করা দুঃসাধ্য, তার মূল্য নিরুপিত হতে পারে একমাত্র ভালবাসা দিয়ে।

তাই নাকি, ঠোঁট উল্টে নাজুক তার সুঠাম দেহটা সটান এলিয়ে দিল ইজিচেয়ারে।

জোনাথান বলল, তোমাদের মেজর জেনারেল আবলুস খান সত্যিই কাজের লোক।

কেন?

প্রত্যেক দেশেই আমাদের স্বপক্ষে আর বিপক্ষে কাজ করার লোক আছে। আমাদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বজায় তখনই থাকবে যখন স্বপক্ষের লোকেরা থাকবে প্রশাসনের উঁচু তলায়। আমরা চাই বিপক্ষীয় যারা তারা যেন ক্ষমতায় না থাকে।

স্বাভাবিক।

তাই স্বপক্ষীয়দের তালিকা তৈরী করতে বলেছিলাম মেজর জেনারেল আবলুস খানকে। আজ সেটা পেয়েছি।

আবলুস খান কিন্তু বিনামূল্যে কোন মহৎ কার্য করে না কোন কালেই।

অবশ্যই তাকে এজন্য বিশেষ মূল্য দিতে হয়েছে। তবে কথা আছে, প্রশাসনের উঁচু তলায় যারা আছে তাদের মধ্যে যারা বিপক্ষীয় তাদের স্থানচ্যুত করতে হবে। স্বপক্ষীয়দের ধীরে ধীরে টেনে তুলে বসাতে হবে সেই সব স্থানে। মাসিক বরাদ্ধ তিরিশ হাজার টাকা। তবে এক বৎসরের মধ্যে কাজ হাসিল করতেই হবে। আবলুস খান রাজি হয়েছে। প্রথম কিস্তির টাকাও আজ দিয়েছি। একাজ সম্ভব হত না যদি তোমার সাহায্য না পেতাম নাজুক।

সে আমার সৌভাগ্য! কিন্তু যে মূলাধার তার মূল্য মাত্র দশ হাজার! আশ্চর্য! তোমাদের বিচার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারলাম না জোনাথান।

তোমার কাজের মূল্য দেবার সামর্থ্য কারও নেই নাজুক।

দেখ জোনাথান, ওসব মিষ্টি কথা শোনার মত মেয়ে আমি নই। টাকার প্রয়োজনেই তোমাকে সাহায্য করেছি, টাকার কমতি হলে সাহায্যের অঙ্কও অনুপাতিক হারে কমবে।

রাগ করছ নাজুক। আমাদের কি টাকার অভাব আছে। কোটি কোটি টাকার খাদ্য দিচ্ছে আমাদের সরকার। কোটি কোটি টাকার কারিগরি সাহায্য পাচ্ছে পাতন রাজ্য। কতটা চাই তোমার?

নাজুক কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, আমার একটা মেয়ে আছে।

তোমার মেয়ে আছে!

হ্যাঁ। তাকে তোমাদের দেশে পড়তে পাঠাব মনে করেছি। আমার এতটাকা নেই যে সেখানকার ব্যয় বহন করি। তুমি যদি তার পাঠ্যজীবনের সব ব্যয় বহন করার দায়িত্ব তোমাদের সরকারের ওপর চাপিয়ে দিতে পার তা হলে তোমরা যদি কিছু কম মজুরীও দাও তাতে আপত্তি নেই।

এরজন্য কোন ভাবনা নেই নাজুক। তুমি একটা দরখাস্ত করে দাও। সাতদিনের মধ্যেই তার ব্যবস্থা করে দেব।

কাল তোমার অফিসে দরখাস্ত পাঠিয়ে দেব। আরও একটা কাজ কবতে হবে জোনাথান।

তোমার সেবা করতে আমি প্রস্তুত।

আমার প্রাপ্য টাকা তোমাকে এদেশে দিতে হবে না। আমার টাকা তোমাদের দেশের কোন ভাল ব্যাঙ্কে জমা দেবার ব্যবস্থা করবে। আমি এখানে বসেই একাউন্ট খুলতে চাই নিউইয়র্ক অথবা ডেট্রয়েটের কোন ব্যাঙ্কে।

অবশ্যই তা করে দেব। কিন্তু এদেশেই তো তোমার টাকার দরকার। আমাদের দেশে টাকা জমিয়ে কি হবে?

নাজুক ইজিচেয়ার থেকে উঠে দুহাত দিয়ে জোনাথানের গাল চেপে ধরে বলল, ফুল্। তুমি একটা বোকা লোক। আমি যা করছি তা দেশের লোক চিরকাল পছন্দ করবে না। একদিন না একদিন আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। তার আগেই আমাকে যেতে হবে দেশ ছেড়ে। তখন তোমাদের দেশ ভিন্ন আর কোথায় আশ্রয় পাব বলত? সে দিন আমার এই বিলাস বহুল জীবনের ব্যয় বহন করব কি করে? বুঝতে পারছ জোনাথান। এরজন্যই অর্থটা তোমার দেশে জমিয়ে রাখতে চাই।

জোনাথানের রঙীন চোখের রঙ ক্রমেই ফিকে হতে থাকে।

তবে মনে মনে স্বীকার করে, এ রকম বুদ্ধি না থাকলে মার্কিন সরকারের স্বপক্ষে কাজ করা নাজুকেরও সম্ভব হত না। মুখে বলে, তার ব্যবস্থা আমি করে দেব। একটা সপ্তাহ সময় চাই।

নাজুক জোনাথানের কপালে চুমু দিয়ে বলল, তুমি দীর্ঘজীবী হও।

জোনাথান ফিরে গিয়েছিল শেষ রাতে!

রাতের ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে বেশ বেলা হয়েছিল সেদিন।

নাজুক স্নান সেরে বেরিয়ে পড়ল দপ্তরের পথে।

হেঁটেই যাচ্ছিল, বাধা পেল সুমতির ডাকে।

কোথায় যাচ্ছিস নাজুক!

মুখ ফিরিয়ে নাজুক দেখতে পেল একটা ইম্পালা গাড়ি। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছে সুমতি।

দপ্তরে যাচ্ছি। তুমি কোথায় চললে?

সরকারী দপ্তরেই যাব। চল আমার সঙ্গে।

নাজুক ভাল করে দেখল গাড়িখানা।

কথা না বলে দরজা খুলে উঠে বসল গাড়িতে।

সোফার গাড়ি ছাড়তেই সুমতি জিজ্ঞেস করল, নতুন খবর কি?

নতুন খবর আর কিছু নেই সুমতি। সেই পুরানো খবর। উৎপাতনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলছে। উৎপাতন বলছে, উত্তর অঙ্গ রাজ্যটি তাদের প্রাপ্য, আমরা বলছি আমাদের প্রাপ্য। ওরা বলছে তোমরা গণভোট করে স্থির করতে চেয়েছিলে উত্তর অঙ্গরাজ্যের ভবিষ্যৎ। এবার গণভোট কর।

সত্যিই তো। মহামাত্য বলেছিল গণভোটে উত্তর অঙ্গরাজ্যের ভাগ্যস্থির হবে। তাদের দাবী তো অন্যায় নয়।

কিন্তু মহামাত্য জানেন, রাক্ষসপ্রধান উত্তর অঙ্গরাজ্যটি গণভোট হলে, পাতন পরিত্যাগ করে উৎপাতন রাষ্ট্রেই যোগ দেবে, সেজন্য গণভোটে এখন আর রাজি নন মহামাত্য।

সুমতি বলল, যেদিন উত্তর অঙ্গরাজ্যটি যবনদের আইন অনুসারে পাতন রাষ্ট্রে যোগ দিয়েছিল তখনই এ মামলার শেষ হওয়া উচিত ছিল। কেন যে মহামাত্য তখন গণভোটের কথা বলেছিলেন, তা উনিই জানেন। এর ফলেই একটা অশান্তি জিইয়ে রাখতে পেরেছে উৎপাতন রাজ্য।

মহামাত্য এখন মনে মনে ভাবছেন উত্তর অঙ্গরাজ্যটি বিভক্ত করে পাতন ও উৎপাতন রাষ্ট্রকে দেওয়ার কথা।

শুনেছি উত্তর অঙ্গরাজ্যটি ভাগ হয়েই আছে।

সেই ব্যবস্থাটিকেই আইনানুগ করতে চাইছেন মহামাত্য।

সুমতি হেসে বলল, শুনেছি পৈতৃক জমিদারী নাকি দান খয়রাত করা যায়। মহামাত্য বোধহয় পাতন রাজ্যটিকে তার পৈতৃক সম্পত্তি মনে করেন।

কথাটা ঠিক তা নয়, বলল নাজুক বাঈ।

বেঠিকও নয়। ডিসগ্রেস পার্টিতে যদি শক্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোন লোক থাকতো তা হলে এরকম হতে পারত না। সবাই ঐ একটি ব্যক্তির ছত্রছায়ে বসে ন্যায় অন্যায়ের যৌক্তিকতাটুকুও ভুলে গেছে। একেশ্বরবাদী আমরা, এক নেতাকে স্বীকার করতে অসুবিধে হচ্ছে না। তেত্রিশ কোটি দেবতার মত মহামাত্যের উপগ্রহগুলো শুধু নামের দেবতা, কাজের নয়। তোর দপ্তর এসে গেছে। একদিন সময় করে আসিস আমার বাড়িতে।

তোমার মত ধনাঢ্য লোকের বাড়িতে যেতে সাহস পাইনে। আমি সামান্য মাইনের কর্মচারী। প্রাণটার মত কাজটাও ক্ষুদ্র। তোরা হলি সোস্যাইটির মাথা। তোর বাবার অঙ্গুলি হেলনেই চলছে পাতন রাজ্যের ভালমন্দ।

কি যে বলিস!

ঠিক কথাই বলছি। মহামাত্য চিৎকার করে বলেছিলেন, জাতীয় করণ করা হবে সব শিল্পের। বাস্। তারপরই আবার ঘোষণা করলেন মিশ্র অর্থনীতি। সরকারী-বেসরকারী সব রকম ব্যবস্থাই থাকবে। এটা কেন হল জানিস? তোর বাবা আর তোর বাবার মত শিল্প-পতিরাও বললেন, তাই হোলো। সামনে নির্বাচন। নাহলে টাকা কোথায় পাবে চাঁদু? দেখবে তখন মজা। আমরা পয়সা দিয়ে কিনে নেব তোমাদের আইনমজলিসের সদস্যদের। তারপর সব যাবে ভেস্তে। তারপর সব ঠাণ্ডা।

সুমতি অতটা ভেবে দেখেনি। অবাক হয়ে শুনছিল নাজুকের কথা।

নাজুক আবার বলল, তারপরও রয়েছে ব্যক্তিস্বার্থ। সবাই অর্থ চায়। সরকারী শিল্পে টু-পাইস তো পায় না অনেকেই, তাই বেসরকারী উদ্যোগের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। অন্যের কি হল তার দরকার কি। টু-পাইস নিজের পকেটে ফেলতে হলে বেসরকারী উদ্যোগ হল সবচেয়ে সুবিধেজনক। মহামাত্য আর ডিসগ্রেসপার্টির সদস্যারা তাই শিল্পপতিদের আব্দার রক্ষা করতে বাধ্য হল। জানিস তো আমাদের ডিসগ্রেস পার্টির আসল সভ্য যারা, তারা সারা জীবন না খেয়ে শুকিয়েছে, এবার পেট ভরে খাবার সুযোগ পেয়েছে। উদরাময় না হচ্ছে এমন নয়। আর অধিকাংশ সভ্যই হল সুবিধা বাদী। তারাও এসে জুটেছে কিছু হাতড়ে নেবার আশায়। তাই মহামাত্যের যুক্তিকে কেউ ঠেলতে পারে না। ইয়েস স্যার-ইয়েস স্যার করে সায় দেয়। গাড়ি থামা। আচ্ছা চললাম। আবার দেখা হবে।

নাজুক বাঈ ধীরে ধীরে নেমে গেল গাড়ি থেকে।

সুমতি ভেবে ঠিক করতে পারল না কি করবে।

সোফারকে বলল, সোজা চল ক্লথমিলে। বাবার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

সুমতি ভেবে আকুল হল, দেশের ভবিষ্যৎ কি!

বণিক স্বার্থ রক্ষা করতে পাতনরাজ্য যদি উচ্ছন্নে যায় তা হলে স্বাধীনতার মূল্য কি!

গাড়ি এসে দাঁড়াল দি গ্রেট পাতন ক্লথ মিলের সামনে।

সুমতি গাড়ি থেকে নেমে সোজা চলে গেল তার বাবার ঘরে।

আজকের প্রমিজটা মনে আছে বাপু?—জানতে চাইল সুমতি।

কি প্রমিজ?

এর মধ্যেই ভুলে গেছ!

নানা কাজের মধ্যে থাকলে অনেক কথাই ভুলে যেতে হয়। এবার প্রমিজটা মনে করিয়ে দাও মা।

আমার এনগেজমেণ্ট-এর কথা মনে আছে তো!

ও, হ্যাঁ! ভুলেই গিয়েছিলাম। তুই তো বলেছিলি একবার কনটিনেন্টটা ঘুরে এসে তবে এন্‌গেজমেণ্ট পাকা করবি। তাই কর মা। এদিকে খুবই হাঙ্গামা। চোরকাটায় যে ক'টা কারখানা আছে সেখানে কুলীরা হাঙ্গামা আরম্ভ করেছে। তাদের মজুরী বাড়াতে হবে। কাল সেখানে যাব মনে করছি।

ফিরবে কবে?

কাল সকালে যাব বিকেলে ফিরব। দেরী করব না মোটেই। তোর ছোট কাকা আবার কাল যাবে অবন্তিকা দেশে। সেখানে একটা নতুন কারখানা খোলার কথা হচ্ছে। দেখুক কি করা যায়।

এত কারখানা দিয়ে কি হবে?

অর্থ মান সম্মান দেশসেবা। হাসল মিস্টার শিয়ালিয়া। তার হাসির শব্দে সুমতি চমকে উঠল।

জানিস সুমি, গোটা পাতনরাজ্যে বেকারের সংখ্যা কয়েক কোটি। তাদের অন্নসংস্থান করতে হলে আরও কারখানা চাই। কারখানা গড়ে তুললে বেকার সমস্যার সমাধান হবে। বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারলে দেশের সেবা করতে পারব।

সুমতি কোন আগ্রহ দেখাল না এ কথায়।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, লোকে অনেক কুকথা বলছে।

যেমন?

তুমি নাকি বিক্রয়কর আর আয়কর ফাঁকি দাও।

অনেকে তাই মনে করে। পূর্বায়তনের এক অফিসার তা নিয়ে খুব মাথা ঘামিয়েছিল। ছুটতে হল চোরকাটায়। সেখানে সব অমাত্যদের বললাম বুঝিয়ে। তারপরেই সেই অফিসার ফতে হয়ে গেল। শোন সুমি, বিক্রয়কর আর আয়কর ফাঁকি আমি দেই না, দেব না। যেটা ফাঁকি দেই সেটা ঘুরিয়ে পেমেণ্ট করতে হয় বিভিন্ন রাজ্যের অমাত্যদের। তাতে আমার আসল মুনাফায় হাত পড়ে না। যদি সত্যি সত্যি সব টাকাটাই দিয়ে দিতাম তা হলে প্রভুদের খুশী

করতে আসল মুনাফায় হাত পড়ত। তাতে আমার লাভটা কোথায় বল দিকি? কুলোকে মনে করে আমি সরকারকে ফাঁকি দেই। তা নয়। সরকারের প্রাপ্য ঘুরিয়ে পেমেণ্ট করি যারা সরকার পরিচালনা করছে তাদের হাতে।

সুমতি অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার বাবার দিকে।

কি ভাবছিস?

আমার পাশপোর্ট কবে পাব?

আজই।

দরখাস্ত করিনি যে এখনও?

দরখাস্ত করে এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, বিকেল বেলায় পাশপোর্ট পাবি।

বেল টিপতেই ছুটে এল একান্ত সচিব রণজিৎপ্রসাদ।

পাশপোর্টের দরখাস্ত ফরম।

আমি তো একা যাব না।

কজন যাবি?

অন্তত তিন জন।

বেশ।

রণজিৎপ্রসাদ বেরিয়ে গেল।

বিকেল বেলায় পাশপোর্ট পকেটে করে শিয়ালিয়া এল ঘরেতে। সুমতি বলল, এত তাড়াতাড়ি কি করে হল?

তুই যে গিদ্ধরলাল শিয়ালিয়ার মেয়ে সে কথা ভুলে যাচ্ছিস কেন।

আমি শুনেছিলাম বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে আজকাল আর কাউকে বাইরে যেতে দিতে চায় না সরকার। তাই পাশপোর্ট পাওয়াও দুষ্কর হয়।

সে আইন দেশের লোকের জন্য। শিল্পপতি শিয়ালিয়ার জন্য নয়।

এক্সচেঞ্জ-এর কি হবে।

কত টাকা দরকার ?

তা মনে কর হাজার তিরিশ।

ব্যাঙ্ক অব জবানপুর-এ আমার একাউণ্ট আছে। যত দরকার নিতে পারবি। আমি ব্ল্যাঙ্ক চেক লিখে দেব। আর সরকারী ভাবে দশ হাজার টাকার এক্সচেঞ্জ করিয়ে দিচ্ছি। কোথায় যাবি প্রথমে।

ইটালি।

তারপর ?

ফ্রান্স, সেখান থেকে যবনরাজ্য হয়ে যাব মাকিন মুলুকে।

গ্রাণ্ড প্রোগ্রাম—ভিসার জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি পাশপোর্টগুলো।

কিন্তু ?

আবার কিন্তু কি ?

আমি তোমার ঐ খটখটিয়ালালকে বিয়ে করতে পারব না।

শিয়ালিয়া গম্ভীরভাবে বলল, খটখটিয়ালাল কোন ক্রমেই তোর অযোগ্য নয় সুমি। বাপের এক ছেলে। ভাই বোন বলতে কেউ নেই। খোটাইরাজ্যে তিনটে সিমেণ্ট কারখানা। ইকরেতিকরে রাজ্যে তেলের ডিপো আঠাশটা। নর্মচরে লোহার কারখানা একটা, বাদশাপুরে একুশটা ক্লথ মিল। যদি শিয়ালিয়া আর খটখটিয়া এক সূত্রে যুক্ত হয় তা হলে সারা পাতনরাজ্যে আমাদের ক্ষমতা হবে অপ্রতিহত। আমাদের দেশে বিয়েটা ধর্মীয় ব্যাপার, কিন্তু আমাদের সমাজে বিয়েটা হল আংশিক রাজনৈতিক, আংশিক আর্থিক। সে দিকে নজর দিতে না পারলে ভবিষ্যতে খুব বিপদে পড়তে হবে। তোর ছোট ভাইয়ের বিয়েতো আমি ঠিক করেই রেখেছি পতাকা পরিবারে। মনোহরলাল পতাকা হল জখম রাজ্যের অমাত্য। ষাটটি চা বাগানের মালিক, তিরিশটি কয়লাখনি তার কব্জায়। এমন লোকের ঘরে ছেলের বিয়ে না দিলে গোটা পাতন রাজ্যকে কণ্ট্রোল করা কি সহজ হবে।

সুমতি মুখ ঘুরিয়ে বলল, শুনেছি পতাকার মেয়ের একটা চোখ বসন্তে নষ্ট হয়েছে। লেখাপড়াও বিশেষ শেখেনি। মডার্ণ কালচারের সঙ্গে বিশেষ পরিচয়ও নেই।

এই তো ভুল হল মা। আমাদের সমাজের বিয়ে হল মেয়ে-পুরুষের বসবাসের আইন সম্মত অধিকার। আর এই অধিকার যখন আমরা সৃষ্টি করি তখন যে রাজনীতি আর অর্থনীতিকে বাদ দিতে পারি না, এ কথা তো তোকে আগেই বলেছি।

চুপ করে রইল সুমতি।

বিকেল বেলায় গাড়ি বের করে দেখা করতে গেল খটখটিয়া-লালের সঙ্গে।

সুমতিকে দেখে খটখটিয়ালাল বোকার মত চেয়ে রইল তার দিকে।

কি দেখছ মিস্টার লাল ?

তুমি হঠাৎ !

দু এক দিনের মধ্যেই ফ্লাই করতে চাই কনটিনেন্টে। যাবার আগে জানতে এলাম তুমিও যেতে পারবে কি না ?

এরকম প্রস্তাবের জন্য খটখটিয়ালাল মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বোকার মত বলল, ধান্দা ছেড়ে যেতে অসুবিধা আছে। বাপুজিকেও জিজ্ঞেস করতে হবে।

সুমতি বলে উঠল, ড্যাম ধান্দা, ড্যাম বাপুজি। শুনেছি আমি তোমার বাগ্‌দত্তা স্ত্রী। আমি বিদেশে যাব, আমার সঙ্গে তোমাকেও যেতে হবে। তার জন্য প্রস্তুত হও। তারিখ ঠিক করে জানাব।

আমতা আমতা করে খটখটিয়ালাল বলল, কাল তোমাকে খবর দেব বাঈ।

স্যরি। তা হবে না। আজ এবং এখনই তোমার মতামত জানতে চাই।

বুদ্ধি ফিরে পেল খটখটিয়ালাল। হেসে বলল, আমি কাল নর্মচরে যাব। আমার ইচ্ছে আমার সঙ্গে তুমিও সেখানে যাবে।

গ্ল্যাডলি। কিন্তু আমার কথার জবাব পাইনি এখনও।

আমি দুঃখিত। বাপুজির মত না নিয়ে যেতে পারব না।

সুমতি আর বিলম্ব না করে গাড়িতে উঠল।

এত তাড়াতাড়ি কিসের ?

অনেক কেনাকাটা করতে হবে বিদেশে যাবার আগে। দেরী করতে পারব না। আচ্ছা আসি। আবার দেখা হবে।

খটখটিয়ালাল কিছু বলবার আগেই গাড়ি বেরিয়ে গেল।

রাতের বেলায় সুমতি গিদ্ধরলালকে বলল, খটখটিয়ালালকে বিয়ে করতে পারব না বাপু।

কেন ?

আমার যোগ্য নয়।

যোগ্যতার প্রশ্ন বাদ দে। বিয়েটা হল অন্য প্রয়োজনে।

সে প্রয়োজন অন্যত্রও মিটতে পারে। অন্য ঘরানা দেখ। আমি বিদেশ থেকে এসে তোমার ফাইন্যাল সিলেকশন জানতে চাই।

শিয়ালিয়া কেমন যেন বিব্রত বোধ করছিল। খটখটিয়ালালের সঙ্গে সুমতি নিশ্চয়ই ঝগড়া করেছে। বুঝতে না পেরে নতুন ফন্দী আঁটলো ব্যাপারটা সহজ করতে।

পরের রাত্রে হোটেল গ্র্যাণ্ডিতে পার্টি দিল শিয়ালিয়া। অমাত্যের দল এল। দেশের যারা মাথা তাদের আগমন ঘটল। শিল্পপতিদের ভিড় জমল। হোস্ট হল শিয়ালিয়া স্বয়ং আর হোস্টেস সুমতি।

কেন যে এই উৎসব তা প্রকাশ করল না শিয়ালিয়া। সে লক্ষ্য করছিল সুমতির চালচলন। ভাল করে দেখল অশোকনাথের টেবিলের আশে পাশে ঘুরছে তার কন্যা সুমতি। খটখটিয়ালালের পাশ দিয়েও হাঁটছে না। অশোকনাথ লোহার ব্যবসায়ী নিকুঞ্জবিহারী

খাটমলিয়ার পুত্র। যবন রাজ্য থেকে ইনজিনিয়ারিং পাশ করে এসে বাপের কারখানা দেখছে চোরকাটায়। ছেলেটা মন্দ নয়।

শিয়ালিয়া সুমতিকে পাশে ডেকে জিজ্ঞেস করল, অশোকনাথের কথা।

সুমতি বলল, আমার বন্ধু।

আজ তোর এনগেজমেণ্ট এনাউন্স করতে চাই।

সুমতির মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, খটখটিয়ালালকে বাদ দিয়ে।

তখন টেবিলে টেবিলে বিদেশী সুরার গ্লাসের শব্দ। অনেকের চোখই স্তিমিত। কোথাও জোড় বেঁধে নাচতে সুরু করেছে নিমন্ত্রিত জন। এমন সময় মাইকে শোনা গেল শিয়ালিয়ার গলা।

বন্ধুগণ,

আজ এই উৎসব যে কেন তাই আপনাদের বলা হয় নি এখনো। সেই বিষয় বলবার অনুমতি প্রার্থনা করছি। আমার একমাত্র কন্যা সুমতি শিয়ালিয়া আগামী সোমবারে কন্টিনেণ্ট পরিভ্রমণে যাবে। বিদেশ ভ্রমণে যাবার আগেই তার এন্‌গেজমেণ্টটা এনাউন্স করতে চাই।

খটখটিয়ালালের চোখের নেশা কেটে গেল। সে নেকটাই ঠিক করে সোজা হয়ে বসল।

শিয়ালিয়া আবার বলল, আমার কন্যার ইচ্ছানুসারে তার এন্‌গেজমেণ্ট এনাউন্স করছি অশোকনাথ খাটমলিয়ার সঙ্গে।

সবাই হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে ধ্বনি দিয়ে মদের গেলাসের আওয়াজ করল।

সুমতি অশোকনাথের হাত ধরে এসে দাঁড়াল সবার সামনে। মাথা নত করে দুজনেই অভিবাদন জানাল সবাইকে।

শিয়ালিয়া বলল, বিয়ের তারিখটা শীগ্‌গীরই জানাবার ব্যবস্থা করছি। আপনাদের শুভেচ্ছা কামনা করি।

বাধা দিল খটখটিয়ালাল।

এ রকম তো কথা ছিল না।

খটখটিয়ালাল কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সবাই তাকে জোর করে বসিয়ে দিল।

সুমতির ঠোঁটে দেখা দিল মৃদু ব্যঙ্গের হাসি।

জেনারেল অর্কপন্থ বিদেশে গেল শুভেচ্ছা সফরে। সঙ্গে গেল বিশেষ এনভয় রঘুরামিয়া। উদ্দেশ্য বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ।

যবনরাজ্যে পৌঁছেই পরিবহনের জন্য কয়েক সহস্র গাড়ির অর্ডার দিয়ে অগ্রিম টাকা জমা দিল রঘুরামিয়া। চুক্তিটা হয়েছিল গোপনে। কোম্পানীর সঙ্গে রঘুরামিয়ার যে সব গোপন কথাবার্তা হয়েছিল তা কেউ জানত না। রঘুরামিয়া মহামাত্যের অতি প্রিয়-জন। তাই সরাসরি মহামাত্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে অগ্রিম টাকা জমা দিয়ে মাল ডেলিভারীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে রঘুরামিয়া।

জেনারেল অর্কপন্থের সঙ্গে এসেছে নৌ ও বিমান বাহিনীর বিশারদরা। পাতন রাজ্যের উপকূল রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন মনে করেই নৌবল বৃদ্ধির জন্য জেনারেল অর্কপন্থ দরজায় দরজায় ধর্ণা দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত যবন রাজ সম্মতি দিলেন রণতরী বিক্রয়ের। কিন্তু সন্ধান নিয়ে জানা গেল, যবনরাজ্যে বিক্রি করবার মত রণতরীর একান্তই অভাব। তাদের নিজস্ব উপকূল রক্ষার মত নৌবলই বর্তমানে নেই। রয়েছে কয়েকখানা ভাঙ্গা রণতরী। যবনরাজ আদেশ দিলেন ওগুলিই মেরামত করে পাতন রাজ্যকে দাও। দেবার আগে রণতরীর নাম বদল করে দাও, নতুন করে রং লাগিয়ে নতুন বেশভূষা পরিয়ে দাও।

মহামাত্যের কাছে যথারীতি সংবাদ পৌঁছল যবনরাজ্য থেকে। আইন মজলিসে মহামাত্য ঘোষণা করলো, আর আমাদের উপকূল

রক্ষার চিন্তা করতে হবে না। মহামান্য যবনরাজ আমাদের উপকূল রক্ষার জন্য ছ'খানি রণতরী বিক্রি করেছেন। সেগুলো এক বছরের মধ্যেই এসে পৌঁছবে আমাদের দেশে।

বিরুদ্ধপক্ষ বলল, আমরা শুনেছি, যবনরাজ তাঁদের দেশের ভাঙ্গা রণতরীগুলিই জোড়াতালি দিয়ে পাঠাচ্ছেন।

মহামাত্য ধীর কণ্ঠে বলল, আপনাদের কথা কিছুটা সত্য। রণতরীগুলি ভাঙ্গা নয় তবে কয়েক বৎসর পূর্বে নির্মিত। মেরামত করার প্রয়োজন নেই তবুও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে তার কলকব্জা। আমাদের নৌ বিশারদরা যবনরাজ্যে গিয়েছে, তারাই জিনিসগুলো বাজিয়ে দেখে আনবে।

আমাদের দেশে রণতরী তৈরীর ব্যবস্থা কেন করা হচ্ছে না?— আবার প্রশ্ন করল বিরুদ্ধপক্ষ।

অর্থের অভাব প্রথম, দ্বিতীয় হল কারিগরি বিদ্যার অভাব, শেষ হল যন্ত্রের অভাব।

আমরা খুশী হতে পারলাম না। যবনরা যখন রাজত্ব করত তখন আমাদের দেশেই জাহাজ তৈরীর একটা কারখানা চালু হয়েছিল, সেটা আজও আছে। সেখানে রণতরী তৈরীর ব্যবস্থা কেন করা হয় না?

অপর একজন নির্দলীয় সভ্য বলল, সেখানেও শতকরা আশীভাগ যন্ত্র আমদানী করতে হয় বিদেশ থেকে। জাহাজের খোল আর কেবিনটাই শুধু তৈরী হয় সেই কারখানায়।

একজন বলে উঠল, শেম্ শেম্।

মহামাত্য বিরক্তির সঙ্গে বললো, রণতরী নির্মাণ ইত্যাদি বিষয় জনস্বার্থে এই সভায় বলা যায় না।

বিরুদ্ধপক্ষের সদস্যদের বক্তব্য এইখানেই শেষ।

মহামাত্য আবার বললো, দেশরক্ষা বাহিনীর জন্য আমরা কয়েক সহস্র গাড়ি পেয়েছি যবনরাজ্য থেকে।

সেগুলো কি এসে পৌঁচেছে আমাদের দেশে ?

এই বছরেই এসে পৌঁছবে।

দেশরক্ষার জন্য যে পরিবহন ব্যবস্থা তার জন্য প্রয়োজনীয় গাড়িগুলো পাতনে তৈরী করা যায় কি না ?

মহামাত্য বললো, মাননীয় সদস্য যে কথাটি বললেন সে সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করছি। কিছুকালের মধ্যেই এবিষয়ে বিবৃতি দিতে পারব।

বিরুদ্ধপক্ষের সদস্য আবার প্রশ্ন করল, বিমান বহর বৃদ্ধির কি ব্যবস্থা করেছেন মহামাত্য ?

আমরা বিদেশ থেকে বিমান আমদানী করছি।

বিদেশ থেকে আমদানী করা বিমানের ভরসায় দেশের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেওয়া উচিত কি ?

যতদিন আমাদের দেশেই বিমান তৈরী না হচ্ছে ততদিন বিদেশের ওপর ভরসা রাখতে হবে বইকি।

বিপদকালে যদি বিদেশ থেকে বিমান না পাওয়া যায় ?

মহামাত্য হেসে বললো, এমন অবস্থা এখনও দেখা দেয় নি।

দেশে বিমান তৈরীর পরিকল্পনা কতদূর ?

আমরা যন্ত্র বিশারদদের আমন্ত্রণ করে আনছি বিভিন্ন দেশ থেকে। তাদের স্কীম এখনও হাতে আসে নি। এলে তখন আপনাদের জানাতে পারব।

ডিসগ্রেস পার্টির জনৈক সদস্য জানতে চাইল, স্থলবাহিনীর জন্য বিশেষ বিশেষ যে সব অস্ত্রের দরকার সে সব পাওয়া গেছে কি ? কোন্ কোন্ বন্ধুরাষ্ট্র তা দিয়েছে ?

মহামাত্য চড়া গলায় বললো, এর জন্যই আমাদের স্থলবাহিনীর জেনারেল অর্কপন্থ বিদেশে গেছেন শুভেচ্ছা ভ্রমণে। জেনারেল অর্কপন্থ ফিরে আসলে আমাদের সাফল্যের বিষয় এই সভাকে জানাতে পারব।

বিরুদ্ধপক্ষ বলল, দেশরক্ষার এইসব অব্যবস্থা পাতন রাজ্যকে শক্তিশালী রাষ্ট্রের দাসত্বের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

বিরুদ্ধপক্ষের সদস্য নাগেশ্বরপ্রসাদ ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকল আইন মজলিসে। সপ্তমে গলা তুলে নাগেশ্বর বলল, উৎপাতন রাজ্য থেকে হাজার হাজার লোক পালিয়ে আসছে। সংবাদ পাওয়া গেছে, সেখানে রাক্ষসরা মানবদের ধরে ধরে কোতল করছে।

পাতনরাজ্যের মানবদলের প্রতিনিধি লাফিয়ে উঠে বলল, এই হল মহামাত্যের ভুলের মাশুল।

মহামাত্য চিৎকার করে বলল, কখনই নয়। কিছু কিছু লোক সব দেশেই থাকে যারা অশান্তি সৃষ্টি করার সুযোগ খোঁজে।

মানবদলের প্রতিনিধি বলল, লোক বিনিময়ের উপদেশ আপনি গ্রাহ্য করেন নি। তা করলে এইভাবে নরহত্যা সম্ভবপর হত না। এই সব নির্দোষ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী আপনি আর আপনার গুরুজি।

মহামাত্য ক্রোধে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করতে থাকে। অসত্য অসত্য।

বিরুদ্ধপক্ষের নেতা বলল, দেশে জনমনে অশান্তি আর অবিশ্বাস যখনই প্রবল হয় তখনই উৎপাতন ও পাতন রাজ্যের শাসকরা ঘরোয়া বিবাদ বাধিয়ে জনতাকে ভিন্নমুখী করে, এটাই আমরা লক্ষ্য করছি। আমার মনে হয়, গোপন কোন প্যাক্ট রয়েছে শুষ্কচঞ্চুর সঙ্গে আমাদের মহামাত্য পুলকেশীর।

এরপর আর কারও কোন কথা শোনা গেল না।

চিৎকার। টেবিল চাপরানি। গালাগালি।

অধ্যক্ষ সভা শেষ ঘোষণা করে রাজদণ্ড নিয়ে বেরিয়ে গেলো আইন মজলিস থেকে।

মহামাত্য ফিরে এলো নিজের দপ্তরে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সংবাদ পেলো, পূর্বায়তন আর মধ্যভুক্তিতে

মানব আর রাক্ষসে দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। পরের ঘণ্টায় সংবাদ পেলো খোটাই আর বাদশাপুরেও প্রসারিত হয়েছে সেই দাঙ্গা। মৃতের সংখ্যা জানা যায় নি। সম্পদ ধ্বংসের বিবরণও তখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। ব্যস্ত হলো মহামাত্য।

ফোনে ডাকলো চৌঘটলাল ঝাঁঝোরিয়াকে।

চৌঘটলাল ছুটতে ছুটতে এল মহামাত্যের দপ্তরে।

শুনেছেন খবর?

হ্যাঁ শুনেছি।

কিছু ব্যবস্থা করেছেন?

আইন শৃঙ্খলা অঙ্গরাজ্যের বিষয়।

বর্তমানে অঙ্গরাজ্যগুলো আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারছে না। আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই?

করণীয় আছে অনেক কিছুই, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি নয়।

কারণ?

কারণ, অঙ্গরাজ্যের স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। সামনে নির্বাচন। এখন যদি কোন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করি তা হলে নির্বাচনে আমাদের পরাজয় ঘটতে পারে। দ্বিতীয়ত, কয়েক দিন দাঙ্গা চলতে দিলে জনমন থেকে অনেক অভিযোগ লোপ পাবে। গত পাঁচ বছরে অনেক ক্লেদ জমেছে জনমানসে। তারা আজকাল আর ডিসগ্রেস পার্টিকে সহ্য করতে চাইছে না, এই দাঙ্গায় তাদের মনের অবস্থা বদল হতে পারে।

মহামাত্য চিন্তা করতে লাগলো।

চৌঘটলাল বলল, আপনি উৎপাতন রাজ্যে সংবাদ দিন যাতে শুষ্কচঞ্চু সেখানকার হাঙ্গামা দমন করে। যদি সে তার দেশের দাঙ্গা বন্ধ করতে না পারে তা হলে এদেশেও দাঙ্গা চলবে। আর দুই দেশকে যদি ভবিষ্যতে শান্তিতে থাকতে হয় তা হলে অ্যাক্‌শন এবং রিঅ্যাক্‌শান দুই-ই দরকার। এরাও জানবে এখানে হাঙ্গামা

করলে ওখানে মানবরা কষ্ট পাবে, ওরাও জানবে ওখানে হাঙ্গামা করলে এখানে রাক্ষসরা কষ্ট পাবে। যার ফলে কেউ-ই আর ভবিষ্যতে হাঙ্গামা করবে না।

মহামাত্য বললো, আমি উৎপাতনের সঙ্গে কথা বলছি, আপনি আজই ছুটে চলে যান পূর্বায়তনে, সেখানেই শুনছি হাঙ্গামা সবচেয়ে বেশি।

বেশ। তাই যাচ্ছি।

পরের দিন আইন মজলিসে মহামাত্যকে চেপে ধরল সব সদস্যরা। সকালের সংবাদপত্র যে সব সংবাদ পরিবেশন করেছে তা পড়ে সবাই উত্তেজিত। সবাই বলছে, মহামাত্যের মুখে বিবরণ শুনতে চাই।

মহামাত্য দাঁড়িয়ে বললো, স্বরাষ্ট্র অমাত্য চৌঘটলাল গেছেন অঙ্গরাজ্যে হাঙ্গামা নিবারণ করতে। আমি উৎপাতন রাজ্যের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনা করেছি। তারাও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে দাঙ্গা নিবারণ করতে।

আমরা পূর্ণ বিবরণ চাই।

সংবাদের জন্য অপেক্ষা করছি। সংবাদ পেলেই এই সভাকে জানাব।

বিরুদ্ধপক্ষ বলল, আমরা সংবাদ পেয়েছি এই দাঙ্গার পেছনে রয়েছে উৎপাতন ও পাতন রাজ্যের কতকগুলো ধনী ব্যক্তি। তাদের কায়েমী স্বার্থ যাতে কোন ক্রমেই বিঘ্নিত না হয়, তার জন্যই এই দাঙ্গা চলছে তাদের কারসাজিতে।

এরূপ সংবাদ সরকারের জানা নেই।

চোরকাটার শিল্প এলাকায় প্রথম দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছিল। শিয়ালিয়া কোম্পানীর বস্ত্রকলে যাবার ছোট গলি পথ দিয়ে যখন কর্মীরা যাচ্ছিল তখনই বস্ত্র কলের দিক থেকে আক্রমণ আরম্ভ হয়। স্থানীয় সমাজ বিরোধীরা সেই সুযোগে চারদিক থেকে এই সব

কর্মীদের ঘিরে ফেলে এবং নির্মমভাবে তাদের হত্যা করে। মৃতের সংখ্যা সাতচল্লিশ। সংবাদ পাওয়া গেছে বস্তকল থেকে বন্দুক ব্যবহার করা হয়েছে। এ সংবাদ এখনও মহামাত্যের দপ্তরে না পৌঁছে থাকলে আমরা আশ্চর্য হব।

স্বরাষ্ট্র অমাত্য মহামান্য চৌঘটলাল গেছেন সরজমিন তদন্তে এবং প্রয়োজন মত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে। তার রিপোর্টের অপেক্ষা করছি।

তার রিপোর্ট আসবে সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে! আসল দাঙ্গাকারী যারা, যাদের অর্থে সমাজ বিরোধীরা পুষ্ট, যাদের প্রশ্রয়ে সমাজবিরোধীরা দুষ্কার্য করে তাদের সম্বন্ধে বোধহয় স্বরাষ্ট্র অমাত্য নীরব থাকবেন।

মহামাত্য বললো, অনুমান অনুচিত। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব আমাদের ওপর দিন। আপনারা সংযত থাকুন ও জনসাধারণকে সংযত করুন, দেখবেন অশান্তি শীঘ্রই শেষ হবে।

সেদিন আইন মজলিসের আলোচনায় এখানেই ইতি পড়ল। বিরোধীরা এর জের টানল ছ'মাস পরে।

তারা প্রশ্ন করল, যবনরাজ্য থেকে যে সব গাড়ি কেনা হয়েছিল সেগুলো পাতনরাজ্যে এসেছে কি?

মহামাত্য উত্তর দিতে পারলো না।

এ কথা কি সত্য, মহামাত্যের স্পেশাল এনভয় রঘুরামিয়া যে কোম্পানীকে টাকা অগ্রিম দিয়েছিল সে কোম্পানী একটা ভূয়া কোম্পানী?

মহামাত্য বললো, অনুসন্ধান করে জবাব দেব।

আবার প্রশ্ন হল, একথা কি সত্য, মহামাত্যের স্পেশাল এনভয় এই লেনদেনে বহুটাকাই পকেটস্থ করেছে এবং এই অনুগৃহীত ব্যক্তিটিকে সব রকমে রক্ষা করার জন্য মহামাত্য উদগ্রীব?

একথা সত্য নয়। উত্তর দিলো মহামাত্য।

বিরুদ্ধ পক্ষ শেম্ শেম্ ধ্বনি দিল।

মহামাত্যের চোখ মুখ লাল।

রঘুরামিয়া তার বিশেষ অনুগৃহীত। তার দোষ খণ্ডনের জন্য সে নিজেও সচেষ্ট, কিন্তু ঘটনাটা সত্য। অনেক ভেবে মহামাত্য বললো, যবনদেশে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখানকার রাষ্ট্রদূতকে।

চাপা গলায় শোনা গেল, বাহোবা!

বিরুদ্ধ পক্ষ থেকে আবার প্রশ্নের ঝড় উঠল, উত্তর অঙ্গরাজ্য অবন্তিকাকে ভাগ করে দেবার ষড়যন্ত্র মহামাত্য করছেন কি?

না। তবে উৎপাতন রাজ্যকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম আমাদের বর্তমান অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে। এতে ভাগাভাগির কোন অবকাশ নেই।

আশাকরি এই প্রস্তাব করার আগে মজলিসে তা পাশ করিয়ে নেয়া উচিত ছিল।

অর্দ্ধ অমাত্য উত্তর দিল, এটা প্রস্তাব মাত্র। কোন নীতি নির্ধারণ নয়।

এমন প্রস্তাব দেবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে?

দেশের লোক। আমরা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি।

হৈ-হৈ করে উঠল বিরুদ্ধ পক্ষ।

চিৎকারে কিছুই স্পষ্ট শোনা গেল না।

নানা কটুকাটব্য শোনা গেল নানা ভাষায়।

আচ্ছা বোঝা যাবে, আরতো একমাস।

হ্যাঁ হ্যাঁ। তাই হবে। দেখি দেশের লোক আমাদের সমর্থন করে কিনা।

ফলস্ ভোট আর কেনা ভোট।

তোমরাও তা কর না কেন?

তাই তো। টাকা নেই, থাকলে দেখা যেত, বোঝাপড়া করতাম।

অধ্যক্ষ সভা স্থগিত রেখে বেরিয়ে পড়লো।

ভোট! ভোট! ভোট!

কাগজে কাগজে দেওয়াল ভর্তি। চিৎকারে চিৎকারে বাতাস মুখরিত। সভায় সভায় নানা কেচ্ছা কাহিনী। শুনতে শুনতে দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে জনসাধারণ।

ভোট প্রার্থীরা বলছে, এও একটা লড়াই।

জনসাধারণ বিমূঢ়।

ভোট নামের বস্তুটি যে কি, তার হদিস জানা নেই শতকরা নব্বইজন লোকের। তাদের চোখে মুখে বিস্ময়।

বিরুদ্ধ পক্ষ সমস্বরে চিৎকার করছে পথে ঘাটে। কেউ সেলাম পার্টি, কেউ মানবদল, কেউ কৃষক প্রজা দরদী, কেউ সমাজবাদী—সবই অবতীর্ণ হয়েছে ডিসগ্রেস পার্টিকে কুপোকাৎ করতে। সব দলই চায় ডিসগ্রেসহীন পাতন রাজ্য, কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষের কেউ-ই অন্যদলের সঙ্গে একমত হয়ে সমবেত লড়াই লড়তে প্রস্তুত নয়। সবাই নিজেদের গুণপনা জাহির করতে ব্যস্ত, সবাই বলতে চায় আমি ভাল, আর সবাই নক্কার জনক।

সমাজবাদী দলের নেতা মিস্টার অক্টরলনি মঞ্চে মঞ্চে বলতে লাগলো, ডিসগ্রেস পার্টি আমাদের দেশের সর্বনাশ করেছে। ধনী আরও ধনী হয়েছে, গরীব আরও গরীব হয়েছে ওদের প্রশাসনে। আমরা চাই শ্রেণীহীন সমাজ।

প্রশ্ন করল একজন, শ্রেণীহীন সমাজ বলতে কি বোঝায়?

অক্টরলনি হেসে বলল, সবাই সমান।

তা কি সম্ভব'! আর ডিসগ্রেস পার্টিও তো আইনের চোখে সবাইকে সমান মনে করে। তা হলে তারাও তো সমাজবাদী।

আহা আইন নয় শুধু। অর্থের মানদণ্ডেও সবাইকে সমান করতে হবে।

ঠিক বলছেন কর্তা। কিন্তু তার আগে আপনি নিজেকে সবার সমান পঙ্‌ক্তিতে টেনে নামাতে পারলে ভাল হত। আপনার পোষাক পরিচ্ছদ, জীবনের মান আর মাঠের ঐ ফলাই শেখের পোষাক পরিচ্ছদ আর জীবনের মান তো এক নয়-ই, বরং পার্থক্যটা যেন খুবই বেশি। যাদের জন্য আপনি এত দরদ দেখাচ্ছেন, ব্যক্তিগত জীবনে তাদের জন্য আপনার কোন অনুকম্পা আছে এমন নজির তো আমরা দেখিনি।

অকটরলনি চুপ করে থেকে শুনল। কিছুক্ষণ বাদেই চিৎকার করে উঠল, সেলাম পার্টি। ভালুক আর আরসুলা রাজ্যের দালাল।

হট্টগোল সুরু হল। সভার শান্তি রক্ষা করতে ছুটে এল পুলিশ।

লজ্জায় মাথা হেঁট করল অকটরলনির চেলারা। পুলিশ দিয়ে সভার কাজ চালানো শেমফুল! এবার থেকে নজর রাখতে হবে যাতে সেলাম পার্টি সভায় ঢুকতে না পায় তার জন্য।

পরবর্তী সভায় অকটরলনি শ্রেণীহীন সমাজের ব্যাখ্যা করে জনসাধারণকে অনুরোধ করল তার পার্টিকে ভোট দিতে। অকটরলনি বলল, আমার দেশে কোটি কোটি মানুষ আছে যাদের উপার্জন একটি পয়সাও নয়। কোটি কোটি জওয়ান ছেলে বেকার বসে আছে, যাদের কোন আদর্শ নেই, ভবিষ্যত নেই। অথচ মাত্র অর্ধ-শত ব্যক্তির হাতে জমে আছে দেশের সব সম্পদ। তাদের হাতে রয়েছে কোটি কোটি টাকা, আর ডিসগ্রেস পার্টির টিকিও তাদের হাতে বাঁধা। জনসাধারণকে বাঁচাতে হলে এই অর্থের সমবণ্টন অবশ্যই প্রয়োজন।

চিৎকার শোনা গেল, আমরা তাই চাই, হিয়ার হিয়ার।

আমরা চাই ডিসগ্রেস পার্টির হাত থেকে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা ছিনিয়ে নিতে এবং তা সম্ভব একমাত্র জনসাধারণের ইচ্ছায়। তারা ইচ্ছে করলেই দেশ ডিসগ্রেস পার্টির হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে।

আর সামনেই রয়েছে সেই সুযোগ। ভোটের বাক্সই এবার স্থির করবে ক্ষমতা কার হাতে যাওয়া উচিত।

হিয়ার হিয়ার!

শুধু ডিসগ্রেস পার্টিই নয়। আরও দুশমন আছে দেশে। সেলাম পার্টি দেশের সর্বত্র অশান্তি সৃষ্টি করে আসছে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই। যখন আমরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছি তখন সেলাম পার্টি যবনরাজকে সাহায্য করেছে। দেশের স্বার্থ-হানির জন্য ওরা সব রকমে চেষ্টা করেছে গত বিশ বছর যাবত। ওরা দেশদ্রোহী। ওদের সঙ্গে যারা হাত মেলায় তারাও দেশের শত্রু। মানবদল নামে যে পার্টিকে দেখতে পাচ্ছেন তারা হল সাম্প্রদায়িক দল। এদেশ সবার দেশ। মহামানবের তীর্থক্ষেত্র পাতন। এখানে মানব ও রাক্ষস সব সমান। মানবদল রাক্ষসদের বিতারণ চায়। আমরা তা চাই না। আমরা চাই সব লোকই শান্তিতে স্বাধীনভাবে এদেশে বাস করুক।

জনতা জয়ধ্বনি করল আবার।

অকটরলনি পূর্বায়তন থেকে অবন্তিকা, জখম থেকে নর্মচর পরি-ভ্রমণ করছে বায়ুবেগে। বাণী, ভাষণ আর উপদেশ বিতরণ করে চলেছে অকুণ্ঠভাবে। মানবদলও মোটেই পেছনে পরে থাকতে রাজি নয়। তারাও নেতাদের ডেকে বড় বড় সভা সমিতি করছে।

তাদের নেতা বিচল বাহাদুর বলছে, এদেশ মানব জাতির। রাক্ষসদের স্থান নেই এদেশে। ডিসগ্রেস পার্টিই অখণ্ড পাতন রাজ্যকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। কারণ, তাদের নীতিতে মানব আর রাক্ষস হল দুটো আলাদা জাতি। দুটো আলাদা জাতির জন্য দুটো আলাদা রাজ্য থাকা উচিত। তাই অখণ্ড পাতন আজ দ্বিখণ্ডিত। তাই যদি সত্যি হয়, তা হলে রাক্ষসরা এদেশের নাগরিক নয়। তাদের এদেশ ছেড়ে যেতেই হবে। ভোটের লোভে ডিসগ্রেস পার্টি কিন্তু এখন ওদের নাগরিক অধিকার দিয়ে তোষণ করেছে।

শেম শেম ধ্বনি দিল মানবদলের সমর্থকরা।

আমাদের এই হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী মহান দেশের সর্বনাশ করতে ডিসগ্রেস পার্টি অনেক নতুন নতুন আইন করেছে। রাক্ষসদের এককালীন চারটি করে বিবি রাখার অধিকার দিয়েছে অথচ মানবদের জন্য বহু বিবাহ হয়েছে নিষিদ্ধ ও দণ্ডণীয়। ওরা বলছে এটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু কোন পাতনকোড তৈরী করে সব নাগরিকের জন্য একই আইন চালু করতে পারে নি, অথচ ওরা মানবকোড রচনা করে আমাদের জীবনযাত্রা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে কঠিন আঘাত করেছে। কারণ, ওদের ধারণা ভোটের ব্যালান্স রক্ষা করবে রাক্ষসরা। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রচলিত রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা সব ভুলে যেতে বসেছি এই ডিসগ্রেস পার্টির অত্যাচারে। এর প্রতিবিধান করতে চাই আমরা। তার জন্য আমরা চাই আপনাদের ভোট। আপনারা সংঘবদ্ধ মানবদলকে ভোট দিন। দেশের যদি মঙ্গল চান তা হলে মানবদলকে ভোট না দিয়ে কোন উপায় নেই।

জয়ধ্বনি দিয়ে বক্তাকে সম্বর্ধনা জানাল জনতা।

এগিয়ে এসে নমস্কার করল, পট্টরামিয়া। সেও তার বক্তব্য রাখল জনতার সামনে। বলল,

ঠিকই বলেছেন বিচলজি বাহাদুর। আমাদের এই সমাজবাদী দল আর ডিসগ্রেসপার্টি যে কি ভয়ঙ্কর তা দেশের লোক বুঝতে পেরেছে। সমাজবাদীরা শ্রেণীহীন সমাজ গড়তে চায় অথচ তাদের নেতারা রাতেরবেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়ায় ঘুঁষের টাকা সংগ্রহ করতে। আমার মিলগুলোতেও হুমকি দেয় মাঝে মাঝে। ঠাণ্ডা করতে হয় কিছু অর্থদণ্ড দিয়ে। আবার ডিসগ্রেস পার্টির খাতায় নানা খাতে চাঁদা দিতে দিতেও ব্যাঙ্ক ব্যালান্স শেষ হবার জোগাড়। তাই আমরা ঠিক করেছি এবার মানবদলকেই ভোট দেব। আপনারা প্রচার জোরদার করুন। রুপেয়া-পয়সা যা

দরকার তা আমি দেব আর আমারই মত যারা দেশদরদী মানবদলের অনুগত, তারা দেবে। কিন্তু ক্ষমতা হাতে পেয়ে যেন আমাদের ভুলবেন না। আমাদের ব্যবসার ধান্দা যেন বন্ধ না হয়। সমাজ-বাদীদের মত মুখে বড় বড় বক্তৃতা দেবেন অথচ কাজের বেলায় কিছু করবেন না তা যেন না হয়। তাদের মত যেন ঘুঁষ চাইতে না হয়। আমরা চাঁদা দেব মোটা হাতে।

বিচল বাহাদুর একগাল হেসে বলল, কোন ভয় নেই পট্টরামিয়া। তবে শিয়ালিয়ারা জোর সাহায্য করছে ডিসগ্রেসপার্টিকে। শেষ রক্ষা করতে পারব বলে ভরসা পাচ্ছি না।

চেষ্টা করুন। আমরা পেছনে আছি।

বিচল বাহাদুর ঘুরতে থাকে গোটা পাতন রাজ্যে। মহৎ তার উদ্দেশ্য।

ডিসগ্রেসপার্টিও বসে নেই। তাদের নেতারাও রকেটের বেগে ঘুরছে গোটা পাতন রাজ্যে। শ্রমিক এলাকায় তাদের গিরিধারীলাল আর রামভরস অক্লান্ত পরিশ্রম করছে।

ইকরে তিকরে রাজ্য বয়নশিল্পে অগ্রগামী। তারা বস্ত্র কল শ্রমিকদের এলাকায় রোজই সভা করছে। তাদের অনুচররা রাতের-বেলায় কর্‌করে নোট নিয়ে বস্তীতে বস্তীতে ভোটার খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভোটারদের হাতে নোট গুঁজে দিয়ে কানে কানে বলছে, ভোট মানে একটা কাগজ কোন বাক্‌সে ফেলা। তা তোমরা পারবে। তবে বাক্‌সটা ঠিক করে দেখে নিয়ে ফেলবে। ভুল না হয়। ডিসগ্রেস-পার্টির চিহ্ন প্যাঁচা, প্যাঁচা মানে লক্ষ্মীর বাহন। সেই লক্ষ্মী হল এই টাকা। এই টাকা তোমাদের হাতে দিচ্ছি, লক্ষ্মীকে ঘরানা করতে তোমরা ঐ প্যাঁচার বাক্‌সেই কাগজটা ফেলে দিও, বুঝলে।

হাঁ হুজুর। তা হুজুর একদিন দিনের বেলায় আসুন, সব ভোটার তো নেই, নাইট শিফটে কাজে গেছে। তাদের সঙ্গে কথা বলুন, তাদের প্রাপ্যও মিটিয়ে দিন।

গিরিধারীর অনুচররা হাসে। বলে, দেখছ তো আমাদের চিহ্ন ? প্যাঁচা! কোন দেশে প্যাঁচাকে দিনের বেলায় বের হতে দেখেছ?—দেখনি। আমরাও দিনের বেলায় বের হই না। দিনের বেলায় নেতারা বক্তৃতা দেয়। আর রাতের বেলায় আমরা কাজ গুছোই। সেজন্য আবার রাতেই আসব ভাই সব। তোমাদের নাম টোকা রইল। যারা প্রাপ্য পায়নি এখনো, তাদের সঙ্গে দেখা করে ব্যবস্থা করব। যদি তারা ভোট না দেয় তা হলে তাদের হয়ে তোমরা ভোট দিয়ে আসবে।

হাতে দাগ থাকবে হুজুর।

কেমিক্যাল আছে ভাই সব। আধা মিনিটে সব সাদা। তোমরা আগে গিয়ে ওদের ভোটটা দিয়ে আসবে তারপর বিকেল বেলায় দেবে নিজের নিজের ভোট। হাতের দাগ তার আগেই উঠিয়ে দেব। সাবধান, কাউকে বলো না যেন। তোমরা তো জান এই ডিসগ্রেস-পার্টি না থাকলে তোমাদের কি হালৎ হত। না খেয়ে মরতে হত।

হাঁ হুজুর, মাথা নাড়ল ক'জন।

আমাদের মহামাত্য যদি না থাকতেন তা হলে এত কলকারখানা হত না এদেশে। কলকারখানা আছে বলেই তোমাদের রুজি রোজগার হচ্ছে। তোমরা নিশ্চয়ই সেজন্য কৃতজ্ঞ। আমরা তোমাদের টাকা চাই না, বাড়ি চাই না, ঘর চাই না, চাই শুধু ঐ ভোটের কাগজটা। ওটাকে কোন রকমে প্যাঁচা মার্কা বাক্সে ফেলে দিলেই হল। তার জন্যে নগদ তিন রুপেয়া, কাজ হাসিল হলে আরও দো-দো-রুপেয়া। তোমরা রাজি তো ?

হাঁ হুজুর। সম্মতি দিল সবাই দল ধরে।

গিরিধারীলাল সভা করছে পথে ঘাটে মাঠে ময়দানে।

সমাজবাদীদের মত গিরিধারীলালও বলছে, আমরা চাই শ্রেণী-হীন সমাজ। আমরা চাই অর্থের সমবণ্টন। আমরা চাই শিল্প

জাতীয়করণ। আমাদের দলে দু'চার জন যা খারাপ দেখছ, তারা আমাদের শত্রু, বন্ধু সেজে আমাদের সর্বনাশ করতে এসেছে।

প্রশ্ন করছে অনেকেই।

কেউ বলছে, আপনাদের শিয়ালিয়ার বার্ষিক লাভ পঞ্চাশ কোটি টাকা, অবশ্য যে হিসেব গোপন থাকে সে হিসেবে নয়। আর আমাদের শহরে ও গ্রামে এমন বহুলোক আছে যাদের বার্ষিক উপার্জন দশ টাকাও নয়। আপনারাই তো এই শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন, এর বিলোপ আপনারা চান না, বিলোপ হবেও না।

আমাদের শিশু রাষ্ট্র। অর্থ নেই। তাই কিছু কিছু অনিয়ম স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি।

অর্থের সমবণ্টন সম্ভব কি! উপার্জনের যদি উচ্চমাত্রা স্থির থাকত সমাজবাদী দেশের মত, যদি উপার্জনের তারতম্যের একটা কোনও মাত্রা নির্দিষ্ট থাকত, তা হলে সমবণ্টনের কথা শোভা পেত। এখানে যে কিছুই নেই।

তাও হবে, চিৎকার করে বলল গিরিধারীলাল। তোমরা রাতা-রাতি সব কিছু চাইলেই তা সম্ভব নয়। তোমাদের এই কুবুদ্ধি দিয়েছে সেলাম পার্টির লোকেরা। ওরা দেশদ্রোহী। দেশের লোককে সুবুদ্ধি দিতে পারছে না, দুর্বুদ্ধি দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করছে। সাবধান! ঐ-সব গৃহশত্রু বিদেশের দালাল। তোমাদের সর্বনাশ করবে ওরা।

গিরিধারীলালের বক্তৃতা শুনে কেউ খুশী হল কেউ হল না।

শেষ বেলায় প্রশ্ন করল বেগ মহম্মদ, শিল্প জাতীয়করণটা কি লালজি?

আমাদের রামু নদীর বাঁধ দেখছ?

তাতে যে প্রতি বছরই বন্যা হচ্ছে।

ওটা য়্যাকসিডেণ্ট্। ভালটা হলেই মন্দের জন্য প্রস্তুত থাকতে

হয়। কিন্তু এত ইস্পাতশিল্পও কি দেখতে পাচ্ছ না? বৈষয়িক উন্নতি লক্ষ্য করে দেখ।

সেখানেও তো লোকসান।

শিশু রাষ্ট্রে এসব হয়েই থাকে। ধীরে ধীরে সামলে নিতে হয়।

গিরিধারীলাল খুশী করতে পারল না জনসাধারণের সব জিজ্ঞাসাকে।

সেলামপার্টিও নেমে পড়েছে তাদের দলবল নিয়ে।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে, বলল তাদের যবন রাজ্য ফেরত নেতা।

চাষীর সমাবেশে জোর গলায় বলছিল নেতা।

কিন্তু চাষী জমি পেয়েছে কি?—নিজেই প্রশ্ন করল।

নিজেই উত্তর দিল,—পায় নি। জমিদার গেছে, জোতদার সৃষ্টি হয়েছে। পঁচিশ একর জমির ব্যবস্থা করেছে সরকার প্রত্যেকের জন্য। যাদের ছিল পাঁচশ বিঘে জমি তারা আইন চালু হবার আগেই সব বেনাম করে দিল। আত্মীয়-স্বজনের নামে নামে জমি বিলি হয়ে গেল রাতের অন্ধকারে আর গোপনে। যখন আত্মীয় স্বজনের সংখ্যাও পর্যাপ্ত মনে হল না তখন বাড়ির পোষা কুকুর আর বেড়ালের নামেও জমি বিলি করে নিশ্চিন্ত হল তারা। জমিদারী দখল করেও এখন সরকারের হাতে জমি নেই। ভূমিহীনদের ভূমি দেবার পরিকল্পনা ভেস্তে গেল আপনা থেকেই। করল কারা?—আপনাদের ঐ ডিসগ্রেসপার্টির নেতারা। তারাই জমির মালিক, তারাই আইন করে আইনকে ফাঁকি দিল। সুখে আছে তারা। আব পাতন রাজ্যে ভূমির ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা হল মোট জন সংখ্যার শতকরা আশীভাগ। কিন্তু সেই ভূমির মালিক হল মাত্র পাঁচ ভাগ লোক। শতকরা পঁচাত্তর জন হল ভূমিদাস। তাদের বাঁচতে হচ্ছে ঐ সব জোতদার তথা ডিসগ্রেসপার্টির সভ্যদের দয়াতে।

শেম শেম ধ্বনি উঠল চতুর্দিকে।

আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। আমরা জমির বণ্টন ব্যবস্থাকে মানবোচিত করতে চেয়েছিলাম। তার ফলে আমরা পেলাম পুলিশী অত্যাচার। গুলী আর লাঠি পেটার সঙ্গে সঙ্গে কয়েদ। দেশের শতকরা আশীজন লোককে অনাহারে রেখে ডিসগ্রেসপার্টি রাজত্ব করেছে এতকাল। ওদের বিতারণ না করতে পারলে চাষীর উন্নতি সম্ভব নয়।

এবার চাষের কথা বলছি। সার দেবার ব্যবস্থা করেছে ওরা। সরকারী সার দিলে মাঠের ঘাস পর্যন্ত পুড়ে কালো হয়ে যাচ্ছে। কারণ, বিক্রেতারা সব ডিসগ্রেসপার্টির অনুগ্রহভাজন। তাদের সারে ভেজাল। আপনারা বীজ চাইলেন আমন ধানের, পেলেন আউস ধানের বীজ। ফলন যা হবে তাতো বুঝতেই পারছেন। কৃষিখাতে যত টাকা বরাদ্দ হয়, তার চোদ্দ আনাই যায় কায়েমী স্বার্থের লোকের পকেটে। হালের বলদ কিনতে আপনাকে একশত টাকা ঋণ দেবে সরকার। এও এক মস্তো পরিহাস। দুটো বলদের আটটা পা, সরকার একশ' টাকা দিয়ে শুধু একটা পায়ের দাম দিচ্ছে। বাকি সাতটা পায়ের দাম না পেয়ে চাষী ঋণের টাকায় গিন্নীর শাড়ি কিনে বাড়িতে ফেরে। তাও সেই একশ' টাকা তারা পুরো পায় না। আমলারা তার ঋণের টাকা থেকে তহুরী কেটে তবেই ঋণপত্র সই করায়।

আবার শেম শেম ধ্বনি উঠল চতুর্দিকে।

তাই চাষ হয় না। তাই ফলন নেই। তাই আমাদের হাত পাততে হয় মার্কিনীদের দরজায়। মার্কিন প্রভুত্ব যাতে বজায় থাকে এদেশে তার জন্য ষড়যন্ত্র করে চাষের ফলন কমতি করেছে ওই ডিসগ্রেস পার্টি। ওদের নেতারা সফর করে মার্কিন দেশে, সেদেশে মদ আর মেয়ে মানুষের ছড়াছড়ি। তাদের নিয়ে মধুযামিনীর সুখ উপভোগ করতে যায় ওরা। আর দেশের মাথায় ঋণের বোঝা চাপিয়ে ক্রমেই আমাদের পরমুখাপেক্ষী করে তুলছে। এদিকে বাজারে জিনিসের

দাম বাড়ছে হু-হু করে। পাঁচ টাকা মনের চাল বিকোচ্ছে একশ' টাকায়। আমরা প্রতিবাদ করে বললাম, মজুতদারদের আটক কর। ওরা আটক করল আমাদের। বললাম, আইন করে মজুতদারদের ফাঁসি দাও, যা তোমাদের মহামাত্য দিতে চেয়েছিলেন অনেক কাল আগে। মাথায় লাঠি মেরে ওরা আমাদেরই ভবলীলা শেষ করে দিল। এই আইন। এ ব্যবস্থা অরণ্যজীবনের ব্যবস্থা। এর শেষ চাই। ডিসগ্রেসপার্টিকে উৎখাত করতেই হবে। তার জন্য আপনারা সবাই ভোট দেবেন ভেবে চিন্তে। ভোট সামান্য বস্তু নয়। এর ওপর আগামী পাঁচ বছরের ভাগ্য নির্ভর করছে দেশের ও দশের।

ইন্ কিলাব জিন্দাবাদ।

সভার শেষে বারিদবরণ এগিয়ে এসে বলল, সমাজতন্ত্রের কথা বললেন না নেতাজি ?

এটা চাষীর সভা। চাষীদের কথাই বললাম।

কিন্তু চাষীরাও শ্রেণীহীন সমাজ চায়।

আমাদের হাতে ক্ষমতা এলে তা পাবে।

কিন্তু জমিদারী দখলের পুরো প্রহসনটা তো বলা হল না ? যেমন, চোরকাটা শহরের জমিদাররা এখনো বহাল তবিয়তেই রয়েছে, তাদের জমিদারী জব্দ করার কোন ব্যবস্থা হয় নি। বাগানের নাম করে হাজার হাজার একর জমিই যে জোতদাররা ভোগ করছে তার কথাও তো বললেন না ?

নেতাজি মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, তাইতো। পরের মিটিং-এ নোট রেখে সব বলতে হবে। একটু স্মরণ করিয়ে দেবেন বারিদ-বাবু।

তা দেব, কিন্তু লোকে বলছে বাগানের মালিকানা নাকি আপনারও আছে তাই বাগানের কথা আপনি চেপে গেলেন।

মিথ্যে কথা। আমার বাবার কিছু শেয়ার ছিল, তা আমি বিক্রি করে দিয়েছি।

আরও দুজন বলছিল নেতাজির নাকি চোরকাটা শহরে এগার-খানা বাড়ি আছে।

মাথা চুলকে নেতা বলল, তা আছে। তা না থাকলে সেলামপার্টির খরচ চালাতে পারতাম কি করে!

বারিদবরণ চুপ করে গেল।

মনে মনে হিসেব করল। পার্টির মাথায় যারা বসে আছে তারা সেলামপার্টির উপযুক্ত কিনা তাও ভাবছিল বারিদবরণ। সেলামপার্টি হল সবহারাদের পার্টি। ভাবছিল, এই সবহারা দলের মানুষদের পরিচালনার অধিকার যদি সব-থাকা মানুষের হাতে থাকে তা হলে সত্যিকার আদর্শ অনুসরণ সম্ভব কিনা!

কিন্তু কোন আলোচনা করবার সাহস পেল না বারিদবরণ।

সভার শেষে ফিরে এল নিজের আস্তানায়।

সারা রাত ভেবেছে বারিদবরণ।

রাস্তায় ফুটপাতে যে হাজার হাজার মানুষ সংসার পেতে বসেছে, ওরা কারা? ওদের জন্য কি রাজনীতি তৈরী হয়েছে এদেশে?

চিন্তার রাজ্য থেকে সকাল বেলায় ফিরে আসতে হল বাস্তবে। সকালেই বের হতে হল পোস্টার আর আঠা নিয়ে পার্টির বক্তব্যকে দেওয়ালে দেওয়ালে সেঁটে দেবার কাজে। ভাবল, তবুও তো দুঃখী মানুষদের কথা বলছে সেলামপার্টিই, আর কেউ তো তাদের কথা বলছে না!

দিনের পর দিন এগিয়ে আসে।

বাজার উত্তপ্ত। শুধু ভোট আর ভোট।

দলাদলি চিৎকার আর পোস্টারের ছড়াছড়ি। সবাই ভাল, নিজেকে কেউ খারাপ বলতে চায় না। পচা মাছ বিক্রেতা মেছুণী যেমন মাছের কানে লাল রং দিয়ে খদ্দের ঠকায়, এরাও তেমনি। আদর্শ, নীতি আর ধর্মের রং মিশিয়ে পচা রাজনীতিকে জনদরদী চেহারায় সাজিয়ে দেখাবার অপচেষ্টা করছে। যারা বুদ্ধিমান তারা

মুখ টিপে হাসে। অল্পবুদ্ধির মানুষ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, বুঝি এই সত্যি!

ওদিকে একাক্ষিবাবুর দলও কম ব্যস্ত নয়। তারা দলবদ্ধ হয়ে মত্ত হয়েছে বিরুদ্ধ দলকে শায়েস্তা করতে। বোমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ঘন ঘন, ছুরিও চলছে এখানে ওখানে। এই সুযোগে তৎপর হয়ে উঠেছে সমাজ বিরোধীরা। নগর উপকণ্ঠে কয়লা পার্টি আর সিল ভাঙ্গা পার্টির মধ্যে এখন সহাবস্থান চুক্তি বিরাজিত। আগে কয়লা পার্টির সঙ্গে সিল ভাঙ্গা পার্টির ছিল দুরন্ত বিবাদ। রেল ইয়ার্ড থেকে লরী বোঝাই কয়লা পাচার করে ভালই ইনকাম হত। কিন্তু সিলভাঙ্গা পার্টি ঘেন্না করত কয়লা পার্টিকে, বলত ছ্যাঁচড়া। ওরা চুরি করে, তাও কয়লা চুরি। শেষমেশ একদিন গরু চুরির ব্যবসা ধরবে।

ঘেন্নায় নাক সিঁটকোয় অম্বু বিশ্বাস।

কয়লা পার্টির জগদ্দল দোবে শুনবে কেন ওদের কথা। ওরাও বলে বেড়ায়, সিল ভাঙ্গা কাম বেইমানদারী কাম। শালারা ছোটলোক।

সিল ভাঙ্গার দলটা বেশ শক্ত। ডিসগ্রেসপার্টির মৌন সমর্থন আছে ওদের পেছনে। ভোটের সময় ওরাই হল সহায়। তাই তাদের জোর বেশি। মাঝে মাঝেই দু'দলের লাগত বখরা নিয়ে ঝগড়া। ঝগড়া হাতাহাতি থেকে বোম ছোড়াছুড়িতে শেষ হত। পুলিশ আসত। দুপক্ষের দু'চারজন হাজতে যেত। ছাড়া পেত সিল ভাঙ্গা পার্টি, আটক থাকত কয়লা পার্টি। তাদের মুরুব্বির জোর নেই।

অবশেষে কয়লা পার্টি হাত মেলালো ছিনতাই পার্টির সঙ্গে।

ছিনতাই পার্টির দুঃখীরাম বলল, শালাদের আগে মাল বিক্রি করতে দেব। তারপর শালাদের নগদ রুপো ছিনিয়ে নেব।

সেই ভালো, মন্তব্য করেছিল জগদ্দল দোবে।

এর পরেই আরম্ভ হল গুরুতর হাঙ্গামা।

সিল ভাঙ্গা পার্টির আলি মহম্মদের লাশ পাওয়া গেল রেল লাইনের ধারে।

রটনা হল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় মারা গেছে আলি মহম্মদ।

আবার সাজ সাজ রব পড়ে গেল সমাজবিরোধীদের ক্যাম্পে। বিপদ হল ছিনতাই পার্টির। তাদের দলে মানব ও রাক্ষস দু'জাতের লোকই আছে। নিজেদের মধ্যে হাঙ্গামা বিস্তারের আশঙ্কা হল। দুঃখীরাম সবাইকে ডেকে বলল, সবাই নিজের নিজের ঘরে যা। কেউ কারও গায়ে হাত দিবি না, দেখছিস তো হাতিয়ার। একেবারে শেষ করে দেব। জানিস তো আমার নাম দুঃখীরাম।

তিন পার্টির হাঙ্গামা বন্ধ হল সাময়িক। অবস্থা শান্ত হতেই আবার আরম্ভ হল তাদের অপারেশন, আবার দেখা দিল হাঙ্গামা। হয়ত এই হাঙ্গামা চলত অনেক কাল, কিন্তু একাক্ষিবাবুর দল তাদের খুশী করে দলে ভিড়িয়ে নিল নগদ কড়ি দিয়ে।

রাজি! জানতে চাইল একাক্ষিবাবু।

জরুর। আমাদের কাজ হল সেলাম পার্টির মিটিং ভাঙ্গা। বহুত খুব। তবে বাহার এলাকায় কাম করতে অসুবিধে হবে। ধরা পড়ার ভয় আছে। পাবলিক লোকের হাতে পড়লে জানমান পয়মাল হবে বাবুজি।

কোন ভয় নেই। আমাদের গাড়ি থাকবে আশে পাশে। অসুবিধে দেখলেই গাড়িতে চেপে বসবি। তারপর হাওয়া।

যুক্তিটা মন্দ নয়।

তিনদল একসাথে মেনে নিল তার প্রস্তাব।

দু'তিনটে সভায় গণ্ডগোল হবার পরেই সেলাম পার্টি বুঝতে পারল, বেশ ভেবে চিন্তে পরিকল্পনা করেই তাদের বিরুদ্ধে নেমেছে শক্তিশালী অন্য দল। সে দল যে ডিসগ্রেসপার্টি সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না কারও। এবার সেলাম পার্টিও প্রস্তুত হল তাদের

মোকাবিলা করার জন্য। সভা আরম্ভ হবার সময় লক্ষ্য রাখত দূরে দাঁড়ানো জিপের ওপর।

একদিন ধরা পড়ে গেল ছিনতাই পার্টির একজন গুণ্ডা।

পরবর্তী ঘটনার বিবরণ আছে পুলিশের খাতায়।

জগুয়ার প্যাণ্টের পকেটে ছিল বোমা। তিন চার জন তাকে ধরে চ্যাংদোলা করে দেওয়ালের গায়ে ছুড়ে মারতেই নিজের বোমায় জগুয়া নিজেই টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

বাকি সবাই তখন জিপে করে দৌড় দিয়েছে। সহকারী জগুয়ার ভাগ্যফল দেখার অপেক্ষা কেউ করেনি। সংবাদটা যখন পৌঁছল তখন জগুয়ার ছিন্ন ভিন্ন দেহটা মর্গে।

পুলিশ এল লাঠি নিয়ে।

তাদের আদি মানবীয় ভাষায় খিস্তি খেউড় করে পথচারী ক'জনকে টেনে তুলল গাড়িতে। তখনকার মত পরিসমাপ্তি ঘটল উত্তেজক অবস্থার।

ছিনতাই পার্টি সতর্ক হোল। কোন সভায় গণ্ডগোল করার আগে বিশেষভাবে পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রাখতে বাধ্য হল। অবস্থা বেগতিক দেখলেই মানে মানে সরে পড়ে সবার অলক্ষ্যে।

সিলভাঙ্গা পার্টি সবচেয়ে সাহসী ও বেপরোয়া। প্রায়ই তাদের মুখোমুখি লড়াই করতে হয় রেলরক্ষীবাহিনীর সঙ্গে। কি করে পালাতে হয়, কি করে মারতে হয়, কি করে আত্মগোপন করতে হয়, সব কিছুই জানা আছে তাদের। দলের জনসংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। ছিনতাই পার্টিকে ছুয়ো দিয়ে এগিয়ে এল সিলভাঙ্গা পার্টি। একাক্ষিবাবু রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছে, প্রচুর কড়ি দিয়েছে পকেটে আর আদালতে মামলা উঠলে সে মামলা উঠিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছে। এরপর আর সেলাম পার্টিকে শায়েস্তা করতে তারা পিছিয়ে থাকতে পারে না।

পরামর্শ হল, শহরে নয়। শ্রমিক এলাকায় যেতে হবে, যেতে হবে শহরের উপকণ্ঠে।

প্রথম দিনে হাঙ্গামা করল নির্বাচনী অফিসে। অফিস ভেঙ্গে তছনছ করে দিল। যাদের সামনে পেল তাদের লোহার ডাণ্ডা পেটা করে জিপে উঠে হাওয়া।

সরকারের কাছে আবেদন জানাল সেলাম পার্টি। বিঘ্নহীন নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি চাইল। সরকার পুলিশ পাঠিয়ে কর্তব্য শেষ করল, আর লম্বা প্রেসনোট কাগজে ছাপিয়ে সান্ত্বনা দিল সবপক্ষকে।

সেলাম পার্টি খুশী হল না মোটেই।

তাদের নেতারা চিৎকার করে বলল, আত্মরক্ষার অধিকার আইন আমাদের দিয়েছে। এরপর থেকে শঠের সঙ্গে শঠতা, দুর্জনের সঙ্গে দুর্জনতা, লাঠির বদলে লাঠি দিয়েই আত্মরক্ষা করতে হবে।

অনুচররা খুঁজে বেড়াতে লাগল সিলভাঙ্গা পার্টির চেলাদের। ওদের খুঁজে পেতে দেরী হল না। রেল লাইনের ধারে ওত পেতে বসে রইল। ওয়াগনের সিল ভাঙ্গতে এলেই দফারফা করবে।

কপাল মন্দ সিলভাঙ্গা পার্টির।

রাতের অন্ধকারে সবে প্রস্তুত হয়েছে মালগাড়ির দরজা ভাঙ্গতে, এমন সময় হামলা করল সেলাম পার্টির লোক।

অনেকজনের একজন বলল, এদের মধ্যে চিনতে পারছিস কাউকে?

একজন তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, হাঁ। এই বেটাই ছুরি মেরেছিল অতীনকে।

দেখি চাঁদ! থুত্‌নির তলায় হাত দিয়ে তার মুখ দেখল সবাই।

সিল ভাঙ্গা পার্টির তিন চারজনে পঁচিশ জনের সঙ্গে লড়াই করতে সাহস পেল না। সনাক্ত করা লোকটাকে টানতে টানতে রেল লাইনের ধারে নিয়ে গিয়ে একজন বলল, পরের গায়ে ছুরি মারতে ভারী সুখ! এবার বাছাধন?

আমি মারিনি।

তবেরে শালা। আমাদের অত ভুল হয় না। দে শালার পেটে ছুরি চালিয়ে।

আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল সিলভাঙ্গা পার্টির দুর্বৃত্তরা।

চুপ শালারা। চিৎকার করলেই সব কটাকে সাবরে দেব।

ফিস ফিস করে পরামর্শ করল ক'জন।

ট্রেন আসছিল আপ লাইনে।

সেই ছুরিমারা ছেলেটার দুটো হাত লাইনে বেঁধে দিয়ে বাকি তিনজনকে টানতে টানতে নিয়ে গেল একটা ঝিলের ধারে।

পরদিন সকালে রেললাইনের পাশে দুহাত কাটা অর্ধমৃত সিলভাঙ্গা পার্টির একজনকে পেয়ে পুলিশ তাকে পাঠাল হাসপাতালে। নেপথ্যে আলোচনা করল, শালা দাগী!

অপর তিনজন নিখোঁজ ছিল কদিন।

যেদিন তারা ফিরে এল সোজাডাঙ্গা স্টেশনে সেদিন দেহটা তাদের প্রায় অসাড়। কম্বল ধোলাইয়ে হাত আর পায়ের সন্ধিস্থল গুলো আলগা হয়ে গেছে। হাসপাতালেই যেতে হয়েছিল তাদেরও।

খবরটা অম্বু বিশ্বাসের কানে পৌঁছতে দেরী হল না। অম্বু বিশ্বাস ছুটে গেল একাক্ষিবাবুর কাছে। কম্পিত স্বরে বলল, দাদা সর্বনাশ!

একাক্ষিবাবু সর্বনাশের হিসেবটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, তোমরাও চালাও।

আগামী রবিবারে ইলেকশান। সব ডঙুল হয়ে যাবে যে।

কিছুই হবে না। এমন সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে হবে, ওরা যেন ঘরের বাইরে বের হতে না পারে। যত টাকা লাগে আমি দেব।

একাক্ষিবাবু ছুটল সংবাদপত্র অফিসে।

তাকে দেখেই শঙ্কিতভাবে উঠে দাঁড়াল সংবাদপত্র সেবীরা।

খবর কি দাদা? জানতে চাইল সম্পাদক।

সেলামপার্টি গুণ্ডামি আরম্ভ করেছে আর তোমরা চুপ করে বসে আছ। জনমত সৃষ্টি করতে হলে তোমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে আগে।

নিশ্চয়। সেলাম পার্টিকে এদেশ থেকে নির্বংশ করতে চাই আমরাও। বলুন, যা করতে হবে তা আমাদের অমৃতবাবুকে বলুন। যা বলবেন তাই করবে।

সম্পাদক অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তি। সম্পাদক হবার কিছুমাত্র যোগ্যতা নেই। পৈতৃক জমিদারীর মত উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে এই বিরাট সংবাদপত্রের মালিকানা। ভাড়াটিয়া লোকদের দিয়ে লিখিয়ে নেয় সব কিছু, ছাপা হয় তার নামে। উপরন্তু প্রভু ভজনা করেই তার সম্পদ। হালে কয়েক লক্ষ টাকা পেয়েছে সরকারের কাছ থেকে সংবাদপত্রের মান উন্নয়নের যুক্তিতে। আসল মান হল প্রভু-সেবা, প্রভুও সেই সেবা পাওয়ার আশায় টাকা দিতে মোটেই বিলম্ব করে নি। তাই প্রভুপক্ষের শক্তিশালীসদস্য একাক্ষিবাবু স্বয়ং আসতেই সম্পাদকমশাই ব্যস্ত হল তাকে তোষণ করতে।

যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়ে একাক্ষিবাবু যখন বের হচ্ছিল তখনই সম্পাদকমশাই বলল, আমাদের আরেক বন্ধুকেও যে বলতে হবে দাদা। ওদের কাগজেও যেন ফলাও করে কিছু লেখে।

নিশ্চয় যাব সেখানে। তবে ওদের সম্পাদক এখন নাকি ফ্রান্সে গেছে বেড়াতে।

তাতে কিছু অসুবিধে হবে না। ওদের সম্পাদক আমারই মত বকলমদার। যারা লিখবে তাদের নির্দেশ দিতে সম্পাদকের পুত্র বর্তমান। সেও তো ডিসপ্রেস পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য। তাকে বললেই সব হবে। একবারটি ফোন করুন না দাদা, এখানেই এসে যাবে।

তা মন্দ নয়।

ফোনে খবর পেয়ে ছুটে এল সম্পাদক তনয়।

হেসে বলল, শুধু আপনার আদেশ চাই কাকাবাবু। আদেশ পেলেই সব হবে।

পরদিন সকালের কাগজ পৌঁছল মহামাত্যের হাতে। কাগজ উল্টেই চক্ষু স্থির। পূর্বায়তনে আইন শৃঙ্খলার অবনতি। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা। আশ্চর্য!

ট্রাংক টেলিফোনে যোগাযোগ করল চৌঘটলাল।

একি দেখছি কেরুবাবু?

কেরুবাবু পূর্বায়তনের পুলিশ অমাত্য।

আমিও লক্ষ্য করেছি। পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি জোর তদন্ত করতে। সন্দেহজনক বাহান্নজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও দেড়শ জনকে খোঁজা হচ্ছে।

নির্বাচনের আগে বিরুদ্ধপক্ষের এতজনকে গ্রেপ্তার কি উচিত হবে!

এরা বিরুদ্ধপক্ষের হলেও আমরা নির্দেশ দিয়েছি সংবাদপত্র-ওয়ালাদের, তারা যেন এদের সমাজবিরোধী বলে প্রচার করে।

যা ভাল বোঝেন করুন। লক্ষ্য রাখবেন আইন আর শৃঙ্খলার ওপর। যবন রাজ্যে আমরা দেখেছি আইনকে সম্মান করতে। শৃঙ্খলা রক্ষায় ওরা সর্বাগ্রগণ্য। আমাদের দেশেও অমনটি চাই।

তাই হবে ঝাঁঝোরিয়াজি।

ফোন নামিয়ে রেখে চৌঘটলাল সে সংবাদ পরিবেশন করল মহামাত্যকে।

মহামাত্য ভেবে বললো, আমাদের দুটো অমাত্যকে পূর্বায়তনে পাঠিয়ে দিন নির্বাচনী সভা করতে। তারা শৃঙ্খলা রক্ষার উপদেশও দিতে পারবে।

শুধু পূর্বায়তন হলেই তো হল না মহামাত্যজি। খোটাই রাজ্যেও হাঙ্গামার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সেখানেও খাবার নিয়ে দ্বন্দ্ব। কদিনই তো গুলী ছুড়তে হয়েছে। আরও হাঙ্গামা হবে মনে হচ্ছে।

কারণ?

সেখানে সেলাম পার্টি নেই, কিন্তু মানবদল আছে। তারা রাক্ষস বিরোধী। খোটাইতে সামান্য কিছু, মানে শতকরা বার চোদ্দজন রাক্ষস। তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর প্রচার চালাচ্ছে মানবদল। যে কোন সময়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা হতে পারে।

এর জন্য নির্বাচন বন্ধ রাখতে হবে না কি ?

না, তেমন কিছু নয়। সেলাম পার্টির লোকেরাও সহজে দাঙ্গা হতে দিতে চায় না। তারাও জোর প্রচার চালাচ্ছে মৈত্রী ও ঐক্যের ধুয়া তুলে।

অন্য অঙ্গরাজ্যের খবর।

আর যা কিছু অশান্তি অবন্তিকায়। তবে যা আশা করা গিয়েছিল তা নয়। দেখছি ওখানে বিনা নির্বাচনেই বেশির ভাগ ডিসগ্রেস পার্টির সদস্য অঙ্গরাজ্যের আইন সভায় নির্বাচিত হয়েছে। বিশ পঁচিশটা ক্ষেত্রে হয়তবা লড়াই হবে।

ভাল খবর। গণ ভোটি দল কি করছে ?

তাদেরও কয়েকটা মাথাকে আটক করা হয়েছে। এখন কোন হাঙ্গামাই নেই।

ভালোয় ভালোয় নির্বাচনটা কাটলে হয়।

আমিও তাই ভাবছি মহামাত্যজি। আমার চোখে ঘুম নেই, মুখে খাবার রোচে না।

শুক্রবার রাতে অমাত্য পরিষদের সভা ডাকলো মহামাত্য।

সবাই সেদিন হাজির হতে পারে নি। নিজ নিজ নির্বাচন এলাকায় প্রচার কার্যে ব্যস্ত। তবুও যারা রাজধানীতে ছিল সবাই উপস্থিত হয়েছে।

মহামাত্য বললো, আগামী পরশ্ব আবার আমাদের ভাগ্য নিরুপিত হবে। আগামী পাঁচ বছর আমরা আবার এখানে সম্মিলিত হতে পারব কিনা তা বলতে পারছিনা, তাই সাময়িক ভাবে আজই বিদায় নিতে হচ্ছে সবার কাছ থেকে।

কারও মুখে কোন কথা নেই।

আপনারা জানেন বিগত কয়েক বছরে আমরা দেশের যথেষ্ট উন্নতি করেছি কিন্তু তবু বিরুদ্ধ পক্ষ আমাদের কোনক্রমেই শান্তিতে থাকতে দেয় নি। প্রথম পাঁচ সাত বছর আমরা বেশ শান্তিতে কাজ করেতে পেরেছিলাম। কাজও অনেকটা এগিয়েছিল তখন। কিন্তু তারপর গত পাঁচবছর বিরোধীদের মোকাবিলা করতেই অনেক সময় ও অর্থ নষ্ট হয়েছে, যার ফলে বৈষয়িক উন্নতিও বিশেষ ভাবে বাধা পেয়েছে। এবারের কাজ আজই শেষ। আমরা নতুন করে আবার মিলিত হবার আশা রাখি। যারা অকৃতকার্য হবেন এই নির্বাচনে তারা দুঃখিত হবেন না। আফ্রিকার বহু দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে, সে সব দেশে আমাদের দূত পাঠাতে হবে। কোন দেশেই রাষ্ট্রদূত নির্বাচিত হয় না, সেজন্য আপনাদের চাকরি কায়েম রাখতে আমি সে সব দেশে আপনাদের পাঠাবার ব্যবস্থা করব, অবশ্য যারা নির্বাচনে অকৃতকার্য হবেন তাদের।

বজরংবলী আর অভিরাম চা দিয়ে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে মহামাত্য বললো, বিগত কয়েক বছরে আমি পৃথিবীর সব দেশে গিয়েছি। আমাদের আদর্শ তাদের সামনে তুলে ধরেছি। আমরা যে কোন জোট বন্দী নই সে জন্য সর্বত্র সমাদর পেয়েছি। পাতনের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছি। দুনিয়ার প্রায় সব দেশ-ই আমাদের উন্নতি বিধানে তৎপর হয়েছে। আমরা সহাবস্থান, শান্তি ও মৈত্রীয় উপাসক। সে কাজে আমরা যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছি। তাই আজ বিদেশীরা আমাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

এখানে একবার থামলো মহামাত্য।

চায়ের কাপ শেষ করে বললো, আমরা জমিদারী প্রথা বিলোপ করেছি, কলকারখানা স্থাপন করে বহু লোকের কর্মসংস্থান করেছি। চাষের উন্নতির জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেছি। শত্রুপক্ষ অবশ্য বলছে আমরা মার্কিনী গম পেয়ে দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিনি।

তা কিন্তু সত্যি নয়। কৃষিখাতে যে কোটি কোটি টাকা আমরা ব্যয় করেছি সে টাকা নিশ্চয়ই কোন না কোন কাজে লেগেছে। আমরা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সংস্কৃতিক কৃষ্টি বিনিময় করে পাতনের গরিমা বৃদ্ধি করেছি। আমরা যা করেছি গত কয়েক বছরে, অন্যান্য অনেক অগ্রসর দেশ একশত বছরেও তা করতে পারে নি। অতএব আমরা যদি নির্বাচনে জিততে না পারি তারজন্য মোটেই দুঃখিত হব না। আমরা দেশের সেবা করতে মোটেই ত্রুটি করি নি। জয় পাতনের জয়।

মহামাত্য থামতেই একজন বলল, আজকের কোন এজেণ্ডা কি নেই মহামাত্যজি ?

একটিমাত্র এজেণ্ডা। যে যার নিজ নিজ নির্বাচন এলাকায় ফিরে যান। কেবল যারা ইতিমধ্যেই বিনাভোটে অমাত্য পরিষদের সদস্য হয়েছেন তারাই থাকবেন রাজধানীতে।

শাহুকার সর্দার বলল, মেনিকো রাজ্য থেকে বাণিজ্য বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছে তাদের মূখ্য সচিব। তারা চিনি চায়।

চিনি !

হ্যাঁ। কলওয়ালারা বিশ লাখ রুপেয়া দিয়েছে নির্বাচন তহবিলে। তারা বলছে, বিদেশে সস্তা দরে চিনি দিলে তাদের লোকসান হবে।

তবুও দিতে হবে সর্দারজি, বলেই ভাবতে লাগলো মহামাত্য।

অচেতনরায় বলল, বীজগণিতের ফর্মূলায় তা হলে মিলবে না।

মিলতেই হবে। ওদের লোকসান পূরণ করে দেব দেশে চিনির দাম বাড়িয়ে। বাইরে চিনি না পাঠালে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে না সর্দারজি। বিদেশী মুদ্রা না পেলে দেশের প্রয়োজনীয় অন্য সব দ্রব্য আসবে কি করে। দেশের চিনির দাম বৃদ্ধি করে কলওয়ালাদের লোকসান পূরণ করুন আর মেনিকো হোক বা উরুগুয়ে হোক, সবাইকে সস্তাদরে চিনি দিতে থাকুন।

সর্দারজি মাথা নেড়ে বলল, ঠিক বলেছেন।

তবে চিনি পলিসি ঘোষণা করবেন নতুন অমাত্য পরিষদ গঠন হলে। এখন চুপচাপ থাকুন। নইলে শত্রুপক্ষ সুবিধে পেয়ে যাবে। মনে আছে তো সেই যবনরাজ্যে গাড়ি কেনার ব্যাপার। আমাকে একেবারে নাজেহাল করে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রঘুরামিয়াকে জাপানে পাঠিয়ে তবে নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছি। আর যেন তেমনটি না হয়। মানুষের ভুলো মন, তাই সেই জিপ কেলেঙ্কারী নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাচ্ছে না। ঘটনাটি কিন্তু মোটেই বেঠিক ছিল না। রঘুরামিয়া বেশ কয়েক লাখ গুছিয়ে নিয়েছিল।

বৃহৎকার্যে ওরকম হয়েই থাকে, বলল অচেতনরায়।

তা হলেও জবাবদিহী করতে হয়। টাকা দেয় দেশের লোক। আমরা নানা যোজনা করে দেশের উন্নতি করছি। টাকার অভাবে ট্যাক্স বাড়াতে হচ্ছে। ওরা বলছে, টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, আর তার ফলেই মুদ্রাস্ফীতি হয়ে দেশের লোক কষ্ট পাচ্ছে।

মাথা নেড়ে সবাই তারিফ করল মহামাত্যকে।

আজকের মত আমার বক্তব্য আর কিছু নেই। ভবিষ্যতের জন্য জমা রইল আমাদের অবশিষ্ট হিসেব নিকেশ।

দুই

ভোট যুদ্ধ শেষ। ভোট গণনাও শেষ।

ডিসগ্রেস পার্টির জয় হয়েছে। তবে গত বারের মত জয় জয়াকার নয়। এবার আইন মজলিসে গত বারের চেয়ে সদস্য সংখ্যা অনেক কম। দল যেন ভাঙ্গনের মুখে। মহামাত্য বহু ভোটে জিতেছে। আবার মহামাত্য হয়েছে। এবার তার চোখেও ছায়া পড়েছে ভবিষ্যত অঘটনের। রাতারাতি সব সদস্যকে ডেকে অমাত্য পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। তিনপোয়া অমাত্য আর অর্ধ অমাত্যদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভাঙ্গন রোধের প্রথম পর্ব শেষ করে নিঃশ্বাস ফেললো মহামাত্য।

মুনিয়া এতকাল নেপথ্যেই ছিল।

নাজুকের সংবাদও বিশেষ পাওয়া যায় নি।

এবারের নির্বাচনে অনেকের বিপর্যয় দেখে তারাও চিন্তিত। মহা-শক্তিশালী কণ্ঠকন্টকম বিশ হাজার ভোটে পরাজিত। ন্যাসপাতি-লালের জামানত জব্দ।

এর চেয়ে দুর্ঘটনা আর কি থাকতে পারে।

নতুন অমাত্য পরিষদে যোগ দিল পুরানো প্রায় সবাই। যারা পরাজিত হয়েছে তাদের জায়গায় নতুন অমাত্যের নাম ঘোষিত হল। ন্যাসপাতিলালের দপ্তর পেল অগ্রম পিল্লাই, আর অগ্রম পিল্লাইয়ের দপ্তর ও আইন দপ্তর পেল গলগ্রহ চক্রবর্তী। কণ্ঠকন্টকমের দপ্তর নিলো স্বয়ং মহামাত্য। নতুন অমাত্য হল অপস্রী ভাটিয়া আর নরসুন্দর মেটা। নতুন অমাত্যের জন্য নতুন দপ্তর খোলা হল সমাজ-সেবা আর যোগাযোগ।

অঙ্গরাজ্যের অবস্থাও বিশেষ আশাপ্রদ নয়। যেখানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল সেখানেও ভাঙ্গনের লক্ষণ দেখা দিল। সেলাম পার্টির সংখ্যা ছিল পূর্বায়তনে মাত্র ষোল জন, সেখানে তাদের সংখ্যা এখন বেয়াল্লিশ। ডিসগ্রেস পার্টি এখন বিশেষ চিন্তিত। একাক্ষিবাবু বুঝতে পারল দলের সংগঠনে ঘুণ ধরেছে। এবার নতুন করে দলকে ঢেলে সাজাতে হবে, নইলে আগামী নির্বাচনে ডিসগ্রেস পার্টিকে বিদায় নিতে হবে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে।

নাটকের পরবর্তী দৃশ্য কিন্তু মোটেই আশাপ্রদ নয়।

যারা প্রশাসনের শীর্ষে বসল তারা জনতার দেওয়া অভিমত ভুলে গেল আসনে বসেই। যারা ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ভোটের জন্য দুয়ারে দুয়ারে ধর্না দিয়েছিল, তারা গদীতে বসে ভোটদাতাকে মনে করল ভিখারী। যবনিকা উঠলে দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। কিছুটা প্রহসন, কিছুটা করুণ, কিছুটা শিক্ষণীয়। দর্শক সাধারণ মানুষ। তারা দেখল, বুঝল, একটি ভোটের কত বড় মহিমা।

মহামাত্য আইন মজলিসে ঘোষণা করল বর্তমান সরকারের নীতি। সে নীতি হল সমাজবাদ প্যাটার্ন।

লোকে ভাবল সে আবার কি! সমাজবাদ বুঝি, ধনতন্ত্রবাদ বুঝি, সাম্যবাদ বুঝি কিন্তু প্যাটার্নবাদ যে কি বুঝি না।

মহামাত্য হেসে বলল, অর্থাৎ সমাজবাদকে যে ভাবে তোমাদের সামনে আমরা এনে দাঁড় করাই না কেন, তাকেই প্যাটার্ন মনে করতে হবে। অর্থাৎ ধনতন্ত্র থাকুক, স্বৈরতন্ত্র থাকুক আমার অমৃতবাণীতে সেটাই হবে সমাজবাদের প্যাটার্ন।

অসহায় অজ্ঞ মানুষ ধন্যবাদ দিল মহামাত্যের উর্বর মস্তিষ্ককে। এমন তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম কূটনীতিজ্ঞান না থাকলে কি মহামাত্য হওয়া যায়!

মহামাত্যের দৃষ্টি পড়ল জনসমাজে। সেখানে সমাজবাদ প্রবেশ করাতে হবে রুচিতে।

রাস্তা ঘাটে নারী পুরুষের সমান অধিকারের ঢাকঢোল পেটানো হয়েছে বহুকাল অবধি। তারই ফলাফল দেখা গেল অচিরেই।

পুরুষ—বেকার।

নারীর বিবাহ বন্ধন—ভাগ্য।

জোয়ান নারী পুরুষ নৈরাশ্য রোগে ভুগছে। কিন্তু দেহ বিজ্ঞান তো কোন তথ্য মানতে চায় না, তাই নারী পুরুষের নৈকট্য, যৌন লালসাকে এগিয়ে দিতে থাকে বিপথে।

মহামাত্যকে প্রশ্ন করা হল, একি!

হেসে মহামাত্য বললো, এভাবে সমাজ গঠন করতে না পারলে যৌবনের এই শক্তি অচিরেই আমাদের টেনে নামাবে গদী থেকে। ওদের শৃঙ্খলাহীন যৌন বিলাসে ভাসিয়ে দিতে পারলে দেশ ও দশের চিন্তা থেকে অনেক দূরে চলে যাবে ওরা। আমরা নিরাপদে বাস করতে পারব আরও বিশটা বছর। ততদিনে সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে। নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবার আগেই আমরাও ফতে হয়ে যাব।

কিন্তু?

আবার কিন্তু কিসের?

ওদের অন্যভাবেও ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারে দেশের শত্রুরা। ধরুন অঙ্গরাজ্য নিয়ে সেবার হাঙ্গামা বাধিয়ে ছিল পূর্বায়তনের মানুষরা। ওরা জখমের অংশ চেয়েছিল। খোটাইয়ের অংশ চেয়েছিল। কোন রকমে খোটাইয়ের কিছু শুকনো জায়গা দিয়ে সেবার একটা সাময়িক শান্তি আনা গেছে। সেই পুরানো দাবী তুলে আবার কোন একটা হাঙ্গামা বাধাতে পারে।

তার আশঙ্কা যে নেই তা বলতে পারি না। তবে এসব হাঙ্গামার মূলে রয়েছে উৎপাতন রাজ্য থেকে আসা ঐসব আশ্রয়প্রার্থীরা। ওদের শায়েস্তা করতে পারলে এ হাঙ্গামা আর হবে না।

শায়েস্তা করা সহজ হবে কি?

সহজ নয় ঠিক, তবে ওদের দল ভেঙ্গে দিতে পারলে কিছুটা শান্তি আসবে। ঠিক করেছি ওদের কলোনী করে দেব ওড্র আর মধ্যভুক্তি অঙ্গরাজ্যে। কিছু পাঠিয়ে দেব সমুদ্র পেরিয়ে অজন্তা দ্বীপে। এতে যেমন ওদের দল ভাঙ্গবে তেমন শক্তিও কমবে। আমরা মোটামুটি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারব।

কাজটা কিন্তু সহজ নয় মহামাত্যজি।

তা জানি। তবে চেষ্টা করতে হবে।

নাজুক বাঈ হঠাৎ এসে কথার মাঝে বাধা দিল। মাথা নত করে নমস্কার করে বলল, ক'জন লোক আপনার দপ্তরের সামনে দাঁড়িয়ে হৈ-চৈ করছে।

কারণ ?

তারা বলছে গুরুজির নিরুদ্দেশের পেছনে আপনার অদৃশ্য হাত ছিল।

আর কি বলছে ?

বলছে, গুরুজিকে খুঁজে বের করতেই হবে। তাদের ধারণা গুরুজিকে হত্যা করা হয়েছে। আর এই হত্যায় আপনার সক্রিয় সহযোগিতা ছিল।

হুঁ। বলে ফোন তুলে নিলো মহামাত্য।

কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দিল মহামাত্যের দপ্তরের সামনে থেকে। বিক্ষোভকারীরা ক্ষুব্ধ হল কিন্তু তারা স্পষ্ট জানিয়ে গেল, গুরুজির এই নিরুদ্দেশের সঙ্গে মহামাত্যের যোগাযোগ ছিল।

আজ মহামাত্য উত্তেজিত হলো না। দশ বছর আগে তার যে দাপট ছিল, আজ যেন সে দাপট আর নেই। বিশেষ করে আজ তার মনে হচ্ছে যে বয়সটাই যেন তাকে বেশি কাবু করে ফেলেছে। আজকাল আর বাঈয়ের দিকেও ভাল করে তাকাতে তার দ্বিধা হয়।

অথচ কয়েক বছর আগেও মেয়েদের সাজসজ্জার প্রশংসা

করেছে মহামাত্য। পাতনীয় বিউটি যে পৃথিবীর চোখ ধাঁধাতে পারে সে বিষয়ে তার মনে তখন কোন সন্দেহ ছিল না। আঁটো-সাটো বগলকাটা পেটবেরকরা ব্লাউজ, যাকে শুধু মাত্র বক্ষ বন্ধনী বললেও ভুল হয় না, তার প্রশংসা করেছে মহামাত্য। শাড়ির জৌলুস যে সালোয়ারের চেয়ে বেশি তাও বলেছে। নাচের মজলিসে যখন মেয়ে পুরুষ হাত ধরাধরি করে নেচেছে তখন তার তারিফ করেছে হাততালি দিয়ে। আজ যেন বয়সটা-ই হঠাৎ বেড়ে গেছে। কোথায় যেন গুরুতর একটা গোলযোগ হয়ে গেছে। কেমন একটা সঙ্কোচবোধ করছে মহামাত্য আজকাল।

মুনিয়াও লক্ষ্য করেছে তার ড্যাডির এই ভাবান্তর। কিছুকাল আগেও যে কোন না কোন অফিসারের রূপসী পত্নীর বগলে হাত দিয়ে ঘরে ফিরেছে, আজকাল সে একাই নেমে আসছে সরকারী ভবন থেকে। পেছনে পড়ে থাকছে সেই সব রূপসীরা। মহামাত্য পেছন ফিরে একবার তাকিয়েও দেখছে না তাদের।

এতদিন নাজুকই ছিল মহামাত্যের বিশেষ অনুগ্রহভাজন। আজকাল সেই নাজুককে দেখলেও চমকে ওঠে। নাজুকের যৌবন তখনও বর্ষার নদীর মত। সে গাঙ্গে সাঁতার দিয়ে বেড়াবার মত দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্যও যেন হারিয়ে ফেলেছে মহামাত্য। মাঝে মাঝেই কিসের চিন্তায় ডুবে যায়, কে যেন তার কানে কানে বলে, গুরুজি কোথায় গেল? দেশ ভাগের কথা ভাবলেই লক্ষাধিক মানুষের আত্মা যেন তাকে তেড়ে আসে। আঁতকে ওঠে মহামাত্য। সহস্র সহস্র নারীর ক্রন্দন তার কানে যেন আগুন ঢেলে দেয়। চমকে উঠে কান পেতে শোনে আবার রুমাল দিয়ে কান চেপে ধরে।

মুনিয়া তার ড্যাডির এই ভাবান্তর লক্ষ্য করেছে। কারণ জানতে চেয়েছে কিন্তু উত্তর পায় নি। অথচ যখনই দপ্তরে বসেছে মহামাত্য তখনই তার এই ভাবান্তর কেটে গেছে। আবার যেন পূর্বের ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে। আশঙ্কা থাকলেও তা গোপন করতে পেরেছে।

অমাত্য পরিষদে অভিযোগ উত্থাপন করল সঞ্চচরণ সিং সাহেবজাদা।

মহামাত্যজি আমাদের প্রতিবেশী আরসুলা রাজ্যের সঙ্গে কি সদ্ভাব রাখতে চান না?

ঠিক বুঝলামনা আপনার কথা সাহেবজাদা,—বললো মহামাত্য।

যে পাহাড়ী রাজ্যকে আপনি ও আমরা আরসুলা রাজ্যটির অংশ বলে স্বীকার করেছি, সেই পাহাড়ী রাজ্যের ধর্মগুরুকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন, এর কারণ, কারণ কি এই যে সে আরসুলা রাজ্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছে?

না, ধর্মগুরু রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন।

তাকে আশ্রয় দেবার মত বহু রাষ্ট্র পৃথিবীতে আছে, বিশেষ করে তাদের ধর্মাবলম্বী দেশেরও অভাব নেই দুনিয়াতে।

তারা ভীত।

কিন্তু আমরা যা করেছি তাতে আমাদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরবে।

আমি নিরুপায়। মার্কিন সরকার চায় আমরা এই ধর্মগুরুকে আশ্রয় দেই। আমাদের ভবিষ্যত নির্ভর করছে মার্কিন সরকারের সদিচ্ছার ওপর। তাদের অখুশী করতে পারি না।

ভবিষ্যতে কোন হাঙ্গামা হলে তার ঝুঁকি মার্কিন সরকার নেবে কি?

তারা তো অনেক সাহায্যই করছে।

খুশী হতে পারলাম না। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে ভবিষ্যতে অনেক অসুবিধা দেখা দেবে। আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হবে।

একটি ভুল সংশোধন করেছি সাহেবজাদা। আবার দ্বিতীয় ভুল করা কি উচিত?

ভুল!

হ্যাঁ ভুল। আরসুলা রাজ্যকে স্বীকৃতি দেওয়াটাই মস্ত ভুল। সে ভুলের জন্য মার্কিন সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা ঘটেছে। এবার আশা করতে পারি আমরা যে মার্কিন সাহায্য আবার পাব।

মার্কিন সাহায্য মানেই তো ঋণ।

সে ঋণ দিতেও তো কেউ রাজি নয়। অথচ বৈষয়িক উন্নতি চাই-ই। লোকে ক্রমেই ডিসগ্রেস পার্টির বিরুদ্ধাচরণ করছে। তাদের সামনে কতকগুলো কল কারখানা দাঁড় করাতে পারলে কিছুটা আস্থা ফিরে পাব। আরও রয়েছে খাদ্য সমস্যা।

সেটাও তো আমাদের স্বেচ্ছাবৃত। আমরা আমাদের ভূমি ব্যবস্থার কোন উন্নতি ঘটাতে পারিনি। কৃষির জন্য নির্ধারিত অর্থের অপব্যয় ঘটেছে! চাষীর মনে যেমন উৎসাহ নেই, তেমন কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও নেই কাজের।

তা করা সম্ভব নয় সাহেবজাদা। মার্কিনী গম আনতেই হবে। বিনিময়ে আমরা চিনি দেব, চা দেব, কফি দেব, জুতো দেব। তারা নগদ মূল্যে কিনবে না, আমরাও নগদ মূল্য দেব না। যদি দেশ খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয় তা হলে গম আসবে না, অর্থাৎ মার্কিন সাহায্যের একটা পথ বন্ধ হলেই অস্ত্রশস্ত্রও পাব না। জানেন তো, মার্কিন শিল্পের শতকরা চল্লিশ ভাগই হল অস্ত্র-শিল্প। তাদের তৈরী অস্ত্র যদি বাজার না পায়, সে দেশেও বেকার সমস্যা দেখা দেবে, সেখানেও সেলাম পার্টি গজাবে। মার্কিন কর্তারা তা চায় না। তাই তারা সারা দুনিয়াতে অস্ত্রের বাজার খুঁজছে। যার জন্য আমাদের অস্ত্রর কারখানাগুলোকেও স্বয়ম্ভর করতে পারছি না।

তা হলে আপনি শুধু মার্কিন স্বার্থ দেখছেন?

ঠিক তা নয়। দেশের লোককে খাবার দেবে মার্কিন, সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার অর্থ দেবে মার্কিন—এর চেয়ে বেশি কি চাও।

সাহেবজাদা নীরব হল। একমত হতে পারল না মহামাত্যের সঙ্গে কিন্তু কঠিন প্রতিবাদও করতে সাহস পেল না। জনগণের একটা বৃহতাংশে মহামাত্য পুলকেশী এখনও বীরপূজা পায়। তার দোষ ত্রুটি সমালোচনা করতে ভরসা পায় না সাধারণ মানুষ।

মহামাত্য মুখ তুলে তাকালো সাহেবজাদার দিকে।

বললেন, দেশগঠন আমাদের কাজ। কার কাছ থেকে কতটা সাহায্য নিলাম, কোন সর্তে সে সাহায্য পেলাম তা জানার প্রয়োজন নেই জনসাধারণের। দরকারও নেই। তারা দেখবে দেশে কল কারখানা বসেছে। তারা দেখবে কত সেচের খাল কাটা হয়েছে। তারা দেখবে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতালোকের প্রাচুর্য—এই তো যথেষ্ট।

সাহেবজাদা কোন উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নাড়ল।

অমাত্য পরিষদের পুরানো সদস্যরা সমর্থন জানালো মহামাত্যকে, নতুন সদস্যরা তখনও অমাত্য পরিষদের কার্যধারা পুরো রপ্ত করতে পারেনি। তারা মাথা নেড়ে সমর্থন জানিয়ে কাজ শেষ করল।

নতুনমন্ত্রী অপ্সরা ভাটিয়া চতুর্বেদীর গাড়িতে উঠল। পানিগ্রাহী মুখ ঘুরিয়ে দৃশ্যটা দেখে নিল। কেমন মায়াময় একটা ছায়া দেখা গেল গলগ্রহ চক্রবর্তীর চোখে।

পদ্মাবতী পুরানো মন্ত্রী। বিগত পাঁচটা বছর হোসেন আলির সঙ্গেই ঘোরাফেরা করেছে। তার চাল চলনে আজও কোন নতুনত্ব ছিল না, তার দিকে কেউ তাকিয়েও দেখলো না।

ওদিকে অঙ্গরাজ্য অবন্তিকা থেকে সংবাদ এসেছে আরসুলারা খুবই উৎপাত করছে সীমান্তে। সীমান্ত বরাবর সৈন্য সমাবেশ করেছে আরসুলা রাজ্যের নেতারা। তারা দাবী করছে উত্তর পাতনের কিছুটা অংশ।

আরসুলা রাজ্য থেকেও কড়া নোট এসেছে। তারা বলেছে, পাতন রাজ্য রক্ষীবাহিনী তাদের সীমানা ছেড়ে আরসুলা রাজ্যে প্রবেশ করেছে। এভাবে সীমান্ত লঙ্ঘন করেছে যে, যে কোন সময় সংঘর্ষ সুরু হতে পারে। সত্বর রক্ষী বাহিনীকে সংযত করার অনুরোধ জানিয়েছে তারা।

তাল পড়ে শব্দ হল না শব্দ হওয়াতে তাল পড়ল, তা ঠিক বোধ-গম্য হল না!

অমাত্য পরিষদের সভা বসল। নানা মুনি নানা মত দিয়ে

জিনিসটাকে কেউ ঘোরালো, কেউ তরল করার চেষ্টা করল। অশান্তি নিবারণে এগিয়ে এল না কেউ। অমাত্য পরিষদও স্থির করতে পারল না তাদের কর্তব্য। মহামাত্য তখন বিদেশে রয়েছে শুভেচ্ছা সফরে। সংবাদ যথারীতি পৌঁছল তার কাছে। প্রথমে মহামাত্য রইলো নির্বাক। তার পরেই হঠাৎ মুখ খুলে বললো, সীমান্ত লঙ্ঘন যারা করবে তাদের বাহুবলে হটিয়ে দাও। চারদিকে সাজ সাজ রব উঠল। যুদ্ধ! যুদ্ধ! কিন্তু সীমান্তটা যে ঠিক কোথায়, তা কেউ স্থির করতে চেষ্টা করল না। পাতন রাজ্য আর আরসুলা রাজ্য নিজেদের ইচ্ছেমত সীমান্ত দাবী করল।

ছুটে এল আরসুলা রাজ্যের মহামাত্য।

আলোচনা হল।

সব ব্যর্থ।

কেউ নিজেদের দাবী ছাড়তে রাজি নয়।

অতএব বাহুবল মহা বল।

অস্ত্রের ঝনঝনা শোনা গেল সীমান্তে। কে দোষী আর কে নির্দোষী তা বিচার করার কেউ নেই।

একদল বলল, আরসুলার অনেক চেলা আছে এদেশে, তাদের আটক কর, তারা দেশদ্রোহী। বক্তাদের গলার জোরের চেয়েও জোরদার সংবাদ পত্রের প্রচার ব্যবস্থা।

আরসুলা রাজ্যের সমর্থক সন্দেহে সমাজবিরোধীরা সেলাম পার্টির নেতাদের আর কর্মীদের ওপরে হামলা সুরু করল।

পুলিশ রাতারাতি হানা দিতে লাগল ঘরে ঘরে।

জেলখানা ভর্তি হল বিনা বিচারের বন্দীতে।

সীমান্ত তখন উত্তপ্ত।

রক্তের বন্যা বইছে সেখানে।

পাতন বাহিনী পশ্চাদ্‌পদ হতে হতে সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চল ছেড়ে একেবারে সমতলে হাজির।

আরসুলা বাহিনী আর না এগিয়ে সেখান থেকেই আবার ফিরে গেল স্বদেশে।

আইন মজলিসে প্রশ্ন উঠল, কেন এই বিপর্যয় ?

তদন্ত হোক !

পাতনীয় সৈন্য পৃথিবীর সেরা সৈন্য। অথচ তাদের এই দুরবস্থা কেন ?

শীত !

পার্বত্য হিমের সঙ্গে পরিচিত নয় পাতনীয় সৈন্য।

তাদের তো গরম জামাকাপড় যথেষ্ট ছিল।

তা দিয়ে শীত নিবারিত হয় নি।

কারণ ?

পরীক্ষা করে দেখা গেল, শীতবস্ত্রে শতকরা চল্লিশভাগ পশমের বদলে পুরোটাই সুতোর। এই ভেজাল শীতবস্ত্র পাহাড়ী হিমের উপযুক্ত নয়।

আরও তদন্ত হোক।

তস্কর কোম্পানীকে সীমান্তে যে পথ তৈরীর ঠিকা দেওয়া হয়েছিল, সে পথ তৈরী হয় নি।

পথের সাঁকোগুলো এতই দুর্বল যে ট্যাঙ্কগুলো উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো ভেঙ্গে পড়েছে। পথ তৈরীর সম্পূর্ণ টাকাটাই বরবাদ হয়েছে। পথের অভাবের জন্যই পাতনীয় সৈন্য অগ্রসর হতে পারে নি। তাদের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। তেলের অভাবে বিমান পথেও সময় মত অস্ত্র পাঠানো যায় নি।

আর অস্ত্র।

তা সেই মান্ধাতা আমলের।

মাথায় হাত দিয়ে বসলো মহামাত্য। তার সাধের পাতনের এমন পরাজয় সে কল্পনাও করতে পারে নি। বুভুক্ষু মানুষকে গুলী করে ক্ষুধা মেটানো যত সহজ, শক্তিশালী শত্রুকে বাধা দেওয়া তত সহজ

নয়। আর এই কেচ্ছার নায়ক হল মহামাত্যের এক অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি। দোষটা অপরের স্কন্ধে চাপিয়ে আত্মতোষণের জন্য প্রচার ব্যবস্থা জোরদার করা হল।

রাতারাতি অনুগ্রহভাজনকে সরিয়ে দেওয়া হল বিদেশে।

অস্ত্র নির্মাণের কারখানায় বালতি-লণ্ঠন তৈরী বন্ধ হল। মার্কিন সাহায্যের আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। সময় কালে সে সাহায্যও পাওয়া যায় নি।

চোখে সর্ষের ফুল দেখলো মহামাত্য।

আইন মজলিসে আর মুখ তুলে দাঁড়াতে পারে না মহামাত্য। সবাই অভিযোগ করে তার বিরুদ্ধে।

মহামাত্য আর সহজে দপ্তরে আসে না। তার একান্ত সচিব প্রেসনোট জারী করে জানিয়ে দিল মহামাত্য খুবই অসুস্থ।

মহামাত্যের অনুপস্থিতিতে তার কাজকর্ম পরিচালনা করবে চৌঘটলাল।

চৌঘটলাল বসলো মহামাত্যের আসনে।

পুলকেশী অমিত্রারি রয়ে গেলো পর্দার অন্তরালে। তার প্রতিনিধি হিসাবে অমাত্য পরিষদে স্থান পেল তার কন্যা মুনিয়াবাঈ। প্রচার ব্যবস্থা জোরদার করার দায়িত্ব নিল মুনিয়া।

লোকে হাসলো।

এ যেন জমিদারী। বাপের জমিদারীর উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেছে কন্যা।

বিরুদ্ধপক্ষ ক্রমে জানতে পারল মহামাত্য মানসিক রোগে ভুগছে। তাকে বিদেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চিকিৎসার জন্য।

স্থায়ীভাবে মহামাত্যের আসনে বসল চৌঘটলাল।

প্রথম দিনের ভাষণে সে শ্রদ্ধা নিবেদন করল পূর্ববর্তী মহামাত্যকে। তারপর জানাল তার সরকারের নীতি ও কার্যক্রম।

জোর দিয়ে বলল, পুলকেশীজির নির্বাচিত পথ থেকে এক ইঞ্চিও সে সরবে না।

আতঙ্কিত হল সাধারণ মানুষ।

পুলকেশীর রাজত্বকালে মানুষের দৈন্যদশা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা যে আরও বৃদ্ধি পাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না।

ভাসতে ভাসতে পশ্চিম উৎপাতন থেকে এসেছিল সর্দার জ্ঞান সিংহের পরিবার। পরিবারের দশজন যে কি ভাবে মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে পাতনের জমিতে পা দিয়েছিল তা জ্ঞান সিং নিজেও বলতে পারবে না। তার গাঁয়ের এমন পরিবার আর ছিল না যাদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় নি উৎপাতন ছেড়ে আসার সময়ে। কারও বাবা মরেছে, কারও সন্তান, কারও স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, কারও গেছে কন্যা। অথচ জ্ঞান সিং সস্ত্রীক আটটি পুত্রকন্যা নিয়ে অক্ষতভাবে পৌঁছেছিল অবন্তিকা অঙ্গরাজ্যের মাটিতে।

অবশ্যই জ্ঞান সিং নিঃস্ব হয়েই এসেছিল।

ভাগ্য তাড়িত এই পরিবারের তিন কন্যা রামপিয়ারী, তারাকাউর আর শ্যামমোহিনী ছিল নেহাত চাষার ঘরের মেয়ে। উৎপাতন ছেড়ে এসে তাদের না রইল চাষ, না রইল চাষীর মন। অবন্তিকা রাজ্যে চাষের ভুমি সংগ্রহের চেষ্টা করেছিল জ্ঞান সিং, কিন্তু এক ছটাক জমিও সে পায় নি। কারণ, অবন্তিকা রাজ্যের খাস অধিবাসী ভিন্ন পাতন রাজ্যের কোন ব্যক্তিকে জমি দেবার আইন নেই অবন্তিকা রাজ্যে।

জ্ঞান সিং ধাক্কা খেল প্রথম।

আইনের চোখে পাতনের সব প্রজা সমান অথচ এ কি ব্যবস্থা! এখানে পৃথক আইন কেন অবন্তিকার জন্য!

জ্ঞান সিং ফেরী করে বেড়ায় পথে পথে।

ফেরী করতে করতে একদিন সপরিবারে এসে হাজির হল

পাতনের রাজধানীতে। তখন রামপিয়ারী, তারা আর শ্যামমোহিনী পুরো যুবতী। অনেক শহর গ্রাম ঘুরে বেরিয়ে সজাগ হয়েছে তারা।

রাজধানীর পথে ফেরী করে ক্লান্ত জ্ঞান সিং যখন শহরের উপকণ্ঠে তার বস্তীতে ফিরে আসে তখন তার দেহে আর প্রাণ থাকে না। কোন রকমে ডাল রুটি খেয়ে শুয়ে পড়ে।

ছেলেরা ছোট।

সংসারের কোন সাহায্যই করতে পারে না।

দুবছর আগে যে সালোয়ার কিনে দিয়েছিল মেয়েদের সেই সালোয়ার ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্ত্র নেই তাদের। ছেলেদের সম্বল একটা করে আণ্ডারওয়ার। স্ত্রীর সালোয়ার বোধহয় দশ বছর আগে কেনা হয়েছিল। তা দিয়েই কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করেছে এত-কাল।

রামপিয়ারী বাবার দুঃখ বুঝত। বস্তীর পাশে সামান্য কয়েক হাত জমিতে শাক-পাতা লাগিয়ে বাবাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করত। সে চেষ্টা এতই সামান্য যে গণনার মধ্যে আনা যায় না। তারা পাশের বস্তীগুলোয় গিয়ে তাদের গৃহস্থালীর তথ্য জানার চেষ্টা করত। তার আচরণে ছিল কেমন একটা গাম্ভীর্য। মনের কথা জানতে দিত না কাউকেই। সময় মত কাজ করাই যে উচিত তা সে বুঝত।

তারাই বুদ্ধি জোগাল। বলল,

চল দিদি আমরা কোন ব্যবসার ধান্দা করি।

ব্যবসা! মূলধন কোথায়?

তারা ভ্রূ কুঁচকে নিজেকে দেখিয়ে দিল। তার চোখের সে চাহনির সঙ্গে তারা কেউ-ই পরিচিত নয়।

রামপিয়ারী কিছুটা শঙ্কিত হল, তবুও তারার প্রস্তাবকে একে-বারে নস্যাৎ না করে একদিন সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া শেষ করে দুই বোনে বেরিয়ে পড়ল শহরের পথে।

কর্মব্যস্ত শহরে দুটি চাষীর মেয়ে সাধারণ কারও নজরে না পড়লেও তাদের ওপর নজর দেবার মত লোকেরও বিশেষ অভাব হল না। বাজপাখীর দল ঠিকই আবিষ্কার করল তাদের।

আইন মজলিসে যাবার পথেই দেখা সমশের সাকশেনার সঙ্গে।

কোথায় যাচ্ছ বাঈ ?—প্রশ্ন করল সমশের। তার প্রশ্নটায় ছিল ঘনিষ্ঠতার সুর মেশানো।

তারা হাসল। অনেক শহর গ্রাম ঘুরে তখন সে বেশ পোক্ত হয়েছে। তাই প্রশ্নকারীকে দেখেই ফিক্ করে হেসে দিল।

শহর দেখছি।—উত্তর দিল রামপিয়ারী।

কোথা থেকে এসেছ ?

দেহাত থেকে।

শহর দেখবে, তা তোমরা রাস্তা ভুল করবে না তো ?

তারা খিল খিল করে হেসে বলল, রাস্তা ভুল করতেই তো এসেছি।

চল তোমাদের শহর দেখিয়ে আনব।—সাগ্রহে এগিয়ে এল সমশের সাকশেনা।

খুবই আনন্দের কথা, কিন্তু দরকার হবে না। আমরা অন্ধ নই। উত্তর দিল রামপিয়ারী।

সমশের সাকশেনা কাঁচা লোক নয়। মানুষ বাজিয়ে নিতে সে জানে। তারার হাসি আর কথার ভঙ্গীতে আশান্বিত হল। খেলিয়ে তুলতে হবে মাছ, তাই খেলার ধরন ঠিক করে নিল মনে মনে।

রাগ করছ বাঈ ?

রাগ! অনুরাগ! ভালই বলেছ। চল দিদি লোকটা ভাল নয় মনে হচ্ছে।

কি করে বুঝলে ?

যদি ভাল লোক হও তা হলে নিজের পথ ধর।—কথার সঙ্গে চোখের ভঙ্গী করল তারা।

সমশের গলির পথ ধরল। এখনই আর বেশি ঘাঁটাতে রাজি নয় সে। মাল হাত ছাড়া হতে পারে।

তারা রামপিয়ারীর হাত ধরে টানতে টানতে আবার ফিরে চলল দেহাতের পথে। রামপিয়ারী কিছুই বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, তোর ভাব বুঝতে পারছি না?

আর বুঝে কাজ নেই। তারা জবাব দিল,—চারে মাছ ভিড়বে। এবার বরাত গুছিয়ে নিতে হবে।

মানে?—বিস্মিতভাবে ফের প্রশ্ন করল রামপিয়ারী।

লোকটা মোটেই ভাল নয়। ঠিক হাজির হবে আমাদের ডেরায়।

তারপর?

তারপরের কাজ হবে দুটো চোখের। মুখের ভঙ্গী আর চোখের চাহনি। বাস্।

মানে?

চোখের আগুনে পুড়বে আর টাকা দেবে। বুঝলি।

রামপিয়ারী শঙ্কিত হল, বলল, এ বুদ্ধি তোকে কে দিল!

পাশের বাড়ির সুখিয়া। সেও খেতে পেত না। বাবা অন্ধ, মা বৃদ্ধা। কোন পথ ছিল না বাঁচার। একদিন সে শহরে গিয়েছিল ভিক্ষে করতে।

ভিক্ষে করতে?

হ্যাঁ। আমাদের মতই অসহায়। আর তো পথ ছিল না। ভিক্ষে করাই তো বড় ধান্দা।

একথা তো কখনও বলিস নি তারা।

কাকে বলব। রোজদিন তাকিয়ে দেখি বাবার কষ্ট আর ভাবি এর প্রতিকার কি! একদিন সুখিয়া বলল, আমারও ওরকম অবস্থা হয়েছিল। শহরে গিয়ে দুষ্টুলোকের হাতে পড়েছিলাম। তারপর কোন রকমে ফিরে এসেছিলাম গাঁয়ে, কিন্তু দুষ্টুলোকেরা পেছন ছাড়ল না।

থাম তারা। দুষ্টুলোকেরা পেছন ছাড়বে না ঠিকই, তা বলে তাদের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারব না। সুখিয়ার মত সুখ আমরা চাই না।

বিলিয়ে দিতে হবে কেন! সুখিয়া কেমন সেজেগুজে বের হয় জানিস! তার সাজগোজ ছিল বলেই কদিন থেকে চাকরি পেয়েছে একটা দোকানে। কাজ কিছুই নয়। শুধু মাল বিক্রি করা। তাও দামদর করা নয়। দাম লেখাই থাকে, বিক্রিটা বেশি হয় সুখিয়াকে দেখে। খদ্দের ভিড় করে, সুখিয়ার ঠোঁটে থাকে দুষ্টু হাসি।

রামপিয়ারী ভাবছিল তারার কথা। তারা এত শিখল কি করে!

সুখিয়া বাপ মাকে সুখে রেখেছে। বিয়ের কথাও নাকি হচ্ছে।—আবার বলল তারা কাউর।

রামপিয়ারী দুহাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে গেল।

অমন করছিস কেন দিদি?

তোর কথা সহ্য করতে পারছি না তারা। ওযে খুবই নোংরা কাজ। ঢং করে পয়সা কামাই! ছিঃ!

তারা তখন খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসির শব্দে পথ-চারীরা ফিরে তাকাল তাদের দিকে।

হাসছিস!

তারা বলল, পেট! পেট ভর্তি না হলে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধিও থাকে না। আসল বস্তু হল টাকা। টাকা থাকলে আমাদের কাজ ভাল কি মন্দ তা কেউ জিজ্ঞেসও করবে না। টাকা আমাদের নেই তাই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে অনেক। নে চল তাড়াতাড়ি। পেট ভর্তি করার ব্যবস্থা করছি।

তারার অনুমান মিথ্যে নয়। সুখিয়ার হিসেব মতই পরের দিন বেলা দশটা না বাজতেই সমশেরকে দেখা গেল তাদের বস্তীর সামনে।

তারা যেন তারই অপেক্ষা করছিল।

সমশেরকে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞেস করল, কি মনে করে! চিড়িয়া ধরতে?

হাসতে হাসতে সমশের বলল, দেহাতে এসেছিলাম কাজে। তোমাকে দেখতে পেয়ে মনে হল তোমার সঙ্গে পরিচয় করা উচিত। তাই এসেছি। কাল তা হলে রাস্তা ভুল হয় নি।

পরিচয়! তা বটে। তা তো হল, মতলবটা কি? রাস্তা ভুলতে চেয়েও ভুলতে পারি নি।

মতলব। তা যা মনে কর। বেশ মিঠে গলা সমশের সাকশেনার।

আছে কিছু পকেটে?

কত চাই?—প্রস্তুত ছিল সমশের।

যত দিতে পার।

দশ রুপেয়া।

উঁহু।

পনর।

বের কর।

সমশের টাকা বের করে দিতে দিতে বলল, কখন আসবে তুমি?

আমি আসব কেন, তুমি আসবে। তা তোমার নামটা কি?

জনার্দন শর্মা।

একদম বামুনের ছেলে। ভাল কথা।

টাকা গুনে কোমরে গুঁজে বলল, একটা চাকরি দিতে পার জনার্দন।

চাকরি! কত চাকরি চাই। তোমার চোখের পলক না পড়তেই চাকরি দিতে পারি। তবে চোখটা যেন আমার ওপর খুশী থাকে।—হি-হি করে হাসল শয়তানের হাসি। হাসতে হাসতেই ফিরতি পথ ধরল।

রামপিয়ারী ঘর থেকে সবই শুনছিল।

সমশের চলে যেতেই বাইরে এসে তারাকে বলল, এ সব কি হচ্ছে তারা।

পরে জানতে পারবি। এখন চোখ বুঁজে থাক। যা দেখবি কাউকে বলবি না। এই নে পনর টাকা। বাবাকে দিস মায়ের সালোয়ার আনবে।

রামপিয়ারী হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিতে পারছিল না।

নে। তোকে তো ছোট হতে হয় নি। দেখা যাক সুখিয়ার বুদ্ধিতে কতটা এগোনো যায়।

আরম্ভ এখানে। শেষ হল পুলিশ হাজতে।

সমশের আটক হয়েছে তারার ফাঁদে পড়ে। তারাও রেহাই পায় নি।

দুজনেই হাজির হল আদালতে।

তারা বলল, হুজুর কসুর আমার নেই।

হাকিম মুখ তুলে তাকাল।

তারা বলল, আমাদের ঘরে আগুন লাগল দেশ স্বাধীন হতে। তার জন্য কোন খেসারত দিল না যারা গদীতে বসল, তারা। আমার বাবা খেতে দিতে পারতেন না তার আটটা সন্তানকে। পথে পথে ফেরী করেন, আজও ফেরী করছেন কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয় না। একদিন বের হলেম ভাগ্য অন্বেষণে। পথেই দেখা হল সমশেরের সঙ্গে। নাম বলল জনার্দন। চাকরি চাইলাম। সে চাকরি খুঁজে দিল মডেল হবার। সেদিন অবধি মডেলের কাজই করছি। এটা কোন কসুর নয়। আমার জীবিকা কেন যে পুলিশের চোখে খারাপ মনে হল তা বুঝতে পারছি না।

পুলিশ রিপোর্ট অন্য রকম।—বলল পুলিশ প্রসিকিউটার।

তারা কাউর বলল, যা সত্য তা বললাম। এবার পুলিশ তার রিপোর্ট প্রমাণ করুক।

পুলিশ তার সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করল।

কিন্তু প্রমাণ করতে পারল না তার অপরাধ।

আদালত থেকে খালাস পেয়ে তারা আবার সোজা ফিরে গেল তার কর্মক্ষেত্রে। গিয়ে দেখে দরজা বন্ধ। পুলিশ আগেই তালা বন্ধ করে দিয়েছে সেখানে। সামাজিক নীতি শিক্ষার অভিভাবক পুলিশ দুর্নীতি সহ্য করতে পারে না!

টাঙ্গা ভাড়া করে ফিরে দেহাতেই আসতে বাধ্য হল তারা।

জ্ঞান সিং তাকে দেখে আশ্চর্য হল।

কি ভাবছ বাবা?—প্রশ্ন করল তারা।

তুই এত ছোট হতে পারলি কি করে?

তোমাকে বাঁচাতে! বাবার কাছে সন্তানের অনেক ঋণ। সেই সেই ঋণ শোধ করতে। এই নাও টাকা, শহরের কোথাও জায়গা খুঁজে নিয়ে কোন ব্যবসার চেষ্টা কর।

জ্ঞান সিংহের মাথা ঘুরছিল তারার কথা শুনে। চুপ করে রইল সে।

তোমার ব্যবসার উন্নতি হবে। সংসারে কোন দুঃখ থাকবে না।

আর তুই!

কত রহিস আদমি আসবে আমার পা চাটতে!

রামপিয়ারী বাইরে এসে বলল, হায়! এমন দুর্ভাগ্য যেন কারও না ঘটে।

কি যে বলিস দিদি। একি আমাদের সেই পুরানো দেহাত। এখানে কেউ কি কারও সন্ধান রাখে? যাদের রুপো আছে তারা রূপ খুঁজে বেড়ায়। সুযোগ বুঝে ঝুলে পড়তে পারলেই যথেষ্ট। তোরও কষ্ট থাকবে না। দেখবি, তোরও ভাগ্য খুলে যাবে। রূপের বাজারে আমাদের দাম অনেক। নেহাত পোষাকের অভাব ছিল তাই রহিস লোক নজর দেয় নি এতকাল। এবার সাজগোজ কর। সালোয়ার ছেড়ে শাড়ি ওঠা দেহে। তারপর দেখবি।

জ্ঞান সিং মনে মনে শঙ্কিত হল।

সমাজ ব্যবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তা ভেবে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছিল। কিন্তু সাবালিকা মেয়েকে যেমন বলবারও কিছু ছিল না তেমন বলবার সাহসও ছিল না। আর অর্ধশিক্ষিত জ্ঞান সিং আধুনিকতাকে জানতও না।

তবুও তারার প্রস্তাব মত দোকান ফেঁদে বসল, রাজধানীর উপকণ্ঠে বেশ জমজমাট একটা কারখানা অঞ্চলে। দেখতে দেখতে জমে উঠল দোকান। মালপত্র সংগ্রহ কম হল না।

তারা নিজে বসত দোকানে।

মাল ফুরোলে জ্ঞান সিং মাল কিনতে যেত শহরে। বাবা না থাকলেও খদ্দেরকে জমিয়ে রাখত তারা। বেচাকেনা ভালই হয়। খদ্দেরদের নজর পড়ল তারার ওপর। সওদার চেয়ে সওদাউলী তাদের চোখে বেশি মূল্যবান।

বিষণ দয়াল সরকারী দপ্তরের মাঝারি গোছের কর্মচারী। মাস কাবারে পাঁচশ টাকার মত আয়। তারই সঙ্গে জমিয়ে নিল তারা। বিষণ আসত বিলাস দ্রব্য কিনতে, তখনই পরিচয়।

তারপর একদিন তারা গিয়ে উঠল বিষণ দয়ালের ঘরে, পুরোপুরি গিন্নী সেজে।

গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল রামপিয়ারী। তারার জিত আর তার হার।

তারা গুছিয়ে নিয়েছে তার ভবিষ্যৎ। জানতেও পারে নি কেউ যে এই তারা অসদাচরণের দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিল। আদালতের খাতায় লেখা থাকলেও মনের খাতায় সে আঁচড়ের চিহ্ন নেই।

বছর না ঘুরতে তারা এসে বলল, বিষণ দয়াল শীগ্‌গীরই বিদেশে যাবে।

কেন?

চাকরির বদলী। বিশেষ কাজের ভার পেয়েছে বিষণ দয়াল।

এত তাড়াতাড়ি!

আমাদের এই পাতন রাজ্যে যার ঘরে সুন্দরী বউ থাকে তার উন্নতি হয় তাড়াতাড়ি। বিষণ দয়ালের বউ তারা কাউর কারও চেয়ে রূপে খাটো নয়।

হাসতে হাসতে বক্তব্য শেষ করে রামপিয়ারীর কানে কানে তারা বলল, বিয়ে করবি দিদি। বিষণ দয়ালের এক বন্ধু আছে।

দুঃখ ঘুচবে তো?

সে তোর বরাত। ছেলেটা ভাল। আমারই মনে হচ্ছিল বিষণকে ছেড়ে ওর গলায় মালা দিই। নেহাত আটকে গেছি। তবে বিষণ দয়ালের মত অনুগত স্বামী সব সময় জোটে না।

ভেবে বলব, রামপিয়ারী পাশ কাটালো।

সুখিয়ার মামার সঙ্গে এর মধ্যেই ভাব জমিয়েছে রামপিয়ারী। সুখিয়ার মামা অরজনলাল চাষী লোক। কয়েক একর জমি নিয়ে চাষ করে খায়। রামপিয়ারী চাষীর জীবনকে আপন করে নিতে চায়। তাই তারার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারছিল না মনে মনে।

বিদেশে যাবার পর তারা চিঠি লিখত মাঝে মাঝে। চিঠি পড়ত রামপিয়ারী।

তারা লিখেছিল, এখানে আমার কোন কাজ নেই। কাজ হল বিদেশী সরকারের উঁচু মহলের কর্মচারীদের সঙ্গে খানা খাওয়া আর নাচা। উদ্দেশ্য ওদের দেশের খবর সংগ্রহ করে আমাদের দেশে পাঠানো। বিশেষ যে অসুবিধা হচ্ছে তা নয়, তবে খবর বলতে যা সংগ্রহ হয় তা মূল্যবান কিছু নয়। তবুও একাজ মোটেই খারাপ লাগছে না। তোর জন্য বড়ই চিন্তা হয়। শ্যামমোহিনীর কথাও ভাবি। যদি নিজের ভাগ্য গড়তে চাস তা হলে আমার প্রস্তাব ভেবে কাজ করবি।

সুখিয়ার মামা অরজনলালকে বিয়ে করেছে রামপিয়ারী। বিয়ের

আগে পত্র দিল তারাকে। তোর প্রস্তাব ভেবে দেখেছি। কিন্তু তা গ্রহণ করতে পারলাম না। আমরা চাষীর মেয়ে। চাষাকে আমার বেশি পছন্দ। তাই সুখিয়ার মামা অরজনকে বিয়ে করছি। আশা করি তাতে আমার কোন অসুবিধে হবে না। শ্যামমোহিনীর কথা এখন বলতে পারছি না। সেও তার রুচিমত কাজ নিশ্চয়ই করবে।

রাজধানীর পথে রামপিয়ারী গিয়েছিল অরজনের হাত ধরে। হঠাৎ রাস্তার আলো গেল নিভে। একটা গলির মুখে বোকার মত দাঁড়িয়ে ছিল দুজনেই। পাশের লোক ফিস্ ফিস্ করে বলল, লড়াই!

লড়াই! চমকে উঠল দুজনেই।

জিজ্ঞেস করল, কোথায় লড়াই?

উৎপাতনীরা আক্রমণ করেছে অবন্তিকা।

কেমন গোলমাল হয়ে গেল দুজনেরই।

আরেক জন বলল, লড়াই না ছাই। এদেশে খাদ্যের অভাব। মানুষ খাবারের জন্য চিৎকার করছে। তাদের খাবার দিতে পারছে না সরকার। আবার ও দেশেও অশান্তি। সেখানেও লোক মার-মুখী। এরা যুক্তি করে লড়াই করছে জনমতকে বিপথে নিতে। দেশের দুর্দিনে মানুষ খাবারের কথা ভুলে যাবে, ক্ষুধায় আর কাঁদবে না।

রামপিয়ারী অথবা অরজনলাল মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সবাই চিৎকার করছে শুয়ে পড় শুয়ে পড়। শত্রু বিমান আক্রমণ করতে আসছে।

রামপিয়ারী শক্ত করে অরজনলালের হাত চেপে ধরল।

ভয় পেয়েছো পিয়ারী?

পিয়ারী মৃদু হাসল। হাসির শব্দ শোনা গেল না, শোনা গেল

তার কণ্ঠস্বর। বলল, ছোট বেলায় আমার গাঁয়ে হামলা করেছিল রাক্ষসরা। ষাট সত্তর জনকে কোতল করেছিল আমার সামনেই। তাও দেখেছি নিজের চোখে। সেদিন ভয় পাইনি, কেমন শক্ত হয়ে গিয়েছিল মনটা। আজ কিন্তু ভয় পাই।

কেন ?

সেদিন আমিই ছিলাম আমাতে। সেদিন তুমি ছিলে না। আর !

আর কি ?

তোমার সন্তান রয়েছে আমার গর্ভে। সবাইকে হারাবার ব্যথা যে কত তা জানি, তাই ভয়।

অরজনলাল সেই আঁধারে মুখ ঘুরিয়ে রামপিয়ারীর ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে দিল।

কি যে কর।—ধমকে উঠল রামপিয়ারী।

কেউ দেখতে পাবে না। সবাই নিজের নিজের প্রাণ রক্ষায় ব্যস্ত। কেউ তাকিয়েও দেখবে না। আর সত্যিই যদি আজ মরতে হয় তার আগে আমার ভালবাসাটা জানিয়ে যেতে হবে। তাই জানিয়ে রাখলাম।

কথা শেষ হবার আগেই সাইরেনের শব্দ শোনা গেল।

আবার আলো জ্বলল সারা শহরে।

তাড়াতাড়ি ঘরে চল। একটা টাঙ্গা ডাকো, বলল রামপিয়ারী।

অরজনলাল টাঙ্গা ডেকে উঠে বসল।

রাস্তায় আসতে আসতে শুনতে পেল মহামাত্যের বাণী। বেতার ভাষণ দিচ্ছে মহামাত্য। টাঙ্গা থামিয়ে নেমে পড়ল দুজনে। দাঁড়িয়ে গেল পানের দোকানের সামনে, রেডিও বাজছে সেখানে।

দুষমণ আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে। আমরা মোকাবিলা করছি বীরের মত। আমাদের দেশরক্ষী বাহিনী দুষমণকে সীমান্ত থেকে হটিয়ে দিচ্ছে। যুদ্ধ ঘোষণা না করেই ওরা যুদ্ধ আরম্ভ করেছে বিনা প্ররোচনায়। আমাদের সম্মুখে ভয়ঙ্কর বিপদ। এই বিপদে

সমগ্র জাতীর ঐক্য ও সংহতি প্রয়োজন। আমাদের এই পাতন-রাজ্যের প্রত্যেক অধিবাসীকেই এরজন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। সবাই যেন প্রস্তুত থাকেন সেজন্য।

ঘর ঘর শব্দ শোনা গেল রেডিওতে।

অরজনলাল রামপিয়ারীর হাত ধরে এগিয়ে চলল তাদের বস্তীর দিকে।

আরে অরজনলাল যে, কোথায় গিয়েছিলে? জিজ্ঞেস করল তার বাল্যবন্ধু দুলারচাঁদ।

শহরে গিয়েছিলাম।

কেমন অবস্থা দেখলে শহরের?

খুব ভাল নয়। কোথাও উত্তেজনা, কোথাও ভীতি। খুব সুখের কিছু নয়।

তাইতো ভাবছি। দেশটা জাহান্নমে গেল। রক্ষা ব্যবস্থা থেকে ঘরের অবস্থা সবই কেমন গোলমেলে।

অরজনলাল বলল, ওসব এখন ভাববার সময় নেই। মহামাত্য এখনই বেতারে ভাষণ দিলো ঐক্য আর সংহতির, বললো ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকার কথা।

দুলারচাঁদ পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, ঐক্য কথাটা বড়ই আপেক্ষিক।

অরজনলাল বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করল, সে আবার কি?

আরে পয়সাওলা লোকের সঙ্গে ভিখমাঙ্গা লোকের কখনও ঐক্য হতে পারে কি! পয়সাওলা লোক তো চায় লড়াই বাধুক। তা হলে ওদেরই লাভ বেশি, দুপয়সার মাল দুটাকায় বেচবে। আর মরবি তো মর গরীব লোক। তাই ঐক্যের কথা বললে যা বোঝায় তা পাতনরাজ্যে সম্ভব নয়।

আরজনলাল মনে মনে একবার আউড়ে নিল দুলারচাঁদের কথা। উত্তর দিল না।

বস্তীর সামনে এসে বলল, চা রুটি খেয়ে যাও দুলার।

এখুনি খেয়ে দেয়ে এসেছি। খিদে নেই, পেটেও জায়গা নেই। অন্য দিন আসব। সেদিন আর বলতে হবে না।

অরজনলাল কিছু বলবার আগেই রামপিয়ারী বলল, এক গ্লাস জল তো খাবে!

তাতে আপত্তি নেই। চল বউদি, এক গ্লাস জল দাও। তোমার মিঠে হাতের জল না খেলে আমারও ঘুম হবে না আজ রাতে।

ঘরে বসিয়ে রামপিয়ারী এক গ্লাস জল এগিয়ে দিল দুলারচাঁদকে। জল খেয়ে দুলারচাঁদ বলল, আমাদের মহামাত্য সংহতির কথা বললো, তাই না বউদি?

হাঁ ভাই। সংহতি খুব বড় জিনিস। ওটা থাকা উচিত।

আমরাও সেটা আশা করেছি, আর আশাটা পুরো ছিল যখন দেশ স্বাধীন হয়েছিল। কিন্তু আমাদের আগের মহামাত্য সংহতির গোড়ায় ছাই দিয়ে গেছে। অবন্তিকা আর জখম রাজ্য এক নয় কোন দিক থেকেই। উভয়ের যোগসূত্র একমাত্র পাতন রাজ্যের অংশীদার বলে। এই যোগ সূত্র নষ্ট করতে মহামাত্য ব্রজবুলি ভাষাকে সবার উপরে চাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে। কারণ, ব্রজবুলি নাকি হবে জাতীয় ভাষা। এই অদ্ভুত চেষ্টাই সমগ্র সংহতিকে নষ্ট করেছে। এভাবে যদি ব্রজবুলির চাপ সৃষ্টি করা হয় তা হলে অঙ্গ রাজ্যগুলি একে একে বিক্ষোভ দেখাতে সুরু করবে। ডিসগ্রেস পার্টি হয়ত একথা স্বীকার করবে না, কিন্তু তলায় তলায় সর্বত্র ক্ষয় দেখা দেবে। কেউ রোধ করতে পারবে না। সংহতি আপনা থেকে নষ্ট হবে। জনমতকে আইন দিয়ে চাপা যায় না, একথা মহামাত্য আর তার দল কিছুতেই বিশ্বাস করে না।

অরজনলাল বলল, সারা পাতনের একটা সাধারণ ভাষা থাকা উচিত। ব্রজবুলিকে কেন গ্রহণ করব না।

কারণ, আরেকটা যাবনিক ভাষা আগে থেকেই প্রচলিত আছে

সারা পাতনে। তার স্থানে ব্রজবুলি বসানো সহজ নয়, উচিত ও নয়। আমরা যবনরাজার আইন মানি, যবনের প্রাপ্যগণ্ডা বছরে বছরে আনায় কড়ায় মিটিয়ে দিই অথচ তাদের ভাষা আমাদের- শত্রু, এর চেয়ে হাস্যকর বোকামি আর কি আছে বল ?

অরজনলাল মোটামুটি বুঝল। তবুও বলল, সারা দেশে একটি ভাষাই থাকা উচিত।

সবাই তাই চায়, কিন্তু জোর করে কোন কিছু চাপিয়ে দিলে তা কেন নেবে। আর অনুপ্রবেশের যে সুযোগ ছিল তাও জোর-জবরদস্তীর জন্য নষ্ট হতে চলেছে। সংহতি বলে চিৎকার করলে সংহতি হয় না। তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আমাদের অমাত্যরা যে ভাবে গৌরীসেনের টাকা উড়িয়ে বেড়ায় তাতে ত্যাগের চেয়ে ভোগের প্রকাশ বেশি। অপরকে ত্যাগ স্বীকার করতে বলার আগে নিজেকে ত্যাগী হতে হয়। কিন্তু আমাদের অমাত্যরা শুধু বাণী ত্যাগ ভিন্ন আর কোন ত্যাগ করে না, করতে জানে না, করতে চায়ও না। দেশের শতকরা আশীজন লোক পেট ভরে খেতে পায় না, অথচ তাদেরই শেখাতে চায় ত্যাগের ধর্ম, এর চেয়ে পরিহাস আর কি আছে বল।

কিন্তু এখন ওসব নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয় দুলার ভাই, বলল রামপিয়ারী।

দেশ এখন বিপন্ন। আগে দেশ পরে অন্যায়ের বিচার।

স্বীকার করল দুলারচাঁদ।

বেণীধ্বজেই বেশি হাঙ্গামা। পূর্বায়তনও বাদ যায় নি। পুলিশ এখন নাজেহাল হচ্ছে উৎপাতনের সমর্থক পঞ্চমবাহিনী খুঁজে বের করতে। আরসুলার সমর্থকরা এখনও জেলখানায়। এবার উৎপাতনের সমর্থকদেরও ভর্তি করা হল সেইসব জেলখানায়। জেলে আর স্থান নেই। ক্যাম্প জেল তৈরী হল চারধারে।

আইন মজলিসে রোজই প্রশ্ন ওঠে যুদ্ধের গতি কোন পথে।

মানুষ ততদিনে ভুলেই গেছে আগের মহামাত্যের কথা। সে এখন কন্‌টিনেন্টে চিকিৎসকের হেপাজতে। তার কানেও উঠল সংবাদ।

মানসিক বিকৃতি আরও বৃদ্ধি পেল তার। স্থবিরের মত বসে পড়লো। আগে তাও নড়ে চড়ে বেড়াতো, আজকাল তাও বন্ধ করে দিলো।

মুনিয়ার কাছে পৌঁছল সে সংবাদ।

নাজুককে ডেকে মুনিয়া বলল, তুই বাবার কাছে যা, তাঁর সেবা কর গে।

লাভ।

বাবা হয়ত আর কোনদিন জ্ঞান ফিরে পাবেন না। কিন্তু তাঁর দৈহিক অরামের ব্যবস্থা করার প্রশ্ন তো রয়েছে। আজকাল উনি আর নড়াচড়াটুকুও করতে পারেন না। তাঁকে খাওয়ানোর কাজটা এখনো তুই করতে পারবি।

তার জন্য নার্স আছে।

নার্স সব কাজ পারে না, করেও না। তাদের কি দরদ থাকে!

নাজুক ভাবছিল।

ভেবে বলল। মুনিয়া, আমার যে অনেক কাজ। আবার কানাডা থেকে সচদেবের আসার কথা আছে। কালকে বলব।

মুনিয়া মনে মনে অখুশী হল। অন্য সময় হলে নাজুককে কর্মচ্যুত করতে পারত। কিন্তু নাজুক তাদের ঘরের সব কথাই জানে। ব্ল্যাক-মেলিং করতেও তো পারে। তাই চুপ করে থাকতে বাধ্য হল মুনিয়া।

নাজুক তখন খুবই ব্যস্ত।

মার্কিন দূতাবাসে তার ঘন ঘন যাতায়াত সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মহামাত্যের নিজস্ব দপ্তরের এই রূপসী মেয়েটাকে নিয়ে অনেকেই গবেষণা করত। বিরুদ্ধপক্ষের গোয়েন্দাদেরও নজর এড়াতে পারে নি নাজুক।

একদিন আইন মজলিসে প্রশ্ন করল বিরোধীদলের নেতা, উৎপাতনরা প্যাটন ট্যাঙ্ক ব্যবহার করছে, এ খবর কি মহামাত্য ও দেশরক্ষার অমাত্য জানেন ?

উত্তর দিল মহামাত্য, আমরা জানতে পেরেছি।

এই প্যাটন ট্যাঙ্কগুলি মার্কিনরাই ওদের দিয়েছিল আরসুলা রাজ্যের হাত থেকে উৎপাতন রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য—একথা কি ঠিক ?

সরকারী বেঞ্চ থেকে উত্তর এল, ঠিক।

তাহলে এই খবর আইন মজলিসকে জানান হয় নি কেন ?

জন স্বার্থে।

জনস্বার্থেই বোধহয় মহামাত্যের নিজস্ব দপ্তরের কর্মচারী নাজুক সচদেবও অনবরত মার্কিন দূতাবাসে যাতায়াত করে। সরকার কি এ বিষয়ে এই সভাকে অবহিত করবেন ?

নোটিশ চাই।

পূর্ববর্তী মহামাত্যের অতি প্রিয়জন এই নাজুক বাঈ। তার স্বামীকে পাঠান হয়েছে কানাডায় অথচ স্ত্রীকে চাকরি দিয়ে আটক রাখা হয়েছে এদেশে। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। এর ব্যাখ্যা কি আমরা আশা করতে পারি অমাত্য পরিষদের কাছ থেকে ?

এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে সভাকে জানান হবে।

আমরা কি মনে করতে পারি মার্কিন গোয়েন্দাচক্র এদেশে তৎপর এবং তাদের যারা সহায়তা করে, তাদেরই একজন এই নাজুক বাঈ।

নোটিশ চাই।

এ কথা কি সত্য যে আমাদের দেশরক্ষা বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা এই গোয়েন্দা চক্রের সঙ্গে যুক্ত।

কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে অভিযোগ উত্থাপন করতে হবে। তা হলেই তদন্ত হবে।

আমরা যদি বলি অমাত্য পরিষদেরও কেউ কেউ এই গোয়েন্দা চক্রের সঙ্গে জড়িত।

প্রশ্ন শেষ হবার আগেই চিৎকার উঠল, অসত্য অসত্য।

বিরুদ্ধপক্ষও শেম শেম ধ্বনি দিয়ে উঠল।

আর কিছুই শোনা গেল না। চিৎকার টেবিল চাপরানি অবশেষে অধ্যক্ষের অনুরোধে থামল সবাই।

বিরুদ্ধপক্ষ উঠে দাঁড়িয়ে আবার বলল, সরকার যে সকল উৎপাতন সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছেন তাদের শতকরা নব্বইজন কি ডিসগ্রেস পার্টির সদস্য নন?

তদন্ত করতে হবে।

আরসুলা রাজ্যের সঙ্গে যখন সীমান্ত নিয়ে হাঙ্গামা হয় তখন বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তারা আজও ছাড়া পায় নি। সে হাঙ্গামা মিটেছে, বন্দী বিনিময়ও হয়েছে। অশান্তি শেষ হয়েছে অনেক কাল আগে অথচ যারা সন্দেহ বশে গ্রেপ্তার হয়েছিল তারা কেন এখনও জেলখানায় তার জবাব শুনতে চাই স্বরাষ্ট্র বিভাগের অমাত্য অগ্রম পিল্লাইয়ের কাছে।

এসব কেস বিবেচনা করছে অঙ্গরাজ্য। আশা করা যায় তাদের প্রতি সুবিচার করা হবে। তদন্তের ফলাফল এখনও জানা যায় নি।

তদন্ত করতে এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি?—আমরা কি মনে করতে পারি, এই দীর্ঘসূত্রতার কারণ নিজেদের ত্রুটি ও অন্যায়-গুলোকে গোপন করা।

উত্তর আগেই দিয়েছি।

আমরা খুশী হতে পারি নি।

এখন দেশে বিপর্যয় চলছে, এ সময় এই সব ছোটখাট বিষয় নিয়ে আলোচনা করার মত সময় সরকারের হাতে নেই।

অধ্যক্ষ লাল বাতি জ্বেলে বক্তার মুখ বন্ধ করলেন।

অমাত্য পরিষদে নাজুক বাঈয়ের কথা নিয়ে আলোচনা হতেই মহামাত্য আদেশ দিলো নাজুক বাইকে তার স্বামীর কাছে কানাডায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

তার চাকরি।

সেখানেই সে চাকরি করবে।

পরদিনই বদলীর আদেশ পেল নাজুকবাঈ।

আইন মজলিসে তাকে নিয়ে যে ঝড় উঠেছে সে সংবাদ নাজুক জানে। সে আরও জানে তার সহচরদের। এই সহচরদের একাংশই উঁচুতলার মানুষ। তাদের কোন অপকীর্তিই তার অজানা নয়। নাজুক দাঁতে দাঁত ঘষে এর প্রতিকার করবে স্থির করল।

মহামাত্য ডেকে পাঠাল নাজুক বাঈকে। বলল,

তোমাকে কানাডায় পাঠালাম নাজুক।

আমি আনন্দিত। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার প্রশ্নও, আপনার অমাত্য পরিষদের দু'একজন সদস্য, স্থল বিভাগ ও নৌ-বাহিনীর কয়েকজন উঁচুপদের বীরকে কোথায় পাঠাবেন স্থির করেছেন?

তুমি তোমার গণ্ডী ছেড়ে অনেক বেশি এগিয়েছ নাজুক।

যা সত্য তা বলবার অধিকার আমার আছে।

তুমি চাকরি কর। চাকরির সর্ত ভঙ্গ করতে পার না।

আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে সবাইকে ঘরের কথা বলে দেব মহামাত্য।

চৌঘটলাল হাসল।

তোমার মত মেয়েকে শায়েস্তা করার অনেক অস্ত্র আছে আমাদের হাতে। তোমার মুখ বন্ধ রাখতেই হবে। আর যাদের নাম তুমি করতে চাও তাদের তালিকা আমাকে দেবে। আমি তাদের ব্যবস্থাও করব।

মাথা নীচু করে নাজুক বলল, কম্বলের লোম থাকবে তো?

সে দায়িত্ব আমার। তোমাকে ভাবতে হবে না। কাল সকালের

প্লেনে তোমাকে তুলে দেওয়া হবে। সোজা চলে যাবে কানাডায় তোমার স্বামীর কাছে। দূতাবাসের কাজে যোগ দেবে, তোমার স্পেশ্যাল ডিউটির চার্ট পাবে দূতাবাসে। বুঝলে।

নাজুক কোন উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে আসল মহামাত্যের কামরা থেকে।

সারা রাত ভেবে নাজুক ঠিক করতে পারল না সে কি করবে। জিনিসপত্র গোছান হয় নি তখনও। যেতে যদি হয় তারজন্য প্রস্তুতি দরকার। যদি চাকরি ছেড়ে দেয় তা হলে তাকে কয়েদ করবে সরকার। তাকে বাঁচাতে কি এগিয়ে আসবে না মার্কিন দূতাবাস! অনেক ভেবে ফোন করল মার্কিন দূতাবাসে।

হ্যালো। হ্যাঁ আমি নাজুক সচদেব। আমাকে বদলী করেছে কানাডায়। আমি যেতে চাই না। চাকরি ছেড়ে দিলে ওরা আমাকে নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনারা কি আমাকে জেলখানার বাইরে রাখতে পারবেন না? ডিপ্লোমাটিক ব্যাপার। কি বললেন, আমাকে টাকা দিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করেছেন, আমাকে রক্ষার দায়িত্ব নিতে পারবেন না। আচ্ছা আচ্ছা।

ক্রোধে ও ক্ষোভে নাজুক ফোন ছেড়ে দিল।

ট্যাক্সি ডেকে ছুটে গেল মহামাত্যের সঙ্গে দেখা করতে।

তুমি যাওনি?

একটা দিন সময় দিন মহামাত্য। আমার জিনিসপত্র গোছান হয় নি।

এক ঘণ্টাও সময় দেব না তোমাকে। তুমি যত তাড়াতাড়ি পার পাতনরাজ্য ছেড়ে চলে যাও। নইলে তোমাকে গ্রেপ্তার করে রাখা হবে। পুলিশকে আদেশ দিয়েছি আজ বেলা পাঁচটার পর তোমাকে পাতনের জমিতে দেখলেই যেন গ্রেপ্তার করে। তোমাকে যে এই সুবিধাটুকু দিলাম, তার কারণ তুমি ছিলে পূর্ববর্তী মহামাত্যের বিশেষ প্রিয়পাত্রী।

নাজুক ফিরে গেল নিজের ফ্ল্যাটে।

বেলা তিনটেয় ছাড়বে বিদেশী বিমান। তাড়াতাড়ি সাজিয়ে গুজিয়ে নিল নিজের অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

বিমান বন্দরে তার জন্য অপেক্ষা করছিল পুলিশ। তার হাতে বিমানের টিকিট দিয়ে বসিয়ে দিল বিমানে। বিমান ছাড়া অবধি পুলিশ পাহারা রইল। তারপর বিমান উড়ল আকাশে। নাজুকের চোখে তখন আগুনের হল্‌কা, অথচ আজ সে নিরুপায়।

পাতন থেকে বিদায় নিল নাজুক।

সমস্যার কিন্তু সমাধান হল না কোন ক্রমেই।

বিরাধীরা এই নাটকীয় পলায়ন নিয়ে ব্যঙ্গ করল সরকার পক্ষকে। সরকারপক্ষ 'নোটিশ চাই', 'তদন্ত হচ্ছে' কৈফিয়ত দিয়ে আত্মরক্ষা করল।

যুদ্ধের গতি বড় দ্রুত।

বেণীধ্বজ অঙ্গরাজ্যের বড় বড় শহরগুলো ধ্বংস হবার উপক্রম। মৃত্যুসংখ্যা অভাবনীয়। অস্ত্র ধ্বংসের হিসাব করা ভার। মার্কিন অস্ত্রে বলীয়ান উৎপাতনের হিসাবও ঠিক নয়। অস্ত্রের চেয়ে পাতনীয় যোদ্ধাদের মনোবল ও সাহস তাদের বেশি বিব্রত করেছে। উৎপাতনের রাজধানীর দিকে এগিয়ে চলেছে পাতনের সৈন্যবাহিনী।

আইন মজলিসে যুদ্ধের প্রাত্যহিক রিপোর্ট দেয় মহামাত্য।

বিরুদ্ধপক্ষ বলল, আমাদের সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু আরসুলা রাজ্যের সঙ্গে সেই যে সীমান্ত দ্বন্দ্ব, তাতে কেন এই বীরবাহিনী পশ্চাদ্‌পদ হয়েছিল?

পাশে উপবিষ্ট কোন নিরপেক্ষ সদস্য টিপ্পনী দিয়ে বলল, সৈন্যরা সাহসী ও বীর ঠিকই, কিন্তু সেনাপতি ও অন্যান্য পরিচালকরা কাপুরুষ এবং নীতিহীন।

ক্রুদ্ধ হল সরকারপক্ষ। 'অসত্য', 'অসত্য' বলে চিৎকার করল।

বিরোধীপক্ষ বলল, একথা কি সত্য, আরসুলাদের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়েছিল সে যুদ্ধে অফিসাররা সৈন্যবাহিনীকে সামনে এগিয়ে দিয়ে নিজেরা পালিয়ে এসেছিল ?

এমন সংবাদ আমাদের জানা নেই।

আবার প্রশ্ন হল, একথা কি সত্য, সেপাইরা বলেছিল যারা সব রকম সুবিধে পায়, বেশি মাইনে পায়, তারা যদি যুদ্ধে এগিয়ে না যায় তাহলে স্বল্প বেতনের সেপাইরা কেন প্রাণ দিতে যাবে !

এমন সংবাদ সরকার জানেন না।

বর্তমান যুদ্ধের গতি দেখে আমাদের বিশ্বাস জন্মেছে যে আজকের মত সেদিনও যদি অফিসাররা সেপাইদের নিয়ে এগিয়ে যেত রণক্ষেত্রে এবং প্রাণের মায়া করে পালিয়ে না আসত, তাহলে আরসুলাদের পরাজিত করতে পারত আমাদের রক্ষীবাহিনী। এ বিষয়ে তদন্ত হওয়া উচিত।

কমিশন তদন্ত করছে।

আমাদের বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ, যোগাযোগ পথের অভাব। দশ বছর আগে যে সব পথ ও সেতু তৈরীর জন্য টেন্ডার দেওয়া হয়েছিল সে সব পথ ও সেতু আরসুলা যুদ্ধের দু বছর পরেও তৈরী হয় নি। কেন হয় নি তাকি সরকার জানাবেন ?

সবগুলোই প্রায় তৈরী হয়েছে ও হচ্ছে।

আমরা বিলম্বের কারণ জানতে চাই। আমরা শুনেছি নদীর ঘাট যাদের ইজারা দেওয়া, তারা বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করে নদী পারাপার করে। তারাই সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের মোটা হাতে দক্ষিণা দিয়ে মাল পত্রের অভাব এই অজুহাতে ওইসব পথ ও সেতু তৈরী করতে বিলম্ব ঘটিয়েছে। ঠিকাদারকে সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দশ বছর পর্যন্ত।

এটা অঙ্গরাজ্যের বিষয়। সেখানে খোঁজ নেওয়া হবে।

আরও সংবাদ পাওয়া গেছে, বিমান বাহিনীর প্রয়োজন মত তেলও

সঞ্চিত ছিল না বিমান ঘাঁটিতে, সেজন্যই বিমান চলাচলে ব্যাঘাত ঘটেছে। ফলে আমাদের সরবরাহও বাধা প্রাপ্ত হয়েছে।

এমন সংবাদ আমরা পাই নি।

আশা করি বর্তমান বিপদের সময় যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা ঠিক রাখবেন বর্তমান সরকার।

প্রশ্নোত্তরের সময় অতিবাহিত হতেই অধ্যক্ষ লাল বাতি জ্বাললেন।

ডিসগ্রেস পার্টির সদস্যরা জানতে চাইল বর্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতি।

মহামাত্য বললো, আমাদের সৈন্যবাহিনী শত্রু এলাকার বিশ মাইল ভেতরে ঢুকেছে। শত্রুর শতাধিক ট্যাঙ্ক আমরা ঘায়েল করেছি অথবা দখল করেছি। ওদের দ্রুতগামী বিমানবহরকেও অকেজো করে দিয়েছি। এখন শত্রু সৈন্য পেছন হঠছে।

আরেকজন প্রশ্ন করল, আমাদের এলাকায় শত্রু প্রবেশ করতে পেরেছে কি?

মাত্র দুটো স্থানে সাত মাইল ভেতরে এসেছে শত্রুরা। তাদের সাঁড়াশী আক্রমণ করে ঘিরে ফেলা হয়েছে।

কি পরিমাণ ব্যয় হচ্ছে এই যুদ্ধে?

হিসাব ঠিক পাওয়া যায় নি। অনুমানিক ত্রিশ কোটি রুপেয়া খরচ হচ্ছে প্রত্যহ।

এভাবে খরচ চালাতে হলে এই যুদ্ধ চার মাসের বেশি চালাবার সামর্থ কি আছে আমাদের সরকারের?

দেশ রক্ষার জন্য নতুন বাজেট করতে হবে। পরিকল্পনার ব্যয় হ্রাস করতে হবে। সম্ভবত অতদূর আমাদের এগোতে হবে না। তার আগেই শত্রুর পতন ঘটবে।

এই যুদ্ধ থেকে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা আছে কি?

না। তবে আরসুলারাজ্য উৎপাতনরাজ্যকে সাহায্য করছে। তাদের সাহায্য বেশি হলে হয়ত অসুবিধা হবে।

আমাদের কোন বন্ধু কি সাহায্য করছে?

এখনও করেনি। আশা আছে ভালুকরাজ্য সাহায্য করবে।

আপনারা এতকাল যে মার্কিন বন্ধুত্বের কথা বলেছেন, সে বন্ধুরা এই বিপদের সময় কোথায় গেলেন? আমরা তো দেখছি উৎপাতন রাজ্য মার্কিন অস্ত্র দিয়েই আমাদের আক্রমণ করছে। তার জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

আমাদের রাষ্ট্রদূতকে যথাযথ উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

মহামাত্য তার বক্তব্য শেষ করলো।

চারিদিকেই সাজ সাজ রব।

একাক্ষিবাবু দলবল নিয়ে বেরিয়েছে চাঁদা তুলতে। দেশে খরা, বন্যা, যুদ্ধ, যাই হোক না কেন, একাক্ষিবাবুই প্রতিবার সবার আগে বের হয় চাঁদার খাতা নিয়ে। তার ক্ষমতা অসীম। চাঁদাও আসে অঢেল। অর্থাগমের খবর কিছুটা জানা গেলেও নির্গমনটা জানতে পারে না দাতারা। তারা জানে হিসাব চাইলে তাদের স্বার্থ হানি। একাক্ষিবাবু একাই কায়েমী স্বার্থ রক্ষার প্রহরী। তাকে চটাবার সাহস নেই কারও। বেশি টেনডাইমেনডাই করলে কোতল হবার ভয়ও আছে। পাড়ায় পাড়ায় এত উৎসব আয়োজন যা হয় সারা বছর ধরে, তার রসদ জোগায় একাক্ষিবাবুর চেলারা। সেখানেও চাঁদা।

চাঁদার অঙ্ক বাড়তে থাকে।

মেয়েরা অলঙ্কার দিয়ে বিদেশী মুদ্রার ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করে। কিছু রাজকোষেও জমা হয়। মেয়েরা জানতে চায় না মদের বাজেট। বিদেশী মদ আনতে কত বিদেশী মুদ্রার অপচয় ঘটেছে তা কেউ বলবার অবসর পায় না। চাঁদা আর সোনা দুটোই আসে অঢেল।

ঘরে ঘরে সোপাইদের পোষাক তৈরীতে নেমে পড়ল মেয়েরা। খাবারের প্যাকেট ভর্তি করে তুলে দিতে লাগল সরকারের হাতে।

সকাল বেলায় আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে সংবাদ পত্রের জন্য। বেতারে সংবাদ শোনার জন্য পিঠে রেডিও ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় অনেকেই।

যুদ্ধ প্রস্তুতির কোথাও কোন ত্রুটি নেই।

সংবাদ পত্রও ফলাও করে যুদ্ধের খবর দিচ্ছে। মহামাত্যের ভাষণ ও বাণী ছাপা হচ্ছে প্রথম পৃষ্ঠায়। অস্ত্রের কারখানায়, কল কারখানায় ডবল ডিউটি। সবাই সামর্থমত সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে।

এদিকে বাজারে দ্রব্যমূল্য হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে।

এই তো ধান্দায় সময়।

চাঁদার খাতায় কিছু দিয়েই একশ' গুণ বৃদ্ধি করছে দ্রব্যমূল্য। জনতার সময় নেই দ্রব্যমূল্যর কমতি-বৃদ্ধি চিন্তা করার। সেই সুযোগে লোপাট করছে, লুট করছে দেশপ্রেমী ব্যবসায়ীরা। সবার চোখ ঐ সীমান্তের যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। সবাই চায় দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা পাক।

যারা উৎপাতন রাজ্য থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল পাতন রাজ্যে, তারা আশা করেছিল রাজ্য দুটি আবার সংযুক্ত হবে, আবার তারা ফিরে যেতে পারবে তাদের দেশে। আবার ফিবে পাবে সুখের ঘর।

যারা পাতনের স্থায়ী বাসিন্দা তারাও চিন্তিত। ভালমন্দ হলে তাদেরই ক্ষতি।

মানবদল প্রচার করছে রাক্ষসদের বিরুদ্ধে। তারা চিৎকার করছে এইসব রাক্ষসরাই পাতনের সর্বনাশ করবে, এদের বিতাড়িত করা হোক এই সুযোগে।

অঙ্গ রাজ্যগুলো যত ব্যস্ত ও উত্তপ্ত, তত ব্যস্ত ও উত্তপ্ত রাজধানী নয়। শুধু নিষ্প্রদীপের মহড়া চলছে সেখানে। বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অমাত্যরা আইন মজলিসে ভাষণ দিচ্ছে, মাঝে মাঝে সীমান্তে ছুটে যাচ্ছে সরজমিনে যুদ্ধের অবস্থা দেখতে।

তারপর একদিন হঠাৎ থেমে গেল যুদ্ধ।

বিশ্বের তাবৎ রাষ্ট্র ব্যস্ত-বিপন্ন। তারা শেষ চায় এই আপোষের

ঝগড়ার। তাদের চেষ্টায় যুদ্ধ বিরতি ঘটল। দুপক্ষই অধিকৃত এলাকা থেকে ফিরে গেল নিজ নিজ এলাকায়।

ক্ষয়ক্ষতির তখনও হিসেব শেষ হয় নি।

হিসেবের খাতা খুলতেই দেখা গেল কয়েক সহস্র সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তি প্রাণ দিয়েছে ক' দিনের যুদ্ধে।

দেশের লোক আপশোষ করল। যদি নরহত্যা আর সম্পদ নষ্টই যুদ্ধের উদ্দেশ্য হয়, তা হলে ঠিকই হয়েছে। আর যদি শত্রুকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া উদ্দেশ্য হয়, তা হলে তা ব্যর্থ হয়েছে। শত্রু আরও শক্তি সংগ্রহের সুযোগ পাবে। শত্রু আর সাপ—শেষ রাখতে নেই। তা হলেই বিপদ, অলক্ষ্যে আবার আসবে সর্বনাশ।

ঋষিবাক্য ওরা শুনতে চায় না।

যুদ্ধমান পক্ষ যে যার মত নিজের নিজের অঞ্চলে চলে গেল। বন্দী বদল হল। যুদ্ধ থামল। স্বদেশে যাদের সন্দেহ ভাজন মনে হয়েছিল তাদের আটক রাখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। শুধু ছাড়া পেল না সেই আরসুলা যুদ্ধের সময় যাদের বন্দী করা হয়েছিল তারা। তাদের অপরাধ, তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ।

ঘরে শান্তি না এনে দেশে বিদেশে শান্তির দূতিয়ালী যারা করে ছিল এতকাল, তারাই দেখতে পেল ধীরে ধীরে বন্ধুহীন হয়েছে দেশ। প্রতিবেশী উৎপাতন রাজ্য আর আরসুলা রাজ্য এখন আর তাদের বন্ধু নয়। বিপদের দিনে মার্কিন ও যবনরাও কোন সাহায্য করেনি বরং তিক্ত উপদেশামৃত দান করেছে। শান্তির দূতিয়ালী করতে সহাবস্থানের মন্ত্র শোনাতে যারা এতদিন ঘরের কড়ি দিয়ে পরকে তোষণ করছে তারা এখন শেষ অবধি দেখতে পেল যে তারা বন্ধুহীন। ভাগ্যের পরিহাস। নিজের ঘরে আগুণ দিয়ে যারা পরের দেহের তাপ বৃদ্ধি করতে চায় তাদের এমনিই হয়।

কায়েমী স্বার্থের পোষক সরকারী ব্যবস্থাকে সর্বতোভাবে সমর্থন জানাতে পারল না দেশের লোক। তারা আহার্যের অভাবে

হাহাকার করছে, আহার্য আছে অথচ ক্রয় ক্ষমতা নেই। দেশের সম্পদ কুক্ষিগত রয়েছে মুষ্ঠিমেয় লোকের হাতে। তাই সমস্যার সমাধানও হতে চায় না।

অমাত্যদের ঘরে ঘরে শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। সচিবদের জন্যও শীততাপ নিয়ন্ত্রণ। আর সাধারণ মানুষ খরায় দগ্ধ হয়ে পিপাসায় প্রাণ দিচ্ছে, হিমের ধাক্কায় বস্ত্রহীন মানুষের দেহ জমে শক্ত হয়ে যাচ্ছে পথে ঘাটে।

অমাত্যের দল লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে দেশবিদেশ পরিভ্রমণে, আর নিম্ন বেতনের কর্মীরা বেতন বৃদ্ধি চাইলেই পুলিশ তেড়ে আসে লাঠি নিয়ে। লাঠির আঘাতে প্রাণ দেয় অনেকে।

সাধারণ মানুষ পায় না স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় আর বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকার আসব আসে উঁচুতলার মানুষদের গলা ভেজাতে।

মজুতদারের ঘর ভর্তি খাবার অথচ খাবারের অভাবে ভিখারীরা লাইন দিয়েছে শহরে গ্রামে।

প্রচার ব্যবস্থা প্রখর। তাই বাইরের মানুষ জানতেও পারে না যে দেশের এই দুর্দশা।

মানুষ ক্রমেই ক্ষিপ্ত হতে থাকে।

একদিন সরকারী কর্মচারীরা বলল, আমাদের অভাব অভিযোগ না মিটলে কাজ করব না।

সবার আগে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হল।

রেলের চাকা ঘুরল না।

লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে সরকার প্রচার করল, রেলের কর্মচারীরা স্বর্গ সুখে বাস করছে। তাদের দাবী অনায্য। যে দেশে মাথা পিছু আয় বিশ রুপেয়া সে দেশে রেলের সব চেয়ে কম বেতনের অস্থায়ী কর্মচারীরাও পায় ষাট রুপেয়া। এর চেয়ে বেশি আর কি তারা আশা করতে পারে।

রেলের শ্রমিক ভজুয়া কাগজ পড়ে বলল, পানিগ্রাহী আমাদের

মন্ত্রী। পানিগ্রাহীর বাবা চোরকাটা শহরে পানের দোকান করত। সেকালে তার উপার্জন ছিল মাসে বড় জোড় দশটাকা। সেই পানিগ্রাহীর বেতন আর ভাতার জন্য আজ মাসে পাঁচ হাজার টাকা কেন ব্যয় হয়!

ওরা যে দেশ সেবী।

না, দেশের সেবা ওরা কোনদিন করেনি। আমি জানি পানিগ্রাহীকে। নারীহরণ মামলায় ওকে একবার হাজতে থাকতে হয়েছিল কয়েকমাস। অবশ্য দণ্ডিত হয়নি। এই কি ওর দেশসেবা! এই দেশ সেবার জন্যই কি পাঁচ হাজার টাকা মাসিক পুরস্কার! একেই বলে ভাগ্য।

তিরতিরিয়ালাল ঝুনঝুনওলাও রেলের কর্মী। সেও বলল, যবন আমলে হোসেন আলি ছিল যবনের গুপ্তচর। যারা স্বদেশী করত তাদের ধরিয়ে দেওয়া ছিল ওর একমাত্র কাজ। ঘটপটপুরের ডাকলুটের মমলায় হোসেন আলি মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছিল। তাকে কেন অমাত্য করা হল?

শ্যামসুন্দর হেসে বলল, পদ্মাবতীকে আমি চিনি ছোট বেলা থেকেই। যবন রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে ওর যোগাযোগটাও সবাই জানে। যবনরাই ওকে আইন সভায় মনোনয়ন দিয়েছিল। যবনরা চলে যেতেই পূর্বের মহামাত্য ওকে কেন বা পেয়ার করত। তাই তো পদ্মাবতী আজ অমাত্য। যবন আমলে ডিসগ্রেস পার্টি যতবার সরকারী ব্যবস্থায় আপত্তি জানিয়েছে ততবারই পদ্মবতী সরকারকে সমর্থন জানিয়েছে। তাকে নিয়ে নাচানাচি চলছে এখনও। আর আমাদের দু দশটাকার দাবী হাজির করলেই অমাত্যেরা আঁতকে ওঠে। আমরা কাজ করব না।

সত্যিই একদিন গাড়ির চাকা বন্ধ হল।

কিন্তু প্রচার ব্যবস্থায় নামল সরকারী বেতার আর সরকারের অতি বশম্বদ সংবাদপত্র।

প্রচার ব্যবস্থায় অভিনবত্ব ছিল।

পূর্বায়তনে প্রচার করা হল, বেণীধ্বজের রেলকর্মীরা কাজে যোগ দিয়েছে।

বেণীধ্বজে প্রচার করা হল নর্মচরের রেলকর্মীরা যোগ দিয়েছে কাজে।

মিথ্যে প্রচারে বিভ্রান্ত হতে থাকে রেলকর্মীরা। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, সরকারী এই সংবাদটুকুই মাত্র সম্বল। ধীরে ধীরে মনোবল ভেঙ্গে গেল কর্মীদের। ধর্মঘট বানচাল হল।

সরকারী অমাত্যরা হাসল। কেমন জব্দ!

রাতারাতি নতুন কয়েকটা শ্রমিক ইউনিয়ন তৈরী করে ভাঙ্গন ধরালো কর্মীদের মাঝে।

সরকারী নীতির জয়জয়াকার।

গিরিধারীলালের জন্য পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করা হল বিনা মূল্যে।

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সমগ্র পাতন রাজ্যের তাবৎ রেলকর্মীর সমবেশে মিঠা মিঠা বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে থাকে শ্রমিক নেতা গিরিধারীলাল। তার সহচর রামভরস খাণ্ডেলওয়ালও কম নয়। গিরিধারী বক্তৃতা দেয় আর রামভরস প্রতিপক্ষ সৃষ্টি করে।

আবার চলল রেলের চাকা।

কর্মীদের পরাজয়।

চাকরি গেল অনেকের। সাময়িক বরখাস্তও হল অনেকে। পরাজয়ের গ্লানি মাথায় পেতে নিল কর্মীসঙ্ঘ। যারা নেতা তাদের আটক করেছিল জেলখানায়। তারা মুক্তি পেয়ে বাইরে এসে আবেদন নিবেদনের পথ খুঁজে নিল। দাবী মানাতে নয়, যারা ধর্মঘটের দরুণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের সাহায্য করতে।

অমাত্যরা হাসল।

ধর্মঘটিরা হতাশ হয়ে চেয়ে দেখল তাদের কোন দাবীই সরকার স্বীকার করেনি। যারা সেদিন ধর্মঘটে যোগ দেয় নি তাদের নগদ

পুরস্কার দিল সরকার, তাদের যোগ্যতা বিচার না করেই প্রমোশন দিল উঁচুপদে।

দেশের লোক অবাক হয়ে দেখল।

প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে এল না কেউ। কেন?—কারণ, কোন সংগঠন নেই। আর নেই নেতৃত্ব দেবার লোক।

মানকুমারীর অনেক কটি সন্তান।

স্বামী দর্জি।

শহর থেকে অনেক দূরে ছোট একটি দর্জির দোকানে কাজ করে যা উপায় করে, তাতে সংসার চলে না। কোন রকমে একবেলা পেটের ভাত হয়।

উৎপাতন থেকে স্বামীর হাত ধরে পালিয়ে এসেছিল এদেশে আশ্রয়ের আশায়। এদেশেই তাঁর পাঁচটি সন্তান জন্ম নিয়েছে। পাঁচটি সন্তানকে পেটভরে খেতে দিতে না পারা মায়ের পক্ষে কত বেদনাদায়ক তা একমাত্র সেই মা জানে, যে এরকম অবস্থায় পড়ে।

সরকারী সাহায্যের আশায় মানকুমারী গিয়েছিল ব্লক অফিসে। সেখানেই সে শুনল, দেশে এই খাদ্যাভাবের একমাত্র কারণ অত্যধিক সন্তানের জন্ম। দেশে বেশি সন্তান জন্মাচ্ছে বলেই খাবারের এত অভাব ঘটেছে। সন্তান জন্ম নিরোধই হল এই খাদ্য ঘাটতি মেটানোর একমাত্র উপায়।

শুনেই মানকুমারী বলল, সে তো পরের কথা। যাদের সন্তান জন্মেছে তাদের কি উপায়!

নিরুপায় হোল উপায়।

তা হলে আমাদের খাবার পাবার কোন উপায় নেই?

পয়সা থাকলে কিনে খাও।

যদি পয়সা দিয়ে খাবার পাওয়া যায় তা হলে কি আমরা একথাই

বুঝব না য়ে দেশে খাবার আছে, নেই পয়সা। যাদের পয়সা আছে তাদের খাবারও আছে, এইতো ?

তা বটে।

তা হলে খাদ্যাভাব নেই ?

বক্তা নিজের জালে নিজে আটকেছে।

মানকুমারী বলল, তা হলে অধিক সন্তান জন্ম খাদ্যাভাবের কারণ নয়। আসল কারণ পয়সার অভাব ?

বক্তা মুখ নীচু করে দাঁড়াল।

খাদ্যের অভাবে কেউ তো মরেনি। খাদ্য না থাকলে নিশ্চয়ই মরত ?

ফিরে এসে মানকুমারী তার স্বামীকে বলল, শুনে এলাম ব্লক অফিস থেকে, খাদ্যের নাকি অভাব নেই কোন। যথেষ্ট চাল গম বাজারে আছে।

তার স্বামী বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলল, আমি তো পাচ্ছি না।

তুমি আমি পাব কেন। আমরা টাকায় চার সের চাল কিনেছি এখন চার টাকায় একসের চাল। আছে টাকা ?

তাইতো। মাথায় হাত দিয়ে দীনতারণ ভাবতে বসল।

তোমার সেলাইয়ের আজুয়া বৃদ্ধি করতে হবে। একটাকায় আর সার্ট সেলাই চলবে না। দাম বাড়িয়ে দাও।

খদ্দের আসবে না।

আসবে, ঠিকই আসবে। টাকার কি আর দাম আছে। সবার পকেটেই ছাপা কাগজ, নেই শুধু আমাদের মত দীন মজুরদের। যারা গায়ে সার্ট পাঞ্জাবী ওঠায় তাদের পকেটে টাকা থাকে গো, টাকা থাকে।

তাতেও সামলাতে পারবে কি ?

তোমার পথ তুমি দেখ, আমিও পথ পেয়েছি। এই যে এক-

জোড়া সোনার মাকড়ি দেখছ এটাই পেট ভরাবে গোটা সংসারের। সোনার দাম তো জান।

দীনতারণের বুদ্ধি লোপ পাবার উপক্রম।

বিকেল বেলায় বড় মেয়ের হাত ধরে মানকুমারী সোনার মাকড়ি জোড়া বিক্রি করে এল তিরিশ টাকায়।

টাকাটা হাতে নিয়ে তিনবার নমস্কার করল। মনে মনে বলল, এই আমার লক্ষ্মী।

সকাল বেলায় মেজ মেয়েকে রান্নার চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে বড় মেয়ে শান্তির হাত ধরে দূর গাঁয়ে চলে গেল মানকুমারী। তারপরের ঘটনা সামান্য। রাতের বেলায় পঁয়ত্রিশটা টাকা নিয়ে ফিরল ঘরে।

দীনতারণ জিজ্ঞেস করল, কোথায় গিয়েছিলে?

পেটের ধান্দা করতে।

বুঝলাম না।

সবুজগাছির ফণাই মাড়োয়ারীর ঘর থেকে দুটাকা সেরের চাল নিয়ে গিয়েছিলাম শহরে। বিক্রি করে পাঁচ টাকা নগদ লাভ আর ওজনে কম দিয়ে আধসের চাল লাভ। এবার আমার সংসার চলবে।

সোমত্ত মেয়েটাকে কেন নিয়ে গেলে?

বউ যায় তাতে আপত্তি নেই। মেয়ে নিয়ে আপত্তি। আচ্ছা পুরুষ মানুষ তুমি। ভাত জোটাতে পার না আবার বড় বড় কথা। থামো তুমি। পনর সের চাল তাড়াতাড়ি বিক্রি করে ফিরতে হলে দু'একজন সাহায্যকারী লোক চাই। ওদিকে পুলিশের উৎপাত, রেলবাবুদের উৎপাত। সবাইকে কিছু কিছু দিয়ে তবে তো বাজারে বিক্রি।

দীনতারণ চোখ উল্টে বলল, এ সব শিখলে কোথায়?

বারে। এই শহরের কমসে কম পঞ্চাশজন মেয়ে বাচ্চা এই করেই খায়। তাদের টাকা কম তাই ব্যবসায় জোর নেই। কাল

পঁয়ত্রিশ টাকারই চাল নিয়ে যাব। যদি আরও কিছু তুমি ধার করে দিতে পারতে তাহলে আরও বেশি নিতে পারতাম। মেজ খুকীটাও যেতে পারত। এক বেলা দুটো ফুটিয়ে নিতে পারবে না।

দীনতারণ শুধু বলল, চেষ্টা করে দেখছি।

মানকুমারী চালের ব্যবসা করে। মাস না ঘুরতেই তার তিরিশ টাকা দুশো টাকা হয়েছে। এবার চাল কিনে ঘরেই রেখেছে সে।

দীনতারণ মাঝে মাঝে আপত্তি জানিয়েছে।

মানকুমারী হেসে বলেছে, তোমার মত ধর্মজ্ঞান থাকলে ছেলে মেয়েরা না খেয়ে মরত। দেখতো এখন ছেলে মেয়েরা কেমন হাসি মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এটা বে-আইনী কাজ।

কোন কাজটা আইন মাফিক চলে সেটা আমাকে দেখিয়ে দাও।

যদি কখনও পুলিশ ধরে?

বলা যায় না, তবে তাদের মোটা হাতে দিতে হয়। গোলমালের আশঙ্কা থাকলে ওরা অগ্রিম জানিয়ে দেয়। স্টেশন মাস্টারাও বলে দেয়।

ব্যবস্থা তা হলে পাকা।

নিশ্চয়। এমন ফলাও ব্যবসা আর কি থাকতে পারে। দেশের মানুষ খেতে পাচ্ছে না, তাদের আমরা খেতে দিচ্ছি। এটাই তো বড় ধর্ম। আমরা কোন অন্যায় কাজ করি না।

নীতি শাস্ত্র দীনতারণের পড়া নেই। সে চুপ করেই থাকল।

মানকুমারী হিসাব করে দেখিয়ে দিল গত চার মাসে তার তিরিশ টাকা থেকে লাভ হয়েছে চারশো টাকার ওপর আর ছেলে মেয়েরাও দু'বেলা ভাত খেতে পেয়েছে পেট ভরে।

তোমার মাকড়ি জোড়া!

তাই ভাবছি। তার চেয়ে শান্তির একটা বিয়ে দাও এই টাকা দিয়ে।

চারশ' টাকায় বিয়ে হয়।

কেন আজকাল তো পণ দিতে হয় না। কিছু টাকা তুমি জোগাড় কর। সব মিলিয়ে ছ-সাত-শ' হলেই বিয়ে দিতে পারব। পাত্রও আমি দেখে রেখেছি।

তা হলে অনেক এগিয়েছ তুমি। পাত্রটি কে ?

আমাদের সর্বেশ্বর মোড়লের ছেলে নিরাপদ। ছেলেটা লেখা-পড়াও শিখেছে। চাকরি না করে ব্যবসা করছে। ভালই হচ্ছে। শান্তিরও পছন্দ, নিরাপদও রাজি।

দীনতারণ জিজ্ঞেস করল, ব্যবসাটা কিসের ?

চালের। আজকের ব্যবসা বলতে তো ঐ একটিই।

অন্য পাত্র দেখ।

কিন্তু শান্তি আর নিরাপদের জানাজানি হয়েছে। দুজনের মিলও খুব। এখন কি বাধা দেওয়া যায়। ঘর করবে ওরা। আমরা কেন ভাবতে যাব বলদিকি ?

ঠিক বলেছ। কিন্তু চিরকাল মিল মহব্বত থাকবে কি !

খুব থাকবে। সংসার করতে গেলে খিটিমিটি হয়ই। কোন সংসারে হয় না বলদিকি। তার জন্য অত ভাবতে হবে না। কথাটা সর্বেশ্বর মোড়লকে একবার বলেই দেখ।

দীনতারণ 'আচ্ছা' বলে উঠে গেল।

নিরাপদর ব্যবসার ক্ষেত্র অনেক দূর এগিয়েছে এতদিনে। এত-দিন চালের ব্যবসা করছিল তাতে আয় মন্দ হচ্ছিল না। খবর পেল উৎপাতন রাজ্য থেকে চোরাই পথে জিনিস আনতে পারলে, বিশেষ করে শুপারী, তা হলে খুব লাভ। নিরাপদ মেতে উঠল শুপারীর ব্যবসায়ে। আজকাল আর তাকে ট্রেনে দেখা যায় না।

মানকুমারী চিন্তিত হল।

শান্তিও ছট্‌ফট্ করছে।

মানকুমারী দীনতারণকে পাঠাল সর্বেশ্বরের বাড়িতে খোঁজ

নিতে। সর্বেশ্বর সঠিক সংবাদ দিতে না পারলেও বলল, রোজ অনেক রাতে ফেরে আর সকাল হলেই উঠে চলে যায়। রাতে এলে তাকে পেতে পার।

দীনতারণের মুখে খবর পেয়ে শান্তির হাত ধরে মানকুমারী হাজির হল সর্বেশ্বরের বাড়িতে। নিরাপদ তখনও ঘুম থেকে ওঠে নি। ডেকে তুলল তাকে। চোখ ডলতে ডলতে নিরাপদ বলল, এত সকালে মাসীমা আপনি!

অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি তাই দেখতে এলাম।

সময় পাইনি। এখুনি বের হতে হবে। কটা বাজে, সাড়ে পাঁচটা! সাড়ে ছটায় গাড়ি আসবে। আপনারা বসুন আমি চায়ের জোগাড় দেখি।

মানকুমারী বলল, চায়ের দরকার নেই বাবা, আমি চললাম। শান্তি রইল তার সঙ্গে কথা বল। বলতে বলতে মানকুমারী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তুমি তো আচ্ছা লোক! বলল শান্তি।

নিরাপদ হেসে বলল, পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় কোন জিনিস জানো শান্তি, টাকা! টাকা! তারই পেছনে ছুটছি।

একটা খবর তো দেবে।

সময় পাইনি। রাগ করেছ। রাগ করো না। অঢেল পয়সা। এবার বাড়িটা পাকা করব। দালান তুলব। তা না হলে তুমি এসে বাস করবে কোথায়। এই ভাঙ্গা ঘরে? ছোঃ!

দালান হলে কি আর আমাকে মনে থাকবে।

কি যে বল। বেশ, কি করলে খুশী হও বল।

কি করলে খুশী হই তা তোমাকে বলতে হবে নাকি।

বিয়ে। সরি। তা ওই সামান্য কাজটার জন্য ভাবছ কেন। তুমি আমার ইহজনমের পরজনমের স্ত্রী। বেশ তাই হবে। তবে ঢাক ঢোল বাজাবার সময় নেই। একবার সরকারী দপ্তরে গিয়ে

নামটা লিখিয়ে আসব। আজ কত তারিখ, আটই, বেশ আঠাশে তারিখে প্রস্তুত থেক। চোরকাটায় গিয়ে সব মিটিয়ে ফেলব। তারপর দিন ক্ষণ দেখে ঢাক ঢোল বাজিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব আমার বাড়িতে। দেরী করতে হবে অবশ্যই, কেননা বাবাকে টাকা দিয়েছি ইঁট কেনার। দালান তৈরী হতে সময় লাগবে। এবার রাগ কমল তো। দেখি মুখখানা।

মুখ এগিয়ে দিল শান্তি।

পেছন চাপা সরু প্যাণ্ট পরে নিরাপদ প্রস্তুত হল। শান্তিও ফিরে গেল তার বাড়িতে। বাড়ি ফিরেই মানকুমারীকে বলল সব কথা।

আর কুড়িটা দিন। ভালই হল। এবার জোগাড়যন্ত্র করতে হয়।

কিছুই করতে হবে না। নিরাপদ বলল চোরকাটায় সরকারী অফিসে বিয়ের ব্যবস্থা হবে।

বেশ তাই হবে।

মানকুমারী দেওয়ালে আঁচড় দিয়ে দিন গুনছে। শান্তিও অধীর প্রতীক্ষা করছে।

আঠাশ তারিখ সকাল বেলায় মানকুমারী শান্তিকে নিয়ে হাজির হল নিরাপদের বাড়িতে। সর্বেশ্বর তখন ইঁটের পাঁজার পাশে দাঁড়িয়ে মুনীষ মজুরের অপেক্ষা করছে। মানকুমারীকে দেখে জিজ্ঞেস করল, কি খবর বউঠান।

নিরাপদকে দেখতে এসেছি।

সে তো কাল রাতে ফেরেনি।

ফেরেনি! চমকে উঠল মানকুমারী।

তোমার কোন কাজ ছিল বুঝি।

হ্যাঁ। আজকে আসতে বলেছিল।

ওর কি কিছু ঠিক আছে। আজকাল মাঝে মাঝেই ঘরে ফেরে

না। আগে ওর মা চিন্তা ভাবনা করত। এখন আর ভাবনা চিন্তা করে না। জানে তো ওর স্বভাব।

মানকুমারী বলল, নিরাপদ ফিরলে আমাকে একটা খবর দিও ঠাকুরপো।

শান্তির হাত ধরে মানকুমারী ফিরে গেল তার ঘরে। শান্তিকে সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা পড়ে রইল। নিরাপদ আর এল না সেদিন।

পরদিন সকালে আবার গেল নিরাপদর খোঁজে। সেদিনও নিরাপদ আসেনি।

এমনি করে মাস পেরিয়ে গেল।

শান্তি একদিন চুপি চুপি যা বলল তা শুনে মানকুমারীর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সর্বনাশ করেছে শান্তি। অবশ্য বুদ্ধির যদি দোষ ঘটে থাকে তা তার নিজের। শান্তিকে অবাধে নিরাপদর সঙ্গে মিশতে দেওয়া উচিত হয় নি।

সর্বেশ্বরও বিশেষ চিন্তায় পড়েছে। এতদিন ঘরে না ফেরার কোন কারণ খুঁজে পেল না সে। নিরাপদর খোঁজে বের হল নিজেই। তার বন্ধুবান্ধবদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানল সে নাকি উৎপাতন রাজ্যে গেছে ব্যবসার ধান্দায়।

তারও মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ল।

শেষ পর্যন্ত নিরাপদ ফিরতে পারবে কি!

ছোট শহরে হঠাৎ গোলমাল সুরু করল স্কুলের ছেলেরা। সামনে পরীক্ষা অথচ তেলের অভাবে আলো জ্বলছে না। দল বেঁধে ছেলেরা গেল হাকিমের কাছে তেল চাইতে। দলের সঙ্গে গিয়েছিল মানকুমারীরর ছেলে অধীর। সেও স্কুলে পড়ে, বয়স তার বার কিম্বা তের।

মিছিল করে হাকিমের কাছে আবেদন জানাতে গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে এল ছেলেরা। তেলের সাপ্লাই নেই, তেল দেওয়া সম্ভব নয়।

ছেলেরা বলল যথেষ্ট তেল আছে বাজারে। এক বোতল দেড় টাকা দুটাকা।

হাকিম বলল, থাকলে তোমরা কিনে নাও।

অত পয়সা নেই আমাদের।

অল্প পয়সায় তেল দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

যারা চোরাবাজার চালাচ্ছে তাদের কাছ থেকে আদায় করে দিন। আমরা তাদের ধরিয়ে দিচ্ছি।

আইনে আমায় সে ক্ষমতা দেয় নি। আমি অক্ষম।

ছেলেরা নাছোড়বান্দা।

হাকিম নিরুপায়।

ফোন তুলে ডাকল পুলিশকে। আর পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল দপ্তর থেকে।

পরবর্তী ঘটনা না বললেও চলে।

শিশু কিশোর নিধনে মেতে উঠল ডিসগ্রেস পার্টির পুলিশ।

পুলিশের গুলীতে লুটিয়ে পড়ল অধীর।

সংবাদটা পৌঁছল মানকুমারীর কানে। প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় ছুটে এল ঘটনাস্থলে। অধীরের কাছে পৌঁছতে পারল না কোন ক্রমেই। পুলিশ জায়গাটা ঘিরে রেখেছে। মৃত্যু পথযাত্রী পুত্রকে দেখবার অধিকারও দিল না শোকার্ত জননীকে। মানকুমারী ধুলায় লুটিয়ে হাহাকার করতে লাগল। দর্শকরা দূরে দাঁড়িয়ে। সাহস করে কেউ এগিয়ে এল না সাহায্য করতে, সমবেদনা জানাতে। হাত তুলে ঈশ্বরের কাছে ব্যর্থ নিবেদন জানাতে লাগল মানকুমারী। তারপর আর তার চেতনা ছিল না। কখন যে তাকে তুলে এনে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে পাড়ার লোক সেটুকুও তার জানা নেই। চোখ মেলে দেখল তার বস্তীর ঘরখানা, আকুলভাবে চিৎকার করে উঠল, অধীর!

মানকুমারীর অশ্রু শুকোবার আগেই ক্রন্দন রোল উঠল অনেকের ঘরে।

দুরন্ত বেগে ছুটে চলল মানুষের আর্তনাদ। আর্তনাদ শুনে প্রশাসন শীর্ষরা আত্মগোপন করল। সাহস করে তারা এগিয়ে এল না জনতার বিক্ষোভের সামনে।

সরকারী দপ্তরে বসে ভাষণ আর বাণী ছুড়ে মারতে লাগল জনতার ওপর। উপদেশ দিল কদলী আর আলু ভক্ষণের।

জনতার দাবী খাবার দাও।

সরকার বলছে খাবার নেই।

জনতা বলছে, আছে মজুতদারদের ঘরে। চোরা খামার থেকে টেনে বের কর খাবার।

সরকারের পেয়াদা রিপোর্ট দিচ্ছে, কোথাও নেই। চোরাকারবার এদেশের লোক জানেই না। কিন্তু বাজারে উচ্চমূল্যে খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে। অনাহারে কেউ তো মরছে না। সরকার বলল, এই তো আমাদের ক্রেডিট্। কাউকে না খেয়ে মরতে দেইনি।

খবর পাওয়া গেল উত্তর সীমান্তে না খেয়ে মরেছে সাতজন। পশ্চিম জেলায় মরেছে উনত্রিশজন, আর পূর্বপারে মরেছে সাতাশ-জন।

সরকার বলল মিথ্যে কথা। শত্রুপক্ষের রটনা।

পরের দিন সরকারী ভাষ্য বের হল প্রধান দপ্তর থেকে।

উত্তরে সাতজন মরেনি, মরেছে তিনজন। তাদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাদের মৃত্যুর কারণ অনাহারে নয়, মৃত্যুর কারণ ম্যাল নিউট্রিশন।

পশ্চিমে কেউ মরেনি। একটা গ্রামে কলেরা হয়ে ক'জন মারা গেছে দুসপ্তাহ আগে। সেই খবরটাই ফলাও করে দেখান হয়েছে বিরোধীদের কাগজে।

আর পূবের কথা না বললেও চলে। চোরা কারবারী সাতজন পুলিশের গুলীতে মরেছে নদীপথে চোরাই চালান দেবার সময়। পুলিশ গুলী করতে বাধ্য হয়েছে, কারণ চোরা কারবারীরা উৎপাতন রাজ্যের লোক এবং পুলিশের ওপর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছিল।

বাস্।

খেল খতম।

তা হলে অনাহারে কেউ মরেনি।

পাতনের রাজধানীতে বিরোধী সদস্যরা আইন মজলিসে তুফান তুলল অনাহারের মৃত্যু নিয়ে। সরকার ধামা চাপা দেবার চেষ্টা করল অঙ্গরাজ্যের বিষয় বলে। সদস্যরা তবুও নাছোড়বান্দা। অবশেষে পূর্বায়তন রাজ্যের হিসেব দাখিল করে ব্যঙ্গের হাসি হাসল সরকার পক্ষ।

কিন্তু জনতা তা শুনতে চায় নি। যে আগুন জ্বলল ছোট্ট একটা শহরে, যে হাঙ্গামা লেখা হল অধীরের রক্তে তা ছড়িয়ে পড়ল গোটা পূর্বায়তনে। চমকে উঠল প্রশাসকরা। অশান্তি দমন করতে ডাক পড়ল রক্ষী বাহিনীর। রঙ্গভূমি থেকে বিদায় নিল পুলিশ, প্রশাসন ব্যবস্থা নিজের হাতে তুলে নিল রক্ষী বাহিনী। সাময়িক শান্তি ফিরে এল। এ শান্তি কবরের শান্তি কিনা বোঝা গেল না তখন।

আইন সভায় তুমুল বাকবিতণ্ডার ঝড় উঠল।

সরকার দোষ দিল বিরোধীদের। বিরোধীরা অভিযোগ করল সরকারের বিরুদ্ধে। তারপরই হট্টগোল। তারপরই টেবিল চাপড়ানো, তারপরই ঘুঁষোঘুঁষি। যবনিকাপাত হল আইনসভায়। আইন প্রণেতারা বে-আইনী কাজ করে আত্মতৃপ্ত হল বোধহয়।

কিন্তু অশান্তির শেষ হল না।

পাতনের রাজধানী তখন আরও উত্তপ্ত।

মানবদল নতুনভাবে আন্দোলন সুরু করল সেখানে।

চিৎকার করল গো হত্যা বন্ধ কর। গো আমাদের মাতা। তাকে রক্ষা করা আমাদের ধর্ম।

বুদ্ধিমান লোক হেসে বলল, নরহত্যা বন্ধ করার আন্দোলন করতে দেখছিনা কাউকেই। যে দেশে মানুষ না খেয়ে মরছে, খেতে

চাইলে গুলী খেয়ে মরেছে, সে দেশে গো হত্যা বন্ধ একটা যুক্তিহীন বিকট আন্দোলন।

মানবদল তা শুনবে কেন, তাদের মাতা যে গো মাতা। সপ্তমাতার শ্রেষ্ঠমাতা গরু।

অন্দোলন নায্য কি অনায্য তা বিচার করার মত মানসিক ভারসাম্য আর নেই অমাত্য পরিষদের। আন্দোলন আরম্ভ হলেই আগে পুলিশ পাঠায় তা দমন করতে। রাজধানীতেও পুলিশ এল লাঠি হাতে আন্দোলন দমন করতে।

রক্তারক্তি হল। বহুজন গ্রেপ্তার হল। আন্দোলন ঝিমিয়ে গেল সেখানেও।

মানবদল শুনবে কেন। তারাও সুযোগের প্রতীক্ষা করছিল।

দল বল নিয়ে হানা দিল ডিসগ্রেস পার্টির সভাপতির ফ্ল্যাটে। হাতে তাদের খোলা তলোয়ার। মুখে তাদের গো হত্যা বন্ধের শ্লোগান, আর মনে তাদের নরহত্যার লিপ্সা।

দরজা জানালা ভাঙ্গল। টেবিল চেয়ার উল্টালো। কিন্তু প্রার্থিত ব্যক্তিটিকে তারা খুঁজে পেল না। পেছনের দরজা দিয়ে সভাপতি ততক্ষণে নিখোঁজ।

পুলিশ এল অনেক পরে।

তখন লঙ্কাকাণ্ড শেষ।

মানবদলের বীরপুঙ্গবরা ঘরে ফিরে গেছে।

ঝড় উঠল অমাত্য পরিষদে।

এর জন্য দায়ী স্বরাষ্ট্র বিভাগের অমাত্য। রায় দিল সবাই একই সুরে।

সম্মান রক্ষার দায়ে অগ্রম পিল্লাই বিদায় নিল অমাত্য পরিষদ থেকে। তাতেই যে সমস্যার সমাধান হল তা নয়। আন্দোলন থামল না। নতুন স্বরাষ্ট্র বিভাগের অমাত্য গ্রেপ্তারের আদেশ দিল আন্দোলন-কারীদের। নির্বিচারে গ্রেপ্তার চলতে থাকে।

সাধারণ মানুষ মাথায় হাত দিয়ে বসল। তারা বুঝতে পারল না কোন যুগে বাস করছে। মধ্যযুগীয় অসভ্যতা এর চেয়ে কি ভয়ঙ্কর ছিল।

ইকরেতিকরে রাজ্যেও অশান্তি।

ব্রজবুলি তারা মোটেই স্বীকার করতে চায় না। যবন ভাষা অনেক ভাল। আলকাতরার টিন আর তুলি নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে ইকরেতিকরে রাজ্যের জোয়ান ছেলেরা। ব্রজবুলির হরফদেখা মাত্র আলকাতরা লেপে দিচ্ছে তার ওপর। ব্রজবুলির বই পেলে আগুন জ্বালিয়ে উৎসব করছে।

কোথাও শান্তি নেই।

পাহাড়িয়া দেশেও স্বাতন্ত্র্যের হাঁক দিচ্ছে কায়েমী স্বার্থের একদল, আরেকদল কয়েমী স্বার্থের অতি অনুগত অনুচররা তাদের বাধা দিচ্ছে।

মহামাত্য পড়েছে ফাঁপরে।

ওদিকে বেণীধ্বজেও পুনর্গঠনের ধুয়া উঠেছে।

সর্বত্র এক কথা।

ভাষার ভিত্তিতে অঙ্গরাজ্য গঠন কর, অঙ্গরাজ্যকে আরও ক্ষমতা দাও; পাতনের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রী কর, ব্রজবুলির সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।

ডিসগ্রেস পার্টির সামনে নানা সমস্যা। দেশ গঠনের বড় বড় বুলি জাহান্নামে যাচ্ছে। তারাও বুঝতে পারছে অন্তিম দশা সমাগত।

দেশে অপ্রিয়, বিদেশে বান্ধবহীন। মাত্র এক যুগের ব্যবধান।

সবার মনে এক প্রশ্ন, কেন এমন হল?

বিচার করতে বসল গবেষকরা। তারা ফতোরা দিল 'সাংগঠনিক দুর্বলতা'। তারা জোরালো ভাষায় বলল, গুরুজি প্রদর্শিত ত্যাগের পথ ছেড়ে ভোগে মেতেছে তার শিষ্যরা। তারা আরও বলল, সামাজিক

বন্ধন শিথিল হয়েছে, সমাজ ব্যবস্থায় অসাম্য দেখা দিয়েছে,—তাই আজ ডিসগ্রেস পার্টির নাভিশ্বাস।

বিরুদ্ধপক্ষ আরও একটু জুড়ে দিল এই গবেষণার সঙ্গে, অহিংসার নামে হিংসা, সমাজবাদের নামে ধনতন্ত্রবাদ চালু করা আর কায়েমী স্বার্থকে পোষণ করাই ডিসগ্রেস পার্টিকে ডিগ্রেড করবে। এবার প্রস্তুত হও, জনমনে ঘৃণা জাগিয়ে তোল প্রশাসকদের বিরুদ্ধে। সামনে নির্বাচন। এই নির্বাচনে ভূমিশায়ী করতে হবে ওদের।

আবার সভা বসল, আবার ফতোয়া জারী হল, আবার শলা পরামর্শ হল।

ভীত নই আমরা।

দো-দো রুপেয়া এক-এক ভোট।

ছড়াও টাকা।

সরকারী টাকা দাও রিলিফে আর যোজনায়। যারা একশ টাকার নোট দেখেনি কোন কালেই, তাদের হাতে তুলে দাও একশ টাকার নোট। যারা কখনও খায়নি পোলাও কালিয়া তাদের জন্য ঢালাও খানার ব্যবস্থা কর।

সরকারী তহবিল থেকে স্রোতের মত টাকা বেরিয়ে যেতে থাকে।

কারণ, ভোট চাই।

ক্ষমতা যতদিন রয়েছে হাতে ততদিন তার সৎব্যবহার করতে হবে।

পূর্বায়তনের সব চেয়ে ক্ষমতাশালী একাক্ষিবাবু দল বল নিয়ে নেমে পড়লো লড়াইয়ের ময়দানে। তার কথা ভোট চাই, ক্ষমতা চাই হাতে। তার জন্য যে কোন উপায় গ্রহণ করতেই হবে।

রাজধানী থেকে মহমাত্য এলো, এল সব উঁচুতলার মানুষরা। জমাজমাট সাজগোজ করে সভা হল। বক্তৃতার বন্যা বয়ে চলল।

সবাই শুনল কি না শুনল, বোঝা গেল না। ছিঃ ছিঃ করে ফিরে গেল দর্শক।

এরাই চায় সমাজবাদের প্যাটার্ন। সমাজকে বাদ দিয়ে প্যাটার্ন হয় না কোন দেশেই। গণকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্র হল পরিহাস। বিপক্ষকে দলন করে সংসদীয় রাজনীতি হল রাজনীতির অপমান। লোকে বিশ্বাস করতে পারে না এই সব বক্তাদের।

রাজধানীতে আবার সুরু হল নতুন আন্দোলন। দলবিশেষের কণ্ঠে শোনা গেল যবন ভাষা হঠাও।

আবার রাজধানী ছেড়ে অনেক দূরে চিৎকার উঠল, ব্রজবুলি হঠাও।

সংঘর্ষ কিন্তু দূরে দূরে। দাঙ্গা হাঙ্গামা নেই কিন্তু বিদ্যুতের চমকের মত ঝলসে দিতে থাকে রাজনীতিকে, আবর্ত সৃষ্টি হয় দূরে এবং নিকটে।

ঐক্য নষ্ট হল, সংহতি নষ্ট হল।—রব উঠল সর্বত্র।

কমিশন বসাল মহামাত্য।

ভাষা কমিশন।

হাঁ।

অঙ্গরাজ্যের ভাষার গণ্ডী হল অঙ্গরাজ্যের ভাষা। বাইরের কাজ চলবে দুটো ভাষায়। ব্রজবুলি আর যবন ভাষায়। রাজধানীর দল বলল, তাহলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। যবন ভাষা হঠাও।

দূরের দল বলল, আমরাও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করব। ব্রজবুলি হঠাও।

অবশেষে ত্রিভাষা গ্রাহ্য হল সাময়িকভাবে। অশান্তি থেকে গেল ভেতরে ভেতরে।

ওদিকে বাদশাপুরে দ্বিভাষা নিয়ে তখন লড়াই সুরু হয়ে গেছে। উত্তরের লোক চায় তাদের প্রাধান্য, দক্ষিণের লোক চায় তাদের প্রাধান্য। অঙ্গরাজ্যের রাজধানী দক্ষিণে আর মুখ্য অমাত্য হল

উত্তরের। তাই হাঙ্গামা গড়ালো অনেক দূর অবধি। পুলিশ এল, মানে লাঠি আর গুলী সম্বল করে উত্তরের মুখ্য মন্ত্রী দক্ষিণকে কাবু করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। লোকে বলল, জহ্লাদ।

মহামাত্য কিছুই স্থির করতে না পেরে আবার কমিশন বসালো। বাদশাপুর ভেঙ্গে দুখান হল। সাময়িক শান্তি এল বাদশাপুর অঙ্গ-রাজ্যে, নতুন রাজের পত্তন হল। নাম দিল তার ভেলকিনগর।

অসন্তোষ রোধ করতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি মহামাত্য, কিন্তু তবু আশঙ্কা রয়েছে মনে, শেষ রক্ষা হবে কি!

তার্কিকদের দ্বন্দ্ব চলছিল রাজধানীর একটি শূন্য বাড়ীতে বসে।

নাম্বার ওয়ান তার্কিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। অধ্যাপনা করে তর্কশাস্ত্রের। ফরমুলা মিলিয়ে বিচার করে ঘটনার।

নাম্বার টু তার্কিক রাজধানীর খ্যাতনামা জুনিয়ার ব্যারিস্টার নরোত্তম দাস। আইনের সূক্ষ্ম বিচারে যা গ্রাহ্য নয় তা মোটেই তর্কের ডেটা নয় বলে অভিমত দেয় সব সময়।

নাম্বার থ্রি তার্কিক সমাজসেবী পৃথ্বীনারায়ণ। সমাজে যা গ্রাহ্য নয় তা সে কখনই স্বীকার করে না। বিশেষ করে নীতিশাস্ত্র নিয়ে মাথা ঘামায় বেশি।

চতুর্থ ব্যক্তি হল রাজনীতির সেবক, অবশ্য নেতা নয়। সম্প্রতি ফরেন ঘুরে এসে রাজনীতিতে রিয়ার্সাল দিচ্ছে।

আলোচ্য বিষয়ঃ সমাজ কোন পথে।

অধ্যাপক তন্দুরীরাম বলল, সমাজ বলতে কি বোঝ তোমরা?

পৃথ্বীনারায়ণ বলল, মানুষের সমাজ।

তন্দুরীরাম বলল, তা হলে তো বিশ্বের মানুষ নিয়েই আলোচনা করতে হয়।

রাজনীতির সেবক মির্জা হোসেন বলল, না, আর একটু ছোট করে দেখতে হবে সমাজকে। আমাদের এই পাতনীয় সমাজের কথা

নিয়ে আলোচনা করা যাক। খুব বড় করে দেখলে সমাজের ডেফিনেশন ঠিক করতেই সম্পূর্ণ সপ্তাহটা কেটে যাবে। তার চেয়ে যাকে নিয়ে আমাদের নিত্যকার কাজ তাকে নিয়েই কথা বলা উচিত।

নরোত্তম বাধা দিয়ে বলল, তাতে লিগ্যাল ডিফিকাল্‌টি আছে। তার চেয়ে আসুন আমরা বরং সমাজ ছেড়ে পাতনীয় নাগরিক জীবন নিয়ে আলোচনা করি। সমাজ শব্দটা একদম ব্যবহার করব না।

ব্যারিস্টার বলল, মন্দ কথা নয়। লেট আস্ স্টার্ট উইথ পাতনীয় নাগরিক।

তা হলে আগে নেশানালিটি নিয়ে আলোচনা করতে হয়, বলল মির্জা হোসেন।—আসল আলোচনা থেকে আমরা অনেকটা দূরে সরে এসেছি। মোদ্দা কথা হল, আমাদের দেশের জনজীবনের ধারা কি?

পৃথ্বীনারায়ণ বলল, জনজীবনের কোন ধারাই নেই বর্তমানে। আমাদের জীবনে বৈদেশিক চিন্তাধারা যতটা স্থান করেছে তার চেয়ে বেশি স্থান করেছে বিদেশের কুরুচিগুলো। আর সেগুলো প্রচার করছে সিনেমার ছবি। আজকের ইয়ং সমাজের আদর্শ হল সিনেমা স্টার, সবাই যেন পাল্লা দিয়ে তাদের অনুকরণ করতে চাইছে।

নরত্তমদাস বলল, সিনেমা একটা মস্ত বড় আর্ট।

ফরেন ফেরতা রাজনীতির সেবক বলল, আমাদের দেশের ছবি দেখেই নাক সিঁটকোলে চলবে না মহাশয়গণ। যদি দেখতেন বিদেশের ছবি, তা হলে রুচির কথা আর বলতে সাহস পেতেন না।

প্রত্যেক দেশে দেশীয় রুচি অনুসারেই ছবি তৈরী হয়। আমাদের দেশে কিন্তু বিদেশী রুচিকে চালু করতে ব্যস্ত হয়েছে প্রযোজকরা। অন্যদেশের সংস্কৃতি আর কৃষ্টির বাহক হল তাদের সিনেমার ছবি। আর আমাদের দেশে ছবি তোলা হয় অর্থের জন্য। বেশি পয়সা কি

করে আমদানী হবে সেকথা ভেবে ছবি তোলা হয়। তাই তাতে যৌন আবেদনের ছড়াছড়ি থাকে। ফলে কচি কচি মাথাগুলো নষ্ট হয়।

অধ্যাপক তন্দুরীরাম পৃথ্বীনারায়ণের যুক্তি স্বীকার করল না। বলল, আমাদের দেশে যৌন আবেদন নিয়ে ছবি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তাতে কচি মাথা খাবার প্রশ্ন কেন উঠছে তা বুঝতে পারছি না।

কারণ কচি কচি ছেলে মেয়েরা তা দেখতে যায়। তারই প্রতিফলন দেখতে পাই আমাদের পরবর্তী বংশধরদের মাঝে। আমাদের প্রশাসকরাও চায় মানুষকে ভ্রষ্ট চরিত্র করতে, নইলে এসব ছবি কখনও পাশ করত না সেন্সার বোর্ড।

প্রশাসকদের ওপর দোষারোপ করছেন কেন?

পৃথ্বীনারায়ণ বলে, নিশ্চয় এ তাদেরই অপরাধ। তারা সাধারণ মানুষের কোন বাসনা, কোন অভাবই পূর্ণ করতে পারেনি, সেজন্যই তারা অশ্লীল চিত্র ও অশ্লীল সাহিত্যের সমর্থন করে এই বিরাট ফাঁকটা পূর্ণ করতে চায়। এর কুফল যে কী তা আমরা প্রতি নিয়ত দেখতে পাচ্ছি পথে ঘাটে।

রাজনীতির সেবক উত্তপ্ত হয়ে বলে, আপনি যদি দুশ' বছর আগে জন্মাতেন তা হলে মানাত। কাল যা ভাল মনে হয় নি আজ তা ভাল মনে হতে পারে। তাই যুগের ধর্মকে সম্মান করাই হল বড় কথা। আপনারা কেন শ্লীল অশ্লীলের প্রশ্ন তুলছেন? আপনারা শুধু লক্ষ্য রাখবেন সত্যিই এসব ছবি দেখে নাগরিক জীবনে সত্যিকার কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কিনা।

অবশ্যই তা করতে হবে, বলল অধ্যাপক তন্দুরীরাম। আসল হল রেজাল্ট, যদি রেজাল্ট খারাপ হয় তা হলে সে ছবির দোষ। তখনই বিচর করা যাবে ছবিটা শ্লীল কি অশ্লীল। ছবি দেখেই মতামত দেওয়া উচিত হবে না।

পৃথ্বীনারায়ণ সমর্থন করতে পারল না তাদের অভিমত।

সিগারেটে আগুন দিয়ে বলল, ব্রজবুলি ভাষায় যে সব ছবি দেখান হচ্ছে আজকাল, তা অতি নক্কারজনক এবং তার পরিণামও যে কি, তা বর্তমান কালের জোয়ান ছেলেদের দেখেই বেশ বুঝতে পারছি আমরা। রেজাল্টএর জন্য বিশেষ বিলম্ব করতে হবে না কাউকেই।

তা হলে আপনার মত হল বর্তমান নাগরিক জীবনের যে পঙ্কিলতা তার জন্য দায়ী সিনেমা। মন্তব্য করল রাজনীতির সেবক।

পৃথ্বীনারায়ণ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, সিনেমাই সম্পূর্ণ দায়ী নয়, তবে তার প্রভাব যে বর্তমান নাগরিক জীবনের ওপর বিশেষ ভাবে দুষ্ট ক্ষত সৃষ্টি করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা এমন একটা অস্থির বিশ্বে বাস করছি যেখানে সুস্থ ও সৎ জীবনযাপন কল্পনার বস্তু। সেই কাল্পনিক জগতে আমরা পৌঁছতে পারতাম যদি পরিবেশ সুন্দর ও স্বচ্ছ হত।

কেন পারছি না? প্রশ্ন করল অধ্যাপক তন্দুরীরাম।

আমাদের বংশধরদের সামনে রয়েছে চরম নৈরাশ্য। উচ্চ শিক্ষা লাভ করেও তারা কর্মসংস্থান করতে পারছে না। যন্ত্রবিদ্ কাজ পাচ্ছে না, শিক্ষিত সম্প্রদায় বেকার, কৃষক হাহাকার করছে। সর্বত্র এক অনিশ্চিত জীবনের আশঙ্কা। এদের সামনে না আছে ভবিষ্যৎ না আছে কোন আদর্শ। তাই সাময়িক অপ্রকৃত তৃপ্তি খুঁজছে এই ব্যর্থতাকে গোপন করতে। গোপন পথেই তারা চলতে চাইছে। তাই নাগরিক জীবনেও এসেছে উচ্ছৃঙ্খলতা, আর এসেছে সমাজের প্রতি চরম ঔদাসীন্য আর অবহেলা। তারা সুস্থ সমাজ জীবনকে শ্রদ্ধা করে না, সুস্থ ভাবে চলতে চায় না। এর ফলেই সমাজে অপরাধমূলক মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছে।

নরোত্তমদাস বলল, তোমার কথা অস্বীকার করছি না, কিন্তু এর দায়িত্ব কার?

রাষ্ট্রের।

রাষ্ট্র তো তাদের সমাজবিরোধী হতে বলে নি, বরং আইনানুগ হতে বলেছে।

বলাটা যত সহজ করানোটা তত সহজ নয়। যদি তা হত, তা হলে সমাজের চেহারা পালটে যেত। আমি যদি বিলাস বহুল জীবন যাপন করি আর অপরকে বলি দারিদ্র্যকে মাথায় পেতে নিতে, তা হলে যেমন তা পরিহাসে পরিণত হয়, তেমনি রাষ্ট্রের শ্রেণী বৈষম্য, অসম অর্থবণ্টন, শোষণ ও পীড়ন মানুষকে বিপথে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে। রাষ্ট্র যা পারত তা করেনি, ফলে উদ্ভব হয়েছে অনাচার আর উচ্ছৃঙ্খলতা। আর একে ত্বরান্বিত করেছে সিনেমা। নারী পুরুষের বর্তমান বেশভূষাও এরজন্য অনেকাংশে দায়ী। একদিকে আকাশ চুম্বী অট্টালিকা উঠছে কয়েকটি, অপর দিকে হাজার হাজার নোংরা বস্তীতে জীবনযাপন করছে কোটি কোটি লোক; একদিকে অঢেল আহার্য আর ভোগ, অপর দিকে কোটি কোটি লোকের কণ্ঠে হা-অন্ন হা-অন্ন চিৎকার। এসবের প্রতিক্রিয়া হল সমাজ ব্যবস্থার ভাঙ্গন।

থামল পৃথ্বীনারায়ণ।

অধ্যাপক হাসতে হাসতে বলল, পৃথ্বীনারায়ণ দেখছি রাষ্ট্রবিরোধী।

অধ্যাপকের হিসাবে কিছু ভুল হল। রাষ্ট্রবিরোধী শব্দের অর্থ খুবই গুরুতর। পৃথ্বীনারায়ণ বলল,—আমি রাষ্ট্রের বিরোধী নই। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার বিরোধী। আমার অভিযোগ রাষ্ট্র পরিচালকদের নীতিহীনতার বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়।

রাজনীতির সেবক সমর্থন করল পৃথ্বীনারায়ণকে।

পৃথ্বীনারায়ণ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, অনেকটা রাত হল, আর নয়।

নরোত্তমদাস বলল, কিন্তু তোমাদের অথবা আমাদের আলোচনা রাষ্ট্রকে সংযত হতে কতটা সাহায্য করবে বলতে পার!

তা বলতে পারি না। রাষ্ট্রশীর্ষদের সংযত করতে পারে

জনসাধারণ। সামনে নির্বাচন, এই নির্বাচনে অথবা পরবর্তী নির্বাচনে মানুষ নতুন সমাজ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেই ভোট দেবে। বাঁচার আশায় পুরানোকে ছুড়ে ফেলে দেবে। নতুনকে আঁকড়ে ধরবে।

রাজনীতির সেবক ঠিক স্বীকার করতে পারল না। প্রতিবাদ করে বলল, আমাদের সমাজ যথেষ্ট উন্নত হয়েছে অন্যান্য দেশের তুলনায়।

অধ্যাপক হেসে বলল, কথাটা বোধহয় ঠিক হল না ফরেন ভাই। আমার স্ত্রী তোমার স্ত্রীর তুলনায় অনেক বেশি সুন্দরী বললেই আমার স্ত্রীর রূপ বর্ণনা হয় না। আমার স্ত্রীর চেয়েও রূপসী আরও অনেক আছে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করতে হলে যে দেশের উন্নতি হয় নি সে দেশের কথাই বলতে হবে, আর যে দেশের উন্নতি হয়েছে সে দেশকে বাদ দিতে হবে, এটা কোন যুক্তি নয়।

নরোত্তমদাস বলল, মাস্টার মশাই ঠিক বলেছেন। মানুষের গাল দুটো যদি লাল হয় আর তা দেখে যদি স্বাস্থ্যের বিচার করতে হয় তা হলে ভুল হবে। যক্ষ্মা রোগীর গালের রংও লাল হয়। তাতে তার স্বাস্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। আমারা দেশকে উন্নত তখনই বলব, যখন আমাদের দেশের মানুষ দুবেলা পেট ভরে খেতে পাবে, আমার দেশের মানুষ যখন কর্মী হবে এবং তাদের কর্মসংস্থানও হবে। কোন ভিন্ দেশের মহাপুরুষ কি সার্টিফিকেট দিল তা দিয়ে দেশের উন্নতি অবনতি বিচার করা ভুল।

রাজনীতির সেবক বলল, বিদেশে আমাদের যে সুনাম আছে তার কি কোন মূল্যই নেই?

নেই তা বলছি না, তবে তার প্রয়োজন নেই আমাদের জীবনে। আমাদের সুনাম যদি থাকত দেশের মানুষের মুখে, তারই মূল্য হত বেশি। সেইটেরই প্রয়োজনও ছিল বেশি।

মহিলা সমিতির মিসেস অটল আজকাল খুবই ব্যস্ত। একটা

বিরাট নারীবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। গড়েও তুলেছে অনেকটা।

রাজধানীর বড় বড় কর্মচারীদের স্ত্রীরা হল এই নারীবাহিনীর সদস্য।

মাঝে মাঝেই তারা শহর উপকণ্ঠে যায় গৃহস্থ বধূদের পরিবার পরিকল্পনা শেখাতে। শহর থেকে অনেক দূরে দূরেও যায় মহিলা সমিতি গড়তে।

বচনপুরের পারবতীয়া তাদের সাদরে বসিয়েছিল তার ঘরে। মনোযোগ দিয়ে শুনেছিল তাদের বক্তব্য। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আম্মাজি আপনার কটি পুত্রকন্যা ?

মিসেস অটল বলল, পাঁচটি।

আপনার সৌভাগ্য। আমারও চারটি পুত্র একটি কন্যা। তাতেও ক্ষেতিকাজ শেষ করতে পারছি না। আমার যদি আরও আরও চারটি পুত্র থাকত তাহলে চাষের কাজে অনেক বেশি সাহায্য পেতাম। জমিগুলো বেকার পড়ে থাকত না।

ফিস ফিস করে নতনাবাঈ মিসেস অটলকে ব্রজবুলিতে শোনাল, আদিযুগে মানুষ সন্তানকে সম্পদ মনে করত। এরাও তাই মনে করে। চাষ করতে, কাঠ কাটতে, পশুপালন করতে তাদের সন্তান ছিল সম্পদ। আজও সেই বিশ্বাস এদের আছে।

মিসেস অটল বেশি বাক্যব্যয় না করে সে দিনের মত বিদায় নিয়েছিল।

মইরা বিবিকে মিসেস অটল বারবার বলেছে তার ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে। বারবার সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে মইরা বিবি।

মইরা বিবি বলেছে, আমার প্রথম স্বামীর এক ছেলে আর এক মেয়ে তাদের বাবার কাছে আছে। আমার কাছে আর আসেও না তারা। দ্বিতীয় স্বামীর দুই মেয়ে দুই ছেলে। স্বামী মরেছে। বিষয়

সম্পত্তি বলতে কিছুই নেই। স্বামী বেঁচে থাকতে মজুরী করে দিন গুজরাণ হত, এখন আর দিন গুজরাণ হচ্ছে না বাঈ। ছেলেরা এখন রাখালী করে, অন্যের গরু ভেরা চড়ায়, তাই কোন রকমে একবেলার ভাত রুটি জুটছে। তাদের স্কুলে পাঠালে পেটে যে আর দানা পড়বে না, সে কথা কি ভেবেছেন বাঈ? আমরা গরীব মানুষ, আমাদের কি ছেলে পড়ানো সম্ভব?

মিসেস অটল তার সমাজ সেবার প্রোগ্রাম স্থগিত রেখে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল।

অমাত্য মহামাত্যের সঙ্গে দেখা করে নিবেদন করল দেহাতি মানুষদের বেদনা ও অসুবিধার কথা। জানতে চাইল, এর প্রতিকার কি ভাবে করা সম্ভব। সন্তান যে গরীবের পরিবারে কেবলমাত্র অন্নের অংশীদার তা নয়, সম্পদও। কোন রকমে আট দশটা বছর তাদের টেনে বড় করতে পারলে দরিদ্র মাতা-পিতাকে তারা সাহায্য করে কর্মের বিনিময়ে।

পরিবার পরিকল্পনা আর শিক্ষা বিস্তারের পথে এগুলো চরম বিঘ্ন।

আসল ব্যাধি হল দারিদ্র্য।

শহরের মানুষ অথবা সামান্য অর্থ আছে এমন যে কোন মানুষ সন্তানকে লেখাপড়া শেখাতে চায়, চেষ্টাও করে। কিন্তু দরিদ্র মানুষ তা পারে না। মানুষের দারিদ্র্যমুক্তি না ঘটলে এর প্রতিকার সম্ভব নয়। লোক দেখানো অক্ষর জ্ঞানই শিক্ষা নয়। শিক্ষার মান অক্ষর জ্ঞান দিয়ে বিচার করা হয় না। শিক্ষা আরও অনেক বড় জিনিস।

অমাত্যদের মন্ত্রণায় মিসেস অটল নামলো স্বাস্থ্যবিধি শেখাতে।

গ্রামে গ্রামে রঙীন শাড়ি ব্লাউজ পরা মেয়েরা ভিড় করল। গাঁয়ের বস্তীর মেয়ে পুরুষকে ডেকে ডেকে স্বাস্থ্যবিধি বুঝাতে লাগল।

ঝনমনিয়া গাঁয়ের মেয়েদের মুখপাত্র। তাকেই বুঝিয়ে ছিল মিসেস অটলের সঙ্গীনীরা। পোষাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখলে রোগ নিবারণ সম্ভব, ঘর বাড়ি পরিষ্কার রাখলে সংক্রামক ব্যাধি কখনও হতে পারে না।

ঝনমনিয়া মন দিয়ে সব শুনে স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষাদাত্রীদের ডেকে নিয়ে গেল ঘরে ঘরে।

এই দেখুন। এই বাড়িতে তিনটে বউ। সম্বল দুটো শাড়ি আর একটা গামছা। দুজন শাড়ি পড়ে বাইরে বের হলে একজন গামছা পড়ে ঘরে লুকিয়ে থাকে। পোষাক পরিচ্ছদ এদের পরিষ্কার করে রাখবার প্রয়োজন হয় না বাঈ। মেয়েরা যদি নাঙ্গা থাকতে বাধ্য হয়, পোষাকের প্রয়োজন তখন আর থাকে না। সে পোষাক যদি ময়লা নোংরা হয় তাতেও রোগ হয় না। আসল রোগ হল এরা পেট ভর্তি খেতে পায় না। যদি খেতে পেত তা হলে ঐ ছেড়া শাড়ি পড়েই ওদের জীবন সুখে কাটত। রোগের ভয় আর থাকত না।

মিসেস অটল অবাক হয়ে চেয়ে রইল ঝনমনিয়ার মুখের দিকে।

কি দেখছেন বাঈ। মানুষের আসল রোগটা ধরতে পারেন নি। ব্যাধির চিকিৎসা না করে উপসর্গের চিকিৎসা করলে রোগ নিরাময় হয় না বাঈ।

মিসেস অটল কোন জবাব দিতে পারল না। মুখ নীচু করে বস্তীর ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়াতেই ঝনমনিয়া আবার বলল, এদের সামিল হতে না পারলে এরা আপনাকে এদের সুখ দুঃখের কথা বলবে না বাঈ। আপনাদের সাজসজ্জা আর অলঙ্কার দেখলে ওরা ঘাবড়ে যায়, আপনাদের কাছে ওরা কোন ক্রমেই এগিয়ে আসবে না। ওরা এতদিনে বুঝতে শিখেছে যারা ওদের উপদেশ দিতে আসে তারা অনেক অনেক দূরের মানুষ, আর উপদেশ দেওয়াটা তাদের ফ্যাসান।

দলবল নিয়ে শকত্‌সিংহের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল মিসেস অটল। ঘরির দিকে তাকিয়ে দেখল বারটা বাজতে আর দেরী নেই।

উঁচু সমাজের মহিলারের দেখে শকত্‌সিংহের স্ত্রী এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল।

মিসেস অটল জিজ্ঞেস করল, আপনার স্বামী বাড়িতে আছেন?

স্নানে গেছেন, এখুনি আসবেন। বসুন।

উনি কি করেন?

গাঁয়ের পাঠশালায় মাস্টারী করেন।

আজ বুঝি ছুটি?

না। এমনি সময়ে স্কুলে যান রোজই।

এখনতো অনেক বেলা। স্কুলে পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা একটা বাজবে নিশ্চয়ই।

উপায় নেই বাঈ। জমিজমা দেখা শোনা, প্রাইভেট পড়ান এসব শেষ করে সংসারের আরও অনেক কাজ করতে হয়। বাড়িতে ছেলে মেয়েদের অসুখও লেগেই থাকে। তারজন্য ছুটতে হয় হাসপাতালে। এসব করে পাঠশালায় এর আগে আর যাওয়া হয়ে ওঠে না।

মিসেস অটল দম ধরে বসে রইল।

সঙ্গিনী লজ্জমবাঈ বলল, অসুখ বিসুখ এত হয় কেন?

ভগবান বলতে পারেন। কার অসুখ হয় না বাঈ। আপনারা শহরে থাকেন ভাল ভাল ডাক্তার আছে চিকিৎসা হয়, আর আমাদের ভরসা ঐ হাসপাতাল। তাও রোজ দিন ডাক্তার থাকে না।

তাহলে চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা নেই বলতে চান?

ব্যবস্থা সবই আছে। ডাক্তার আছে, নার্স আছে, বেড আছে, চাকর বাকর সবই আছে। কিন্তু একটি জিনিস নেই বাঈ। সে জিনিসটারই বেশি দরকার।

কি নেই ?

নেই ওষুধ। ডাক্তার তো মন্ত্র দিয়ে রোগ সারায় না। ওষুধ দিতে হয়। হাসপাতালে সেই বস্তুটিই থাকে না। যা থাকে তাতে কোন কাজ হয় না। ডাক্তার বলে, ওষুধ আসল নয় ভেজাল।

আশ্চর্য !

সবই তাই। আমার স্বামী অনেক বেলায় স্কুলে যায় তাই আশ্চর্য মনে হয়। ওটা হল দুপুরে ঘুমোবার স্থান। সারাদিন কাজ করে বিশ্রাম করার জায়গা। যে বেতন দেওয়া হয় আমার স্বামীকে, তার দ্বিগুণ বেতন পায় আপনাদের অমাত্যদের বেয়ারারা। তাই-ই পাঠশালায় যা পড়ান হয় তাতে ছেলেরা মানুষ হয় না বাঈ। ওরাই ভবিষ্যতে হয়ত অমাত্যদের বেয়ারার চাকরি পেলে মাস্টার মশাইদের মুখে সিগারেটের ধোঁয়া দেবে। সময় থাকতে তাই সাবধান হয়ে চলেন মাস্টার মশাইরা।

মিসেস অটলের সমাজ সেবার প্রোগ্রাম বানচাল হবার উপক্রম।

জিপ হাঁকিয়ে ফিরে গেল শহরে।

নিবেদন করল অমাত্য পরিষদকে। অমাত্যদের ঠোঁটে মৃদু হাসি। ঘাবড়ে গেল মিসেস অটল। সরকারী জিপ আর অর্থ দিয়ে সমাজ সেবার চেষ্টা যে নিরর্থক তা বুঝতে মোটেই দেরী হল না।

আসল প্রশ্ন হল কাজ চাই, টাকা চাই।

দারিদ্র্য থেকে মুক্তি চাই। দারিদ্র্যমুক্তি ঘটলে তবেই হবে দেশের উন্নতি।

মিসেস অটল মহিলা সমিতির মিটিং-এ আজকাল আর যায় না। কেমন যেন অন্যমনস্ক।

নির্বাচনের সময় সব প্রশ্ন তুলে ধরল বিরুদ্ধ পক্ষ।

ছড়া বাঁধল :

হাসপাতাল আছে ওষুধ নাই

ইস্কুল আছে পড়ানো নাই ;

গণ আছে তন্ত্র নাই

এদের ভোট দিও ভাই।

বাস্! এবার ছড়ার ছড়াছড়ি। দেওয়ালে দেওয়ালে কেচ্ছা আর কুৎসা।

কেউ কম নয়।

ডিসগ্রেস পার্টি ছড়া বাঁধল :

দেশের শত্রু কারা ?

আরসুলার সাগরেদরা।

মানবদল ছড়া ছড়ালো :

গুণ্ডামি আর রাণ্ডিবাজী যদি রাখতে চাও,

ডিসগ্রেস পার্টিকে এবার তোমরা ভোট দাও।

এবারের নির্বাচনের ট্যাক্‌টিস্ আলাদা। ঘটনার চেয়ে রটনার দিকে লক্ষ্য বেশি। সরকারী উপদেশ 'গুজবে কান দিও না' ব্যর্থ হল এবার। গুজব ছড়ালো চারিদিকে। ডিসগ্রেস পার্টির সরকার যেমন গুজব ছড়িয়ে বানচাল করেছিল রেলের ধর্মঘট, তেমনি গুজব ছড়িয়ে দিতে থাকে উভয়পক্ষ। শিক্ষাগুরু ডিসগ্রেস পার্টিকে হার মানালো অন্যান্য দল উপদল।

সভায় সভায় বক্তারা নিজেদের বক্তব্য বলতে গলদঘর্ম। শ্রোতার দলও অস্থির।

একাক্ষিবাবু চক্কর দিচ্ছেন পাতনরাজ্যের সর্বত্র।

ডিসগ্রেস পার্টির সভাপতি কেশবিরহী লিঙ্গস্বামীও ছুটছে। পেছন পেছন ছুটছে অমাত্যের দল। ছোট বড় নেতাদের ছোটাছুটি চারিদিকে।

বাদশাপুরে একাক্ষিবাবু বলল, যদি ব্রজবুলিকে পাতনের রাষ্ট্র-ভাষা করতে চাও, যদি গো হত্যা বন্ধ করতে চাও, তা হলে ডিসগ্রেস পার্টিকে ভোট দাও। আমাদের এই ডিসগ্রেস পার্টিই সমাজবাদ

স্থাপনের পথে এগিয়ে চলেছে। তারই নমুনা হল মিশ্র অর্থনীতি। কেউ যাতে বঞ্চিত না হয় তার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি।

অবন্তিকায় এসে একাক্ষিবাবু বলল, রাক্ষস-মানব ভাই ভাই। রাক্ষসদের রীতিনীতি ধর্মব্যবস্থার কোথাও কোন বিঘ্ন থাকবে না যদি তারা ডিসগ্রেস পার্টিকে ভোট দেয়। অন্য দল ক্ষমতায় এলে তারা রাক্ষসদের বিতাড়ন করবে পাতন থেকে। তার পরিণাম কি তাতো আপনারা জানেন।

খোটাই রাজ্যে বলল, ব্রজবুলিকে যে আমরা শুধু সর্ব পাতনীয় রাষ্ট্রভাষা করেছি, তা নয়। আমরা খোটাই দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্যও লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বেকার খোটাইদের পাঠিয়ে দিয়েছি জখমে আর পূর্বায়তনে। সেখান থেকে বছরে তিরিশ কোটি টাকা মণি অর্ডার আসছে আপনাদের দেশে। যদি ডিসগ্রেস পার্টি ক্ষমতা হারায় তা হলে এই টাকা আসার পথ বন্ধ হয়ে আপনাদের সমূহ ক্ষতি হবে।

ওড্রদেশে একাক্ষিবাবুর অন্য সুর।

পূর্বায়তন আর ওড্রদেশ কালচারের দিক থেকে ভাই ভাই। ওড্র সাহিত্যের উন্নতি কামনা আমরা করি। পূর্বায়তনের দরজা ওড্র-বাসীদের জন্য খুলে রেখেছি। জীবিকার চেষ্টা করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। আপনাদের ওড্রদেশে পূর্বায়তন থেকে মাসে বার কোটি টাকা মণিঅর্ডার আসছে। আপনারা নিশ্চয়ই এই টাকা চান। যদি তা চান তা হলে অবশ্যই ডিসগ্রেস পার্টিকে ভোট দেবেন। আমরা আশা করছি আপনারা এ বিষয়ে কোনরূপ ভুল করবেন না।

একাক্ষিবাবু ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক অঙ্গরাজ্য থেকে অন্য অঙ্গরাজ্যে ছুটছে জয় সুনিশ্চিত করতে। পূর্বায়তনেও সভায় সভায় ভাষণ দিচ্ছে।

এই রেসের ঘোড়া হোঁচট খেল পূর্বায়তনে এসে।

একাক্ষিবাবুর সভায় ঢিল পড়ল। একাক্ষিবাবুর কপাল ফাটল। সর্বনাশ!

এত বড় শক্তিশালী একাক্ষিবাবুর রক্তপাত!

যদি রাষ্ট্রপতির নিধন ঘটত তাহলেও মানুষ এত আশ্চর্য হত না। একাক্ষিবাবুর ভাগ্য তখন রাহুভারাক্রান্ত। মুষ্টিযোগ ব্যর্থ হল। দলের নণ্টা-মণ্টা-শণ্টা আর সাহস করে শোধ নিতে এগিয়ে এল না।

মুখ ভার করে ফিরে এল একাক্ষিবাবু। তার জনসমাজের সার্বভৌমত্ব তুচ্ছ হল চোরকাটার সভায়। নিরুপায় একাক্ষিবাবুকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল পুলিশবাহিনী। পরবর্তী সভাগুলোতে একাক্ষিবাবু পুলিশ পাহারায় ভাষণ দিল। শ্রোতা না থাকলেও ডিসগ্রেস পার্টির পদলেহী সংবাদপত্র ফলাও করে সে সংবাদ পরিবেশন করল। যারা ঘটনার সঙ্গে পরিচিত তারা মুচকি হেসে কাগজের পাতা উল্টে রাখল।

এবারের নির্বাচন মোটেই নিরাপদ নয়। একপক্ষ একটা বোমা মারলে অপর পক্ষ দুটো মারল। বাঘা বাঘা বোমারুর ঘরে বোমা পড়তে থাকে মাঝে মাঝেই।

সন্ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি হল সর্বত্র।

নেতারা শান্তির মন্ত্র জপ করছে। চেলারা অশান্তিকে জিইয়ে রাখছে। কেউ দল ছেড়ে নতুন দল গড়ছে, কেউ পুরানো দলের নতুন সদস্য হয়ে নির্বাচনে নেমেছে। তখনও ভাগ্যফল অনিশ্চিত।

শীতের বেলা কাটে। দিন পেরিয়ে যায় অলক্ষ্যে।

খরার তাপে শুকিয়ে গেছে মাঠ। চাষীর মুখে হাসি নেই। আগামী বৎসর যে দুর্বৎসর সে বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ রইল না।

নির্বাচনের জিপ ঘুরছে পথে পথে, মাঠে ঘাটে।

আগামী দিনের জন্য খাদ্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে সবাই; সবাই

বলছে আমাকে ভোট দাও, আমি তোমাদের সব সমস্যা মিটিয়ে দেব। শুধু ভোট চাই।

সরকার পক্ষ সরকারের সব সম্পদকে বে-আইনীভাবে ব্যবহার করছে ভোটের ক্যানভাসে। কেউ বেরিয়েছে জেলা পরিষদের জিপ নিয়ে, কেউ বেরিয়েছে স্কুলবোর্ডের গাড়ি নিয়ে—সবাই সরকারী আধা সরকারী খরচে শাসক পার্টির পক্ষে ভোট ক্যানভাস্ করছে।

বাদ প্রতিবাদ শোনার কেউ নেই।

সরকার পক্ষ ভালভাবেই জানে তারা আবার ক্ষমতায় আসবে। তাদের দুর্নীতির কৈফিয়ত দিতে হবে না কাউকেই। তাই ভোটের জন্য সব কিছু সরকারী সম্পদ ব্যবহার করার অলিখিত অবাধ অধিকার দিয়েছে শাসক পক্ষ।

এগিয়ে এল নির্বাচনের দিন।

ডিসগ্রেস পার্টির শেষ অস্ত্র গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের শীর্ষে বসে আছে ডিসগ্রেস পার্টির মনোনীত ব্যক্তিরাই। জনসাধারণ অজ্ঞ, ভোট সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই তাদের। মুখিয়া যেমন বলবে তেমনি ভাবেই ভোট দেবে ঐসব ভোটাররা। তাই অর্থের চালান গেল মুখিয়াদের হাতে। রাতারাতি ভাগ বাঁটোয়ারাও হয়ে গেল। সকাল বেলায় ভোটারদের লাইন করে দাঁড় করাবার দায়িত্ব নিল মুখিয়ারা।

রাজধানীতে আর অমাত্যরা বসতে পারছে না। যতই নির্বচনের দিন এগিয়ে আসছে ততই তাদের মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। তারা ছুটে গেছে নিজ নিজ নির্বাচন এলাকায়। যেখানে যেমন প্রয়োজন মুখরোচক করে শুনিয়ে চলেছে তাদের ফানুস ফোলানো প্রতিশ্রুতি-গুলো।

শহরে গ্রামে সর্বত্র উত্তেজনা ও উত্তাপ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আশঙ্কা দেখা দিল নির্বাচন পর্ব নির্বিঘ্ন হতে পারবে কিনা, ভোটদাতারা নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরতে পারবে কিনা!

সব আশঙ্কা উত্তেজনার শেষ হল নির্বাচন দিনে।

গড়ে শতকরা চল্লিশ জন ভোটার ভোট দিয়ে গেল নির্বাচন কেন্দ্রে এসে।

সন্ধ্যা নামতে না নামতে নিস্তব্ধ হয়ে গেল ভোটের চিৎকার। মাসাধিক কাল যে প্রস্তুতি চলেছিল, যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটল।

এবার শুধু কর্মী ও সহানুভূতিশীলদের মনের কোনায় উঁকি দিচ্ছে, কি হয় কি হয় ভাব! তদপেক্ষা আরও চিন্তিত নির্বাচন প্রার্থীরা। তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার যে প্রদীপ টিম টিম করে জ্বলছিল এতকাল আর দুটি দিন বাদে তা চিরকালের মত নির্বাপিত হবে, না হয় প্রোজ্জ্বল হবে। কিন্তু কে হবে সে ভাগ্যবান!

ইমলিপুরের সংবাদ পাওয়া গেল সবার আগে।

ডিসগ্রেস পার্টির পতন ঘটল বিনা আড়ম্বরে। ইমলিপুরের মানুষ পাতন রাজধানী বিরোধী, বিশেষ করে ব্রজবুলিকে তারা গ্রহণ করতে রাজি নয়। উপরন্তু তারা ফতোয়া দিল আমরা পাতনী নই, আমরা একটা বিশেষ ভাষাভাষী আলাদা জাতি। আমাদের স্বাতন্ত্র্য চাই, আমরা ব্রজবুলি সাম্রাজ্যবাদের অবসান চাই।

ডিসগ্রেস পার্টির সমাজবাদ, ঐক্য আর সংহতির বুলি চাপা পড়ে গেল স্বাতন্ত্র্যের ফতোয়াতে। ভোটের বাক্স খুলে দেখা গেল ডিসগ্রেস পার্টির চির অবলুপ্তি ঘটেছে ইমলিপুর রাজ্যে।

সব চেয়ে কঠিন আঘাত পেল কেশবিরহী লিঙ্গস্বামী। ইমলিপুর তার নিজের দেশ। সেই দেশে সে নিজেও যেমন পরাজিত হয়েছে তেমনি নির্মূল হয়েছে তার ডিসগ্রেস পার্টিও। মনের বেদনায় কেশবিরহী ডিসগ্রেস পার্টির সভাপতির পদে ইস্তাফা দিয়ে আত্মগোপন করল যবনিকার অন্তরালে।

পরবর্তী সংবাদ এল নর্মচর থেকে।

সেলাম পার্টি দখল করেছে মসনদ। বহুদিনের ক্লান্তিহীন

প্রচেষ্টায় ফললাভ করেছে নর্মচরের মানুষ। তারা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলছে, বাঁচলাম।

পাতন রাজ্যের রাজধানীতে তখন হাহাকার। গেল-গেল রব উঠল প্রসাশকদের ঘরে ঘরে। এভাবে অঙ্গরাজ্যের পর অঙ্গরাজ্যের পতন ঘটলে তাদের সমাজবাদের আদর্শ চিরসমাধি লাভ করবে। আরসুলা যুদ্ধে যে পরাজয় ঘটেছিল তার চেয়েও ভয়ঙ্কর এ পরাজয়। আরসুলারা পরদেশী কিন্তু নর্মচররা স্বদেশী। স্বদেশে সেলাম পার্টিকে স্থান করতে দেওয়ার অর্থ হল ডিসগ্রেস পার্টি তথা গণতন্ত্রের অপমৃত্যু।

বাদশাপুরের ওপরে ভরসা করেছিল প্রশাসকরা, সেখানেও পরাজয়। কেন্দ্র তখন টলমল।

মধ্যভূক্তি আর পূর্বায়তন কঠিন আঘাত দিল ডিসগ্রেস পার্টিকে। আর শেষ আঘাত দিল দিল বেণীধ্বজ।

হিসাব করতে বসল প্রশাসকরা।

পাতন রাজ্যের কেন্দ্রীয় আইন মজলিসে ডিসগ্রেস পার্টির সংখ্যাধিক্য বজায় আছে তখনও। অর্থাৎ আরও পাঁচটি বছর পাতন রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব থাকবে তাদেরই হাতে। আর কেন্দ্রের ক্ষমতা যদি আরও কেন্দ্রীভুত করা যায় তা হলে অঙ্গরাজ্যগুলো মসনদ থেকে তাদের নামাতে পারবে না কোনক্রমেই। কিন্তু!

নির্বাচনে পতন ঘটেছে বহু অমাত্যের, তিনপোয়া ও অর্ধ অমাত্যেদেরও একই অবস্থা। নতুন করে অমাত্য পরিষদ গঠন করতে হলে পুরাতন মুখ আর বেশি দেখা যাবে না।

এখন অমাত্য পরিষদ গঠন করাই হল প্রথম কাজ।

কিন্তু সেখানেও কোন স্থিরতা নেই। উপদলীয় কোঁদলে মেতে উঠল ডিসগ্রেস পার্টির সদস্যরা। কে হবে মহামাত্য তাই নিয়ে মতান্তর।

এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে গেল একাক্ষিবাবু। তারও পতন

ঘটেছে নির্বাচনে। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে সে তখন নিজেই অর্ধমৃত। দেহে শক্তি সঞ্চার করতে একাক্ষিবাবু গৃহ ছেড়ে রাজধানীর রাজনীতিতে জড়িয়ে নিল নিজেকে।

লোক হাসল। বিরুদ্ধপক্ষ টিটকারী দিল। দুনিয়ার মানুষ এই প্রহসনের পরিণাম দেখতে চেয়ে রইল পাতনের দিকে। অবশেষে মীমাংসা হল এক নতুন পদ সৃষ্টি করে। একজনকে সর্বক্ষমতা দিল না ডিসগ্রেস পার্টির শক্ত কর্তারা। মহামাত্যের পেছনে জুড়ে দিল অন্য একজন উপমহামাত্য।

এই তো রাজনীতির খেলা।

এই খেলায় যারা জিতল তাদের উৎসব হল স্মরণীয়।

প্রতিদিন যখনই ডিসগ্রেস পার্টির পতনের সংবাদ এসে পৌঁছয় অঙ্গরাজ্যের রাজধানীতে, তখনই উৎসবে মেতে ওঠে জনসাধারণ। আর এতদিনের প্রশাসকদের যারা সমর্থক তারা ধীরে ধীরে দেয়ালের ওপারে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। বিরুদ্ধ পক্ষ বিদ্রূপ করে বলে, ওরা বিবরে আশ্রয় নিচ্ছে। বিষধর সর্পের বিষদন্ত উৎপাটন করা হয়েছে, এখন বিষহীন সর্পকুল বিবরে প্রবেশ না করলে বাঁচার আর দ্বিতীয় আশ্রয় নেই।

খবরগুলো একে একে পাতনের রাজধানীতে পৌঁছয়।

প্রাক্তন প্রশাসকদের তাঁবেদার সংবাদপত্রগুলো তখনও সুর ভাঁজছে। তারা প্রভু পরিবর্তন সহ্য করতে রাজি নয়, সুযোগ খুঁজছে ছোবল মারার। নতুন প্রশাসকদের কি করে ঘায়েল করা সম্ভব তারই চিন্তায় সলা পরামর্শ চলছে। বিবরে বসে বসেই তখন তৈরী হচ্ছে কাজের ফর্মুলা। পাতনের কেন্দ্রীয় শাসকরাও তখন সচেষ্ট অ-ডিসগ্রেসীদের হঠিয়ে দিতে। তারই ফর্মুলা গোপনে স্থির করছে, প্রশাসক, কায়েমীস্বার্থের বাহক ও ধারকেরা। সঙ্গে আছে বিদেশী দূতাবাসের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র। যেমন করেই হোক হঠিয়ে দিতে হবে এইসব আঠার দলের অঙ্গরাজ্যের সরকারকে।

ফর্মুলার প্রথম অঙ্ক : দেশে খাদ্যের অভাব রয়েছে। বিরুদ্ধপক্ষ প্রধান যে সব অঙ্গরাজ্যে, সেখানে খাদ্য সরবরাহের কমতি কর। তাহলেই জনপ্রিয়তা হারাবে তারা।

ফর্মুলার দ্বিতীয় অঙ্ক : কেন্দ্রীয় সাহায্য কমিয়ে দাও। যেটুকু দেবে তা সময় মত দিও না। তাহলেই ওরা আর কোন কাজ দেখাতে পারবে না।

ফর্মুলার তৃতীয় অঙ্ক : প্রচার যন্ত্রগুলো প্রখর কর। তা হলে জনমনে ধীরে ধীরে বিরূপ মনোভাব দেখা দেবে। মানসিক পরিবর্তন ঘটবে।

ফর্মুলার চতুর্থ অঙ্ক : রাজ্যপ্রমুখদের বিশেষ উপদেশ দাও যাতে আঠার দলে ভাঙ্গন ধরাতে পারে।

ফর্মুলার পঞ্চম অঙ্ক : অঢেল টাকা দাও আঠার দলের লোভী সদস্যদের। তাদের টেনে নাও নিজের দলের বেনামে। তারপর সুযোগ বুঝে ভেঙ্গে দাও আঠার দলের সরকার।

ফর্মুলা তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ হল।

কেন্দ্র আর অঙ্গরাজ্যের বিরোধ দেখা দিল।

প্রচার যন্ত্রগুলো মুখর হল নতুন সরকারের ত্রুটিগুলো চোখের সামনে তুলে ধরতে।

সবচেয়ে কার্যকরী ফললাভ হল খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে আর সেই সঙ্গে লোভী সদস্যদের রাতারাতি প্রচুর অর্থ দিয়ে বশীভূত করে দলত্যাগে বাধ্য করে।

রাতারাতি ভেঙ্গে গেল আঠার দলের সরকার। দলত্যাগীদের নিয়ে বেনামে নতুন সরকার গঠন করল ডিসগ্রেস পার্টি।

পূর্বায়তন, খোটাই আর বেণীধ্বজে ভেঙ্গে গেল সরকার। ইমলিপুর আর নর্মচরে এগোতে পারল না সংগঠনের অভাবে। বাদশাপুরও শেষ পর্যন্ত ডিসগ্রেস পার্টির চক্রান্তের বলী হল। সেখানেও ভেঙ্গে গেল আঠার দলের সরকার।

এত সহজে কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটেনি।

পূর্বায়তনে গোবিন্দপুরের ময়দানে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক শপথ গ্রহণ করেছিল আঠার দলের সরকারকে সমর্থন করবে, আঠার দলের সরকারকে চালু রাখতে বুকের রক্ত দেবে।

রাতের অন্ধকারে চক্রান্তকারীরা যখন আঠার দলের সরকারকে হঠিয়ে দিয়ে গদীতে বসল তখন ক্ষিপ্ত হয়ে গেল দেশের মানুষ। বিক্ষোভে ভেঙ্গে পড়ল চোরকাটার জনসমুদ্র।

নতুন সরকারের মুখ্য অমাত্য ধ্বজাধারীবাবু আদেশ দিল পুলিশ আর সৈন্য বাহিনীকে পশুশক্তি দিয়ে বিক্ষোভ দমন করতে।

পরের দিন সকালের সংবাদ পত্র খুলেই দেশবাসী দেখল, নরনারীর তাজা রক্তে রাঙ্গা হয়েছে চোরকাটার পথঘাট, মাঠ ময়দান। মৃত্যুর সংখ্যা তখনও স্থির হয়নি, আহতের সংখ্যা অগুনতি। আর গ্রেপ্তার, তার সংখ্যাও কোনদিনই নির্দিষ্ট করে বলতে পারবে না কেউ।

আবার গোবিন্দপুরের ময়দানে জমায়েত হল লক্ষ লক্ষ মানুষ। পুলিশের গুলী আর লাঠিকে উপেক্ষা করেই তারা সমবেত হয়েছিল গোবিন্দপুরের মাঠে। আগের দিনও যারা ছিল অনুগত ভৃত্য তাদের হাতেই প্রহৃত হল সদ্য গদীচ্যুত অমাত্যবৃন্দ। সেখানেও বয়ে গেল রক্তের স্রোত।

ডিসগ্রেস পার্টি দূর থেকে হাসল, মনে মনে ভাবল, কাঁটা দিয়ে কাঁঠা ওঠাবার এর চেয়ে ভাল পথ আর বোধহয় নেই।

ধ্বজাধারী বেতারে বক্তৃতা দিল। লোকে উপহাস করল তাকে।

আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার অনুরোধ করে ধ্বজাধারী।

লোকে হেসে বলে, আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে উৎসাহ দিয়েছে স্বয়ং ধ্বজাধারীই। নিরস্ত্র মানুষকে পিটিয়ে মেরে যারা আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার স্বপ্ন দেখে তারা বাতুল। দেশের এই শৃঙ্খলা বিহীন

অবস্থার জন্য দায়ী একমাত্র সে নিজে। তাকে নামিয়ে দেওয়া হোক গদী থেকে।

রাজ্যপ্রমুখ খুবই কর্ম তৎপর।

দল ভাঙ্গার ব্যাপারে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল রাজ্য-প্রমুখ স্বয়ং। দলীয় রাজনীতিতে অযথা নাক ঢুকিয়ে জল ঘোলা করতে তার অবদানও কম নয়।

তখনও অপেক্ষা করছে ভবিষ্যত।

নতুন অমাত্যপরিষদ গদী সামলাতে ব্যস্ত। কাজের কাজ কিছুই হয় না। দপ্তরে দপ্তরে আলস্য ও ক্ষোভ। বর্তমান অমাত্যদের বিরুদ্ধে সমালোচনা। সবার মুখেই এক কথা, এরা বিশ্বাসঘাতক। তবে এদের পরমায়ুও বেশি নয়। বড় জোর মার্চ মাস অবধি। বাজেট পাশ না হলে অমাত্যপরিষদ ভেঙ্গে পড়বেই পড়বে।

সবাই প্রতীক্ষা করছে নাটকের শেষ দৃশ্য দেখতে।

এতকাল ডিসগ্রেস পার্টি ছিল অন্তরালে। ধ্বজাধারীকে কায়েমী ভাবে মসনদে বসিয়ে তারা এগিয়ে এল গদীর অংশীদার হতে।

আমরা তোমার বড় সমর্থক। আমাদের শেয়ার কোথায়?

ধ্বজাধারী বলল, অপেক্ষা কর। শীগ্‌গীরই ব্যবস্থা হবে।

বিলম্ব করতে কোন উৎসাহ দেখাল না ডিসগ্রেস গার্টিরস দস্যরা।

তাদের শান্ত করতে ধ্বজাধারী বলল, অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে আইন সভায়। সেই প্রস্তাবের বিচার শেষ হলেই নতুন মন্ত্রী নেয়া হবে।

ওদিকেও জেহাদ ঘোষণা করল বিরুদ্ধ আঠারদল।

তারা বলল, বে-আইনী এই সরকারকে গদীচ্যুত আমরা করবই করব। ওদের আইন আমরা মানি না, মানব না। ম্যাস মুভমেণ্ট চাই, তার জন্য প্রস্তুত হও দেশবাসী।

সরকারের আমলাতন্ত্র বড়ই খুশী। আঠারদলকে খুশী করতে

গিয়ে নাজেহাল হয়েছিল তারা। তাদের ঘুঘুর বাসায় সাপের ছোবল পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। আর কি সহ্য করা যায় ঐ আঠার-দলকে! আঠারদলকে ভেঙ্গে দেবার যত ফন্দী তার মস্ত বড় এক অংশীদার হল ঐ আমলাতন্ত্র। ম্যাস মুভমেণ্টকে ওরা ভয় পায় না। যবন রাজের আমলে ও রকম অনেক মুভমেণ্ট দেখেছে, কিন্তু তাদের মুভ অথবা রিমুভ করাতে পারেনি কেউ-ই। বরং যবন রাজ্য শেষ হবার পর ডিসগ্রেস পার্টিই ওদের পুষেছে দুধে-ঘিয়ে তোয়াজ করে।

ওদেরই একজন ন-চ-ভ। তারই কাছে শুনেছে তার অধঃস্তন কর্মচারীরা। ন-চ-ভ বলেছে, শালারা কি রাজ্য শাসন করবে? পাঁচ বছরের মেয়াদে চেয়ারে বসবে, কখন যে চেয়ারের পায়া ভাঙ্গবে তাই জানে না। আমাদের হল পাকা চেয়ার। পঁচিশ বছরে ট্যাফোঁ করার ক্ষমতা আছে কারও!

অবাক কাণ্ড!

অবাক নয় হে, সত্যি ঘটনা। ওরা কী আর দেশ শাসন করতে জানে। এক কথা বললে আইনের বাইশ প্যাঁচে ওদের বেঁধে ফেলব। কথা বলতে পারবে না। মানিকদের হাতের তলায় থাকতে হবে। আরে বাপু, মাঠে ময়দানে ভোটের ক্যানভাস করা আর দেশ শাসন করা কি এক কথা! তার ওপর শালাদের দল ঠিক রাখতে আমাদের অনুগ্রহ নিতেই হবে। স্বজন পরিপোষণের সুযোগ কে দেবে বাপু! সে দেব আমরাই।

এবার আর অবাক হল না অভাজনেরা। এগুলো তারা প্রত্যক্ষ করেছে এতকাল ধরে। তবুও কৌতূহলী হয়ে একজন প্রশ্ন করল, কিন্তু আঠারদলের সরকার কেন ভাঙ্গল স্যার?

কবে যে ওরা জোড়া ছিল তাই তো জানি না। যেদিন চেয়ারে বসল সেদিনই বলেছি, চেয়ার থেকে কাত হয়ে পড়ল বলে। খাবার নেই, টাকা নেই, আর নেই সহযোগিতা। আমলাদের ওরা নিন্দা করেছে এতকাল, এখন আমলারা সহযোগিতা করবে কেন! পতনের

তিন কারণ, বলতে পার ত্র্যহস্পর্শ। তারই আঘাতে কুপোকাৎ। চালাকি পেয়েছ বাছাধন! আমরা সেই যবন আমল থেকে দেশ চালাচ্ছি আর আমাদের কাজের কৈফিয়ৎ নেবে তোমরা? হুঁ, কেমন মজা। পিটিয়েছে শালাদের ভাল করেই। এতেও যদি আক্কেল হয়।

নতুন অমাত্যদের কথা বলুন স্যার। সবাই যে ওদের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে ঐ ছ্যাঁচড়া কেরানীরা।

আহা ওদের দোষ নেই। আঠারদলের শালারা ওদের অনেক সুবিধে করে দিয়েছে। ওদের ভয় আবার যদি ডিসগ্রেস পার্টি এসে সুবিধাগুলো কেড়ে নেয়। তাই নতুন সরকারকে সহ্য করতে পারছে না কেউ। এটা ওদের দোষ নয়। এটা হল স্বার্থের দ্বন্দ্ব। তবে এদের পরমায়ুও খুব বেশি দিন নয়।

তাহলে!

আমাদের একচেটিয়া রাজত্ব। যবন আমলে যেমন ছিলাম ঠিক তেমনটা। আমরা যা বলব তাই হবে আইন।

কিন্তু রাজ্যপ্রমুখ!

তোমরা কিছুই বোঝ না। রাজ্যপ্রমুখ ফিতে কাটবে, ভাষণ দেবে, বাণী দেবে। ছুটবে টাট্টুঘোড়ার মত। কাজ করবে কদলীর অগ্র, তাকেও আমাদের হাতের তলায় থাকতে হবে। দেখছ না, নতুন সরকার এখন গদী সামলাতে ব্যস্ত, কাজ কি হচ্ছে কিছু? ফাইলের পর ফাইল চাপা থাকছে। দম বন্ধ হচ্ছে কেরানীদের। ফাইল দেখার অবসর অবধি পাচ্ছে না কেউ। সাধারণ শাসন ব্যবস্থাই অচল হয়ে এসেছে, অন্য পরে কা কথা।

পারিষদ ও অনুগ্রহপ্রার্থীরা খুশী হল এই অমৃতকাণ্ডের সারাংশ শুনে।

নিবেদিতা নাগ ছিল কোন অমাত্যের একান্ত সচিব। চেয়ারে

কেউ পেত না তাকে। অমাত্যও বিশেষ আগ্রহী ছিল না তার জন্য। কিন্তু আগ্রহী ছিল উপসচিবদের একজন। নিবেদিতার যাতায়াত ছিল কয়েকটা বিশেষ বিশেষ স্থানে। আর সে সব স্থানগুলো নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল উপসচিব মশায় নিজে। বাহ্যত উপসচিব হলেও মূলত সচিব মশায়ই তাকে ডিরেকশন দিত। সচিবের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ ছিল না কোন সময়েই।

বিশেষ বিশেষ তারিখে সকাল বেলায় নিবেদিতা নাগকে দেখা যেত শহরের বিশিষ্ট পল্লীর একটা ছ' তলা বাড়ির বিশেষ কক্ষে। সেখানে এসে মিলিত হত রাম আহির আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা, দেখা করতে আসত মিস্টার আর মিসেস ফ্যালকন।

মিস্টার ফ্যালকন বলল, আমরা চাই বিজিনেস আর ট্রেড। যদি বিজিনেস আর ট্রেড সিকিওরড না হয় তা হলে আমরা ব্যবসার ধান্দা তুলে নিয়ে যাব এদেশ থেকে। মোটা হাতে যে চাঁদা দিয়ে এসেছি তোমাদের, তা আর দিতে পারব না।

রাম আহির হাসতে হাসতে বলল, সব সমস্যা জল করে দেব। টাকাটা একটু বেশী খরচ হবে। শিয়ালিয়া কোম্পানী কয়েক লাখ দেবে বলেছে, আর কয়েক লাখ তোমরা দাও। স্বদেশী আর বিদেশী বণিকদের স্বার্থ কেমন করে বজায় রাখতে হয় তা আমি দেখিয়ে দেব। আসল প্রয়োজন টাকা।

মিসেস ফ্যালকন ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে চেক খাতা তুলে দিল স্বামীর হাতে। সেলফ চেকে টাকার অঙ্ক লিখতে লিখতে ফ্যালকন বলল, তোমার ওপর ভরসা রাখি রাম আহির। দুদশ লাখ কিছু নয়, কাজ হাসিল হওয়া চাই।

রাম আহির আবার হেসে বলল, নাইন ডেজ্ সাইট।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল মিস্টার আর মিসেস ফ্যালকন।

রাম আহির নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে বলল, এবার তোমার মোহিনী বিদ্যার খেল্ দেখাও যাদু।

ভগবান ভরসা। তালিকাটা তৈরী করেছ কি ?

নিশ্চয়। এই নাও তালিকা। রোজ একটা করে টারগেট করবে। একটা শেষ হলে আরেকটা। খুব বড় জাল ফেলতে চেষ্টা কর না। মাছ জাল ছিঁড়ে পালাতে পারে। রাতের বেলায় রিপোর্ট চাই।

নিবেদিতার হাতে কয়েক হাজার টাকা তুলে দিয়ে রাম আহির সাগ্রহে নিবেদিতার কণ্ঠে চুম্বন করল। রুমালে মুখ ঘষে নিয়ে নিবেদিতা বেরিয়ে পড়ল তার কাজে।

দু'দিন নিবেদিতার দেখা নেই।

তৃতীয় দিনের সন্ধ্যে বেলায় নিবেদিতা তার দলবল নিয়ে হাজির হল রাম আহিরের ঘরে। সাদরে বসতে দিল রাম আহির। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তার চোখে।

ইনি হলেন করমচাঁদ। আইন সভার সদস্য। সরকারী দলের খুব অনুরাগী। আর ইনি হলেন মিঞামহম্মদ। আমার পুরানো বন্ধু তথা সরকারীদলের সদস্য। আর ঐ যে পেছনে বসে আছেন, ওঁকে আপনি বোধহয় ভাল করেই চেনেন। উনি আপনার ডাক শোনার অপেক্ষা করছিলেন।

রাম আহির গুনে দেখলেন তিন।

নিবেদিতা পাশের দুটো মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, এই দু' জন হল শ্যামলী মুখার্জী আর বেলা সরকার। চাকরির উমেদারী করছিল। ডেকে আনলাম আপনার কাছে। এরা খুব ভাল কর্মী। এদেরও কোন একটা কাজে লাগালে ভাল হয়।

অতঃপর খানা পিনা।

তারপরই প্রস্তাব।

প্রস্তাবটা শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল তিনজনেই। সম্মতি দিতেই এসেছে তারা। শুধু প্রস্তাব আসার অপেক্ষা।

প্রস্তাব শুনে মিঞামহম্মদ বলল, আমরা কি পাব ?

এখন নগদে সত্তর হাজার। নতুন অমাত্য পরিষদে কমপক্ষে আধা অমাত্যের পদ।

কথা বেঠিক হবে না তো?

না, বেঠিক হবে না, আপনাদের সহযোগিতা পাব কিনা তাই বলুন?

নিশ্চিত পাবেন। আমাদেরও কথার খেলাপ হবে না।

পঁচিশ হাজার করে আজ দিচ্ছি। আঠার দল ভাঙ্গলে বাঁকি পঁয়তাল্লিশ।

মোটামুটি রাজি হল সবাই।

নগদ কড়ি গুণে তুলল পকেটে।

রাম আহির কোন নীতি বা আদর্শের কথা বলল না। সে জানে দুর্বল চিত্তের মানুষকে জয় করতে টাকাই হল একমাত্র অস্ত্র।

মিঞা মহম্মদ উঠে যাবার সময় বেলা সরকারের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। করমচাঁদের সঙ্গে গেল শ্যামলী মুখার্জী। বাকি নটবর চন্দ্র বোধহয় নিবেদিতার পানি ধারণের স্বপ্ন দেখছিল। নিবেদিতা কোন আগ্রহ না দেখানোতে ধীরে ধীরে সেও উঠল। নমস্কার করে নেমে গেল নীচে।

রাম আহির জিজ্ঞেস করল, নটবরের জন্য একটা মেয়ের ব্যবস্থা করতে পারলে না নিবেদিতা?

সময় পেলাম না। বেয়ারাকে পাঠিয়েছিলাম একটা বিশেষ পাড়ায়। সহসা সাহস করে ওরা ভদ্রপল্লীতে আসতে চায় না। ওদের ট্রেনিং দিতে দিতে আমি নাজেহাল হয়ে গেছি। এবার তুমিও কটা মেয়ের খোঁজ রেখ। আমিও আনব। কম পক্ষে সাত আটজন তো দরকার।

রাম আহির ফোন তুলে ডাকল কোন ব্যক্তিকে।

হ্যাঁ, চারজন পাঁচজন হলেই হবে। ডাকা মাত্র আমার এই বাড়িতে আসবে। টাকা যা চায় তা দিতে আমি রাজি। কাজ

হাসিল করাই বড় কথা। তবে ট্রেনিং না নিলে তারা সামলে চলতে পারবে কেন। কালকে এই সময় পাঠিয়ে দিও। আচ্ছা!

তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না নিবেদিতা। আমি ব্যবস্থা করলাম, বলল রাম আহির।

আমার প্রাপ্য! মৃদুস্বরে বলল নিবেদিতা।

তোমার প্রাপ্য তো সবই। আমি নিজেকেই তো দিয়ে রেখেছি তোমাকে। এর বেশি কি চাও?

নিবেদিতা হাসল।

বলতে পারল না, আজ যে কাজে সে নেমেছে তার পেছনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই, যৌন অভিলাষও নেই, আছে শুধু টাকার মায়া। টাকার আকর্ষণেই রাম আহিরের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে বহুবার। টাকার আকর্ষণেই নিবেদিতা নিজেকে নিবেদন করেছে দেশের অমঙ্গল সাধনে।

অনেক রাতে চোখ লাল অবস্থায় নিবেদিতা যখন গাড়িতে উঠল তখন তার ভ্যানিটি ব্যাগে আর টাকা রাখার স্থান ছিল না।

নেপথ্যের এই ঘটনা তো অলীক নয়, বাস্তব। বাস্তবের ধাক্কায় এখানে আঠার দলে ভাঙ্গন ধরল। তার হোতা রাম আহির, আর তাকে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করেছিল নিবেদিতা নাগ।

কিন্তু ধ্বজাধারী মসনদে বসে রাম আহিরকে ডাকল না অমাত্য পরিষদ গঠনের মন্ত্রণায়।

মিঞা মহম্মদ, নটবর চন্দ্র আর করমচাঁদ হামলা করল রাম আহিরের বাড়িতে।

সবাই প্রশ্ন করল, আমরাই আঠারো দলকে কুপোকাৎ করে দিলাম, আর অমাত্য হল কিনা যদো-মধো। আমাদের একবার ডাকলও না ধ্বজাধারী।

অপমানে রাম আহিরের মুখ চোখ লাল।

বলল, আমি দেখছি।

আর কবে দেখবেন, ওদিকে আইন সভার অধিবেশন এসে গেছে। তার আগেই দেখতে হবে, নইলে উল্টো ভোট দেব আমরা।

তাও ভাল। তবুও শেষ চেষ্টা করে দেখব।

রাম আহির মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে। ডেকে পাঠাল নিবেদিতাকে। সারা রাত অবধি সলা পরামর্শ চলল কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারল না। সকাল বেলায় উঠেই ফোন করল ধ্বজাধারীকে।

আমি রাম আহির বলছি। আপনার মসনদ প্রাপ্তি আমার দয়াতে, অথচ অমাত্য পরিষদ গঠন করতে আমার সঙ্গে একবার পরামর্শও করলেন না।

আপনার দয়াতে! বিস্ময় প্রকাশ করে উত্তর দিল ধ্বজাধারী।

হ্যাঁ। লক্ষ লক্ষ টাকা আমিই ব্যয় করেছি। দল ভাঙ্গিয়েছি।

অনেকেই অমন কথা বলে। আমাকে মূখ্য অমাত্য করেছেন রাজ্যপ্রমুখ।

বিস্মিত হল রাম আহির।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্রোধে ফেটে পড়ল রাম আহির। চিৎকার করে বলল, যেমন করে আঠার দল ভেঙ্গেছি তেমনি করে আপনার দলও ভেঙ্গে দেব। সে ক্ষমতা আমার আছে।

শোনা গেল ব্যঙ্গ হাসি।

ফোন ছেড়ে দিয়েছে ধ্বজাধারী। আক্রোশে কাঁপতে আরম্ভ করেছে রাম আহির।

ধ্বজাধারীও বোকা লোক নয়। সেও তখনই যোগাযোগ করল, ডিসগ্রেস পার্টির সঙ্গে।

রাম আহির ফোন করল পাতনের রাজধানীতে।

মহামাত্য নেই। উপমহামাত্য ফোন ধরল। শুনল সব কথা মন দিয়ে। তারপর বলল, ঘটনার গতিতে নজর রাখুন। সময় মত ব্যবস্থা আমরা করব। তবে নিরাশ হবেন না। ধ্বজাধারী

হল আমাদের ঢোলের বাঁয়া। যেমন বাজাব তেমনি বাজবে। ধৈর্য ধরুন।

আইন সভার অধিবেশন বসল।

ধ্বজাধারী তার অমাত্যদের নিয়ে বসল ট্রেজারী বেঞ্চে। বিপরীত দিকে বসল আঠার দলের সদস্যরা। অমাত্যদের সমর্থকরা বসল অমাত্যদের পাশে। সবাই নতুন কিছুর প্রতীক্ষা করছে। সবাই আশঙ্কা করছে কোন অঘটন আজ ঘটবেই। হয়ত মারামারি বা দাঙ্গা। কিন্তু সবাইকে হকচকিয়ে দিয়ে অধ্যক্ষ ঘোষণা করলেন, অধিবেশন মুলতুবী থাকল। কেন না এই অমাত্য পরিষদই বে-আইনী পরিষদ।

হৈ হৈ কাণ্ড। অধ্যক্ষ বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। বিশেষ দলের লোক সে। তাকে উৎখাত কর। একাক্ষিবাবু এতদিন সম্মুখ সমরে আসেনি। এবার তার দল সক্রিয় হল। অধ্যক্ষের দরজায় বোমা পড়ল।

ধ্বজাধারী তার স্বরূপ ধারণ করল আবার। আবার চলল জনতার ওপর নিপীড়ন আর গ্রেপ্তার। জোয়ান ছেলেরা আর রাস্তায় বের হয় না। সদাই আতঙ্ক। ডিসগ্রেস পার্টির সদস্যরা বিবর থেকে বেরিয়ে এসেছে আবার। তাদের অঙ্গুলি হেলনেই পীড়ন চলছে সর্বত্র।

রাম আহির বসে ছিল না।

হঠাৎ একদিন রাজ্যপ্রমুখের সঙ্গে দেখা করে বলল, আমার দল সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমাকে অমাত্য পরিষদ গঠন করতে দিন। ধ্বজাধারীকে দূর করে দিন।

রাজ্যপ্রমুখের ভূমিকা যে কত অরুচিকর তা সেদিনই প্রথম বুঝতে পারল পূর্বায়তনের রাজ্যপ্রমুখ। রাম আহিরের দাবী স্বীকার করল না অথচ কিছুকাল আগে ধ্বজাধারীর দাবী স্বীকার করে আঠার দলের অমাত্য পরিষদ ভেঙ্গে দিয়েছিল। লোকে আশ্চর্য হল না।

কেন না ডিসগ্রেস পার্টিকে ক্ষমতায় বসাতে রাজ্যপ্রমুখের ভূমিকা মোটেই নিরপেক্ষ নয় বলেই লোকে বিশ্বাস করেছিল।

সামনে বাজেট সেসন।

বাজেট পাশ না হলে রাজ্য পরিচালনা আইন সম্মত নয়।

চিন্তায় পড়ল ধ্বজাধারী।

ভাড়াটে লোক দিয়ে ধর্মাধিকরণে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করে বাঁচার শেষ চেষ্টা করল। ধর্মাধিকরণ বিচার ফল জানালেন, অধ্যক্ষের কাজ আইন সম্মত নয়।

আনন্দে ধেই ধেই করে নৃত্য করতে থাকে ধ্বজাধারী। রাতারাতি ডিসগ্রেস পার্টির সদস্যদের ডেকে নিল তার অমাত্য পরিষদে। বাহ্যত ধ্বজাধারী মুখ্য অমাত্য হলেও আসলে ক্ষমতা পেল ডিসগ্রেস পার্টিই।

অধ্যক্ষও চুপ করে রইল না, সেও লোক দিয়ে আপিল করালো মহাধর্মাধিকরণে। আপিলের ফল বেরুবার আগেই বাজেট।

বাজেট তৈরী হল, ছাপা হল।

পাশ হল না।

অধ্যক্ষ আবার বলল, বে-আইনী অমাত্য পরিষদকে আমি স্বীকার করি না। আবার মুলতুবী রইল আইন সভার অধিবেশন।

ওদিকে হাজার হাজার মানুষ আইন অমান্য করে জেলে ঢুকল! তাদের খাদ্য জোগাতে রাজকোষ প্রায় শূন্য, ভাণ্ডারও শূন্য।

রাজ্যপ্রমুখ বিপন্ন হল রাজনীতির আবর্তে।

ভেঙ্গে দিল ধ্বজাধারীর অমাত্য পরিষদ। মাস পেরোবার আগেই ডিসগ্রেস পার্টিকে তল্পীতল্পা নিয়ে আবার বিদায় নিতে হল মসনদ থেকে।

চেয়ার হল শূন্য।

চিৎকার উঠল নির্বাচন চাই! নির্বাচন চাই।

ওদিকে খোটাই রাজ্যেও অশান্তি সৃষ্টি করল দল ছাড়া ডিসগ্রেস পার্টির সদস্যরা। নতুন দল গড়ে তুলল আসোয়ান সাহেব। আঠার দলের অমাত্য সভা সেখানেও কুপোকাৎ। রাজা মহারাজার দেশ খোটাই রাজ্য। সেখানে রাজা মহারাজার লোভ হল বাঁধনহীন রেসের ঘোড়ার মত। এতকাল আঠার দলে নাম লিখিয়ে নসীব ফেরাতে চেষ্টা করেছিল রাজা মহারাজারা। আঠার দলের খিঁচুড়ি শেষ পর্যন্ত বদহজম হল রাজা মহারাজাদের। তাই আসোয়ান সাহেবের দলে ভিড়ল তারা।

গোপনে অর্থ জোগান দিল দেশী বিদেশী বণিকরা। খোটাই রাজ্য হল পাতন রাজ্যের দ্বিতীয় কামধেনু। সেখানে ভূমির তলে লুকিয়ে আছে যখের ধন। সেই ধনের মালিকানা যাদের তারা খোটাই রাজ্যকে আঠার দলের হাতে ছেড়ে দিতে রাজি নয় কোন মতেই। তাদের চক্রান্ত সফল হতে বিলম্ব ঘটল না, কিন্তু আসোয়ান সাহেবও গদিতে বসতে পারল না নিরুদ্বেগে। রাতারাতি দল বদল করে বিপক্ষ দলে যোগ দিল তার অনুচররা। আইন সভার পতন ঘটল আসোয়ানের। খোটাই রাজ্যের রাজ্যপ্রমুখও শাসন ব্যবস্থা তুলে নিল নিজের হাতে। গণতন্ত্রের পূজারীরা আনন্দে নৃত্য করল আর একবার।

খোটাই রাজ্যই শেষ নয়।

শনির দৃষ্টি পড়ল বেণীধ্বজেও।

বেণীধ্বজ আত্মসমর্পণ করল কেন্দ্রের চাতুরীর কাছে।

বাদশাপুরেরও একই দশা।

সর্বত্রই ভেঙ্গে গেল আঠার দলের অমাত্য পরিষদ। হাত শুধু ছোঁয়াতে পারল না নর্মচর ও ইমলিপুরে, আর তখনও ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থা মধ্যভুক্তির। ওড্র দেশেও ডিসগ্রেস পার্টি মোটেই সুবিধা করতে পারল না।

তবুও রাজনীতির খেলায় জয় হলো ডিসগ্রেস পার্টির।

আঠার দলের দুর্ভাগ্য, তারা আঠার মতের সমন্বয় ঘটাতে পারল না কোনমতেই।

পাতনরাজ্যের কেন্দ্রে অস্থিরতা কমল কিছুটা। ডিসগ্রেস পার্টির অঙ্গ রাজ্য থেকে বিলুপ্ত হবার আশঙ্কাও কমে গেল ধীরে ধীরে। বিরোধীদের কুপোকাৎ করে দিকে দিকে বিজয় নিশান উড়িয়ে দিল কেন্দ্রের শাসক মণ্ডলী।

চাকা ঘুরছে।

কোথায় এবং কখন থামবে তা ভেবে ঠিক করতে পারেনি কেউ-ই।

মার্কিন হামলা চলেছে এশিয়ার দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে।

সারা বিশ্ব ধিক্কার দিচ্ছে মার্কিন হামলাবাজীকে। পাতনরাজ্যের মহামাত্য এই হামলাবাজীর মৃদু প্রতিবাদ জানিয়েও ঘোষণা করল, মার্কিন রাষ্ট্রপতি হলেন শান্তির দূত।

কেমন বেখাপ্পা ঠেকল ঘোষণাটা।

প্রতিবাদের ঝড় উঠল দিকে দিকে।

মহামাত্য ভাষ্য দিল, অন্তরে অন্তরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি পৃথিবীর শান্তি চান। তা নইলে সারা বিশ্বে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ত এতদিনে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন ভূমিকা আর্ত আশ্রয় প্রার্থীকে সাহায্য করার ভূমিকা মাত্র।

পাতনের নিরপেক্ষতার অপমৃত্যু ঘটল মহামাত্যের এই উক্তিতে। বহির্বিশ্বে মর্যাদামণ্ডিত যে আসন লাভ করেছিল পাতন, সে আসন থেকে অনেকটা নীচে নেমে গেল সামান্য এই উক্তির জন্য। দেশ বিদেশে নিন্দার রোল উঠল।

মার্কিনরাও সুযোগের অপেক্ষা করছিল।

পাতনের ভিখারী দশা। খাদ্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হল মার্কিনের দরজায়। সুযোগ বুঝে মার্কিনীরাও অপমানজনক সর্ত চাপিয়ে দিল এবার।

খাদ্য দেব কিন্তু তোমরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে বাণিজ্য করতে পারবে না।

স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল মহামাত্য।

ভাষ্য দিল, এটা রাজনৈতিক কোন সর্ত নয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মাত্র। এতে পাতনের মর্যাদা কোন ক্রমেই হানি হয় নি।

বিরুদ্ধপক্ষ ধিক্কার দিল এই ক্লীবত্বের জন্য। তারা বলল, পৃথিবীতে এমন আরও অনেক দেশ আছে যেখান থেকে আমরা সাহায্য পেতে পারি রাজনৈতিক সর্ত বিনাই। তার চেষ্টা করা উচিত ছিল পাতন সরকারের। মার্কিন সাহায্য গ্রহণের অর্থ হল আত্মবিক্রয় করা।

ওদিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল আরসুলা রাজ্য উৎপাতনের দিকে।

সর্বনাশ!

উৎপাতন রাজ্য অস্ত্র বলে বলীয়ান হলে পাতনের গুরুতর বিপদ। প্রতিবেশি দুটি বৈরী ভাবাপন্ন রাষ্ট্রের প্রতি মনোযোগ দিতে অনুরোধ করল সবাই। কিন্তু যে বিষ কণ্ঠগত করে নীলকণ্ঠ সাজতে হয়েছে পাতনকে সে বিষ থেকে অন্তত মুক্তি পাবার আশা আর নেই। আরসুলা আর পাতনের সখ্য ভবিষ্যতে যে গুরুতর অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না কারও। সমান আশঙ্কা নিয়ে দিন কাটায় শাসক ও শাসিতরা।

কূটনীতিতেও পাতনকে টেক্কা দিল উৎপাতন। পাতনের চির সুহৃদ ভালুক রাজ্যও এগিয়ে গেল উৎপাতনকে সাহায্য করতে। কপালে চোখ তুলে পাতনের অমাত্য পরিষদ ছুটে গেল ভালুক রাজ্যে।

ভালুকরা মৃদু হেসে বলল, অস্ত্র সাহায্য করছি ঠিকই, তা বলে তোমাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব মোটেই নষ্ট হয়নি, হবেও না।

সান্ত্বনা লাভ করল পাতনের শাসকরা।

বৈদেশিক নীতিতে পেছন হাঁটতে বাধ্য হল এই ভাবেই।

স্বদেশে বিদেশে ডিসগ্রেস পার্টির ক্রমাবনতি লক্ষ্য করে হাসল অনেকেই, দুঃখও অনুভব করল নানা জনে কিন্তু রাজনীতির খেলায় পথ বদলের কোন চেষ্টাই করল না ডিসগ্রেস পার্টি। আরও অধঃপতনের অপেক্ষা করছিল তখনও।

গিদ্ধরলাল শিয়ালিয়া হুমকি দিয়েছে।

অঙ্গ রাজ্যের অঙ্গহানি ঘটবে যদি তার স্বার্থহানি ঘটে।

শিয়ালিয়ার কারখানায় কারখানায় তখন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে দেশের শ্রমিক নেতারা। তারা হিসেব করে দেখেছে, দেশের যত সম্পদ তার শতকরা আশীভাগ কুক্ষিগত করেছে শিয়ালিয়া কোম্পানী আর তাদের সমশ্রেণীর বিশটি পরিবার। তাদের অঙ্গুলি হেলনেই উত্থান পতন ঘটছে অঙ্গরাজ্যের অমাত্য পরিষদের। আর তাদের পেছনে রয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল বৈদেশিকদের সাহায্য।

বিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করছে দেশের লোক। যম তুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখেছেন, বিগত বিশ বছরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ছ' গুণ। তার মধ্যে খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে পনের গুণ। আর খাদ্য-কারবারী সরকারও ধাপে ধাপে পাঁচ বছরেই আড়াই গুণ মূল্য বৃদ্ধি করেছে খাদ্যের। কালোবাজার আর চোরা বাজার বলে যাকে ঘেন্না করত সজ্জন, তাকেই সাদা ও সৎ বাজার বলে গ্রহণ করেছে সবাই।

বিশ বছরে রেলের ভাড়া বেড়েছে তিন গুণ, ডাক খরচ বেড়েছে আড়াই গুণ! এগুলো বৃদ্ধি করেছে সরকার নিজেই। আর এই বর্ধিত মূল্যের টাকা ব্যয় করছে মহামাত্যের পারিষদ ও অনুচররা বিশেষ বিশেষ অপব্যয়ের খাতায়।

দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে তাল রেখে উপার্জন বৃদ্ধির কথা ভাবছেনা কেউ-ই। যদি কেউ মুখ ফুটে প্রতিবাদ জানায় তার জন্য ব্যবস্থা হয় কয়েদখানায়।

দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধে অপারগ এই সরকার।

চারিদিকেই হাহাকার।

রেবতী মান্না চাকরি করে শিয়ালিয়া কোম্পানীতে। সপ্তাহে সপ্তাহে হাজিরা পায় তিরিশ টাকা। পোষ্য সাতজন। মাসকাবারের হিসাবে একশ কুড়ি অথবা পঁচিশ টাকায় কোন রকমে সাতজনের এক বেলার আহার্য সংগ্রহ হয়, রাতের বেলায় শিশুদের খাবার জুগিয়ে নিজেদের খাবার মত বিশেষ কিছু থাকে না।

বেরতীর স্ত্রী লতা অনুযোগ করে।

পরিধেয় নেই।

বিলাস দ্রব্য তো অজ্ঞাত বস্তু। আট আনা খরচ করে মাসে একবার সিনেমা দেখার সামর্থ্যও তাদের নেই।

আবেদন নিবেদন করেছে অনেকবার। কর্তৃপক্ষের কানে সে আবেদন পৌঁছলেও কোন বিহিত হয়নি আজ ও। শ্রমিক নেতারা মালিক পক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সুবিবেচনার আবেদন করেছে। সবই নিষ্ফল।

অবশেষে ধর্মঘটের ডাক দিল তারা।

যথাযথ নোটিশ দিয়ে প্রস্তুত হল শ্রমিকরাও। শিয়ালিয়া কোম্পানীও চুপ করে বসে নেই। তারাও নতুন করে শ্রমিক দল গড়ে সংগঠনে ভাঙ্গন ধরাতে তৎপর হল। যে অর্থ ব্যয় করল শ্রমিকদের মাঝে ভাঙ্গন ধরাতে সে অর্থ ব্যয় করলে শ্রমিক অসন্তোষ সাময়িক বন্ধ হত অবশ্যই, কিন্তু স্থায়ী দায় ঘাড়ে নিতে অরাজি বলেই হাঙ্গামা মেটাতে গিয়ে হাঙ্গামা বৃদ্ধি করল শিয়ালিয়া কোম্পানী।

শিয়ালিয়া স্বয়ং ছুটে গেল রাজধানীতে।

চৌঘটলাল আশ্বাস দিল শিয়ালিয়ার স্বার্থ রক্ষার। উপদেশ দিল ট্রাইবুন্যালে পাঠাও মামলা। উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল শিয়ালিয়া।

শ্রমিকরা বলল, এটা হল বঞ্চনা করার সহজ পন্থা। আমরা মানব না, আমরা ধর্মঘট করব।

সরকার বলল, ধর্মঘট বে-আইনী হবে। আইনের খেলাপ করতে পারি না। যদি ধর্মঘট কর, আমাদের হস্তক্ষেপ করতেই হবে।

মজদুর সমিতি সরকারের চোখ রাঙ্গানী উপেক্ষা করেই ধর্মঘটে নামল।

শিয়ালিয়ার স্বার্থ রক্ষা করতে ছুটে এল পুলিশ বাহিনী।

সমাজ বিরোধীদের হাতে তুলে দিল কারখানা রক্ষার দায়িত্ব। সমাজ বিরোধীরা লাঠি-বোমা নিয়ে রঙ্গমঞ্চে নামতেই পুলিশ বন্দুক তুলে ধরল, অবশ্যই সমাজ বিরোধীদের শায়েস্তা করতে নয়।

পরের দিন সংবাদ পত্রের এক কোনায় সংবাদ বের হল।

মারমুখী শ্রমিকদের শান্ত করতে না পেরে পুলিশ গুলী চালাতে বাধ্য হয়েছে। নিহতের সংখ্যা তিন, আহত পুলিশ সমেত আঠার।

শিয়ালিয়া সুযোগ বুঝে লক্-আউট ঘোষণা করল। কারখানা বন্ধ হয়ে গেল।

সকাল বেলায় রেবতী মান্না ধর্মঘটীদের সঙ্গে যোগ দিতে গেছে। দুপুরের খাবার নিয়ে বসে আছে লতা। সময়মত রেবতী ফিরে না আসতে উদ্বিগ্ন হল। ঘর বার করছিল অনবরত। সন্ধ্যার সময় ভগ্নদূতের মুখে খবর পেল, পুলিশ গুলী চালিয়েছে। গুলীতে মারা গেছে তিনজন, তার মধ্যে একজন হল রেবতী মান্না।

হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল রেবতী মান্নার সদ্য বিধবা লতা মান্না। ক্রন্দনের রোল বিশ্ব-পিতার কর্ণে পৌঁছল কিনা জানা যায় নি আজও, কিন্তু রাতের বেলায় পুলিশ এসে হামলা করল লতার গৃহে।

কেন!

রেবতী বোম মেরেছে পুলিশকে। ঘর তল্লাসী করবে।

নামে ভেঙ্গে চুরে শেষ করল লতার শেষ সম্বল। শিশুদের আহার্যকণাও পায়ে ডলে নষ্ট করে দিয়ে গেল পুলিশ বাহিনী।

একহাতে চোখের জল মুছতে মুছতে পরের দিন সকালে লতা গেল মর্গে তার স্বামীর মৃতদেহ ফিরে পেতে। রেবতীর সহকর্মীরা ফুলের মালা দিয়ে সাজাল রেবতীর মৃতদেহ। কাঁধে করে নিয়ে গেল নদীর কিনারায়।

লতার আশা ভরসা পুড়ে শেষ হয়ে গেল তার চোখের সামনে।

পরের দিন নেকীরাম এসে বলল, ভোজী তুমহার খুব কষ্ট। আমাদের কুছু করার নেই। তুমহার জন্য সমিতি এই পঁচাশটা টাকা দিল। এই নিয়ে সংসার চালাও। আউর রুপেয়া চন্দা করে পিছে দিয়ে যাব।

লতা হাত পেতে নিল টাকা কয়টা।

তার এই বিপদে সাহায্য করতে রেবতীর সহকর্মীরা যে এগিয়ে এসেছে সেজন্য ধন্যবাদ দিল।

শিয়ালিয়া ছুটে গেল রাজধানীতে।

কারখানা উঠিয়ে নিয়ে যাব চোরকাটা থেকে, প্রস্তাব দিল শিয়ালিয়া।

অর্থ বিভাগের অমাত্য সচিবকে বলল, হিসাব করে দেখ কারখানা উঠিয়ে নিলে শিয়ালিয়ার লাভ হবে কি লোকসান হবে।

হিসেব করে অর্থ সচিব বলল, লোকসান হবে। কাঁচা মালের অভাব ঘটবে, আর অল্প মূল্যের মজুর পাবে না। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। লভ্যাংশ কমবে, হয়ত লোকসান হবে।

হিসাব শুনে শিয়ালিয়া কারখানা উঠিয়ে নেবার কথা ভুলে গেল। কিন্তু কারখানা চালু করতে হলে মজুরদের সহযোগিতা চাই। তার কি উপায়!

উপায় স্থির করে দিল শ্রম অমাত্য।

বলল, পেটের দায়ে কারখানার মজুররা আপনা থেকেই ছুটে আসবে। নতি স্বীকার করবে। আরেকটু অপেক্ষা করুন শিয়ালিয়াজি। ওদের যদি বেশি মজুরী দিতেন তা হলে বিরাট তহবিল থাকত ওদের হাতে। তা যখন নেই তখন ধর্মঘটের মেয়াদ বড় জোর আর এক সপ্তাহ। এর মধ্যে আমি যাচ্ছি। ওদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হব বলেই আমার বিশ্বাস।

শিয়ালিয়া আশ্বস্ত হয়ে ফিরে গেল চোরকাটায়।

অর্থ অমাত্য এল চোরকাটায়। কারখানার ময়দানে সভা ডেকে বলল, আমরা শ্রমিকের মঙ্গল চাই। মালিকদের উৎপীড়ন থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করাই হল আমাদের সমাজবাদের মূল মন্ত্র। কিন্তু শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক যাতে প্রীতিপ্রদ হয় তা দেখাও আমাদের কর্তব্য। আমরা ধর্মঘট চাই কিন্তু সব সময় ধর্মঘট জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে না। আমাদের এখন দেশ গঠনের সময়। উৎপাদন বৃদ্ধি না হলে দেশ গঠন সম্ভব নয়। শ্রমিক ভাই যদি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য না করেন মালিকরা অধিক মজুরী দেবেন কি করে। সেজন্য আমার বিশ্বাস শ্রমিক ভাইরা যদি ধর্মঘটের পথ পরিত্যাগ করে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দেন তাহলে মালিকও তার লভ্যাংশ বণ্টন করতে মোটেই ত্রুটি করবেন না।

সভার শেষে শিয়ালিয়াকে গোপনে জিজ্ঞাসা করল, এদের নেতা কোন দলের ?

শিয়ালিয়া বলল, হামবাগ পার্টির।

অর্থ অমাত্য দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে রাজ্যপ্রমুখের আবাসে আশ্রয় নিল।

পরের দিন ডেকে পাঠাল হামবাগ পার্টির নেতাকে।

চুপি চুপি কি কথা হল তা কেউ জানে না। তবে গিদ্ধরলাল শিয়ালিয়া সেল্‌ফ্‌ চেকে দশ হাজার রুপেয়া তুলে তার হাতে দিয়ে ফিরে এল কারখানায়।

তিনদিন না যেতেই কারখানার দরজা খোলা হল।

শ্রমিকরা ফিরে এল কাজে, কারণ এটা তাদের নেতার নির্দেশ। আর শিয়ালিয়াও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবার উৎপাদন বোনাস দেবে তিনমাসের।

নেতা বলল, শ্রমিকদের জয় হয়েছে।

শ্রমিকরা বলল, আমাদের জয়।

শিয়ালিয়া শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিসে বসে মৃদু হাসল।

রেবতী মান্নার স্ত্রী লতা এই জয়ের অংশীদার নয়। তখনও তার চোখে জল। সে জল মুছিয়ে দেবার মত একজনকেও খুঁজে পাওয়া গেল না আর।

ওদিকে ব্র্যাণ্ডি হোটেলে খানাপিনার ব্যবস্থায় মিলিত হয়েছে অর্ধ অমাত্য আর শিয়ালিয়া; নিমন্ত্রিত হয়েছে হামবাগ পার্টির নেতা অলখ সিং দুধোরিয়া।

ক্ষেত মজুর খেঁকুর সিং এতকাল শুনে এসেছে জমিন পাবে। সরকার জমিদারি কেড়ে নিয়েছে, এবার সে জমি সবাইকে ভাগ করে দেবে। খেঁকুর সিং দশ বছর সরকারী দয়া পাবার আশায় পথ চেয়েছিল। জমিন পাওয়া তো দূরের কথা শেষ পর্যন্ত তার ভাগচাষের অধিকারটুকুও কেড়ে নিল জোতদাররা।

কারণ।

জোতদার উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দু'ভাগ দাবী করল, এক-ভাগের অধিকার শুধু ভাগীদারের।

খেঁকুর সিং বলল, ব্যবস্থাটা উল্টো করতে হবে মহাজন। তুমি পাবে একভাগ আমি পাব দুইভাগ।

মহাজন হেসে বলল, অন্যের জমি দেখে নে খেঁকুর। আমার জমিতে আর পা দিস না। তুই চাষ না করলেও অনেক চাষী হাঁ করে বসে আছে।

খেঁকুর সিং বলল, তা আছে। তবে মানুষ মেরে তোমরা কি বাঁচবে।

ধর্মকথা শুনতে চাই না। এবার থেকে তোর ভাগীদারী জব্দ।

সত্যিই, খেঁকুর সিং বিতারিত হল জমি থেকে। তারই নিকট আত্মীয় ঝাঁপট সিং জমি চষছে মহাজনের। খেঁকুর বাধা দিল না। গোপনে জিজ্ঞেস করল, তুই কেন জমি ভাগে নিলি?

তোর মত বোকা আমি নই। ফসল উঠলেই আধা ফসল ঘরে তুলব চুরি করে। তারপর একভাগ নিতে কি আপত্তি বল দিকি।

ওঃ, বলে খেঁকুর সিং ফিরে গেল ঘরে।

শুধু খেঁকুর সিং নয়, মাকড়া বাদিয়া, রোহন কুর্মী, আগলু মিঞা সবারই এক দশা। রাতের বেলায় যুক্তি করল, অন্যকে চাষ করতে আমরা দেব না। জবরদস্তি হঠিয়ে দিতে হবে নতুন ভাগীদারদের।

পরের দিন লাঠিসোটা নিয়ে বঞ্চিত ভাগীদারের দল বাধা দিল। খবর পেয়ে মহাজন ছুটে গেল থানায়। এজেহার দিল সেলাম পার্টির উসকানিতে কয়েকজন সমাজ বিরোধী তাদের জমি থেকে বেদখল করতে এসেছে। এজাহার শেষ করে মোটা হাতে দক্ষিণা দিল পুলিশকে।

সংবাদ পেয়েই পুলিশ এল বন্দুক হাতে করে।

খেঁকুর সিং-এর দল যথারীতি নিবেদন করল তাদের দাবী। পুলিশ বলল, ওসব আদালতের ব্যাপার। তোমাদের জোর করে চাষ করতে দেব না। তোমরা ঘরে ফিরে যাও।

আগলু মিঞা বলল, বিশ বছর ধরে আমরা চাষ করছি আর আজ চাষ করতে পাব না কেন? আমাদের চাষ করার অধিকার আছে।

পুলিশ হেসে আবার বলল, ওটা আদালতের বিচার্য। তোমরা মামলা কর। আমরা জমি বেহাত হতে দিতে পারব না। আইন তোমাদের দাবী স্বীকার করে না।

দেখতে দেখতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। ভাগীদাররা তাদের অধিকারের কথা বার বার বলতে লাগল, কিন্তু পুলিশ সে অধিকার স্বীকার করল না।

অবশেষে মহাজনের লোক হাল বলদ নিয়ে নামল জমিতে।

খেঁকুর সিংয়ের দলও নামল হাল বলদ নিয়ে।

অতএব হাঙ্গামা।

পুলিশ দর্শক নয়। হাতে তার বন্দুক। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল খেঁকুর সিং। জনতা ছত্রভঙ্গ হল। খেঁকুর সিংয়ের রক্তে রাঙ্গা জমিতে মহাজনের হাল বলদ নিয়ে চাষে নামল নতুন ভাগীদাররা। পুলিশ খেঁকুর সিংয়ের প্রাণহীন দেহটা গরুর গাড়িতে চাপিয়ে পাঠিয়ে দিল সদরে, ময়না তদন্তের জন্য।

ক্রন্দনের রোল উঠল খেঁকুর সিংয়ের বাড়িতে।

আহা বলতে এগিয়ে এল না কেউ-ই।

আইনের সম্মান রক্ষা করতে পুলিশ তৎপর, মহাজনও তার অমানবিক দাবী কায়েম করতে ব্যস্ত। বুভুক্ষু দাবীদারদের ক্ষুধা মিটল বুকের রক্ত দিয়ে।

সংবাদ পৌঁছল রাজধানীতে।

চৌঘটলাল বিশেষ দূত পাঠাল খোটাই রাজ্যের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করতে। বিশেষ দূত সরজমিনে তদন্ত না করে সদরে বসেই রিপোর্ট লিখল, মারমুখী জনতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পুলিশ গুলী চালিয়েছিল। অর্থাৎ দোষ পুলিশের নয়, দোষ ঐ শীর্ণকায় বুভুক্ষু খেঁকুর সিংয়ের।

চৌঘটলাল খুশী হল। না, ডিসগ্রেস পার্টি ক্ষমতায় থাকতে কোথাও কোন অন্যায় হতে পারে না, হবেও না।

খেঁকুর সিংয়ের স্ত্রী রামরতিয়ার মৃতদেহ পওয়া গেল তার শয়ন গৃহে, গলায় তার ফাঁস।

কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলোয় ভীড়। কাজ চাই।

কাজ দেবে কে!

যারা কাজ দেবার মালিক তারা নিজেদের দেশ থেকে লোক আনিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করছে, স্থানীয় লোক কাজ পাচ্ছে না। তারা সহজভাবে বলছে, স্থানীয় লোকেরা ধর্মঘট আর গোলমাল করে বেশি। অস্থানের লোকেরা অনুগত থাকে। তাই যে দেশে আমাদের কলকারখানা সে দেশের লোককে আমরা কাজ দিতে রাজি নই।

স্থানীয় লোকেরা বলল, কাজ আমাদের দিতেই হবে।

মহামাত্য চিৎকার করল, আমাদের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হচ্ছে। পাতন রাজ্যের নাগরিকদের সর্বত্র কর্মলাভের সমান অধিকার, স্থানীয় অথবা অস্থানীয় প্রশ্ন জাতিকে ধংসের পথে নিয়ে যাবে।

যারা কর্মসংস্থানের দাবী তুলেছিল তারা এই একাত্মীতে ধরাশায়ী হল।

সরকার চিন্তিতভাবে ধর্মঘটীদের দিকে তাকিয়ে বলল, অটোমেশান কর, র‍্যাশানালাইজ কর। মানুষকে কাজে ডেক না, যন্ত্র দিয়ে কাজ করাও।

বিরুদ্ধ পক্ষ বলল, দেশে একেই কর্মসংস্থান ঘটছে না, তার ওপর অটোমেশান চালালে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। শতকরা পঁচিশ-জন বেকার হবে। ভবিষ্যতে নতুন নিয়োগের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হবে।

মহামাত্য বলল, ওসব নিছক জুজুর ভয়। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ না করলে কর্মসংস্থান সম্ভব নয়।

আসল প্রশ্ন এড়িয়ে গেল মহামাত্য।

কু-জনে কূজন করল, বেকার এই জোয়ান ছেলেরা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করবে।

জবাব পেল, আমাদেরও পুলিশ আর মিলিটারী আছে।

সব সমস্যার সমাধান করে মহামাত্য গেল বিদেশ সফরে।

দেশে তখন অনিশ্চিত অবস্থা।

অঙ্গরাজ্যে অমাত্য পরিষদ নেই, খাদ্য খঙ্কট, বেকার সমস্যা, ছাত্র বিক্ষোভ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গুমরানি—সব কিছু পেছন ফেলে বিদেশে শুভেচ্ছা মিশনে গেল মহামাত্য।

যবন রাজ্যের রাজধানীতে বসেই মহামাত্য খবর পেল, প্রাক্তন মহামাত্য পুলকেশী অমিত্রারি নিখোঁজ হয়েছে। কন্টিনেন্টের একটা মানসিক চিকিৎসালয়ে ছিল। গত বুধবার সকালে প্রাত্যহিক প্রাতঃ ভ্রমণে বের হয়েছিল, সঙ্গী পাহারা নিত্যকার কাজ মনে করে অবহেলা করেছিল তার কার্যে। সেই অবসরে প্রাক্তন মহামাত্য নিরুদ্দেশ হয়েছে।

চৌঘটলাল সংবাদ পেয়েই যবন রাজ্য থেকে ছুটে গেল কন্টিনেন্টে। ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ শুনল। কিছুকাল যাবত পুলকেশী নিরোগ হবার দিকে এগোচ্ছিল। কয়েক মাস যাবত রাতে ঘুম হচ্ছিল বেশ, খাবারের প্রতি আগ্রহও জন্মেছিল, স্বাভাবিক-ভাবে কথাও বলত মাঝে মাঝে। হঠাৎ সোমবার রাত্রি বেলায় কি যেন হয়ে গেল। পুলকেশী চিৎকার করতে লাগল, চমকে উঠে কি যেন আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছিল বারবার। তারপরেই একেবারে বাক্‌হীন। ডাক্তাররা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন, চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয় নি কোন ক্রমেই। মঙ্গলবার থেকে সামান্য পরিবর্তনও লক্ষ্য করা গেছে। বুধবার সকালে প্রাতঃ ভ্রমণে বের হবার সময় কোন বিশেষ অস্থিরতাও দেখা দেয় নি। পাহারাদার লিওপোল্ড্ সঙ্গেই ছিল। লেকের ধারে প্রাক্তন মহামাত্য যখন পায়চারি করছিল তখন লিওপোল্ড্ গলা ভেজাবার আশায় পাশের পান্থশালায় প্রবেশ করে। সামান্য আধ ঘণ্টা সময়। তারমধ্যেই প্রাক্তন মহামাত্য নিখোঁজ হয়েছে। সবার সন্দেহ লেকের জলেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে কোথাও। তা যদি হয়, তা হলে মৃতদেহ পেতে কিছু বিলম্ব হবে। কারণ লেকের জল এত হিম যে তার থেকে মৃতদেহ

ভেসে উঠতে অনেক বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসকবৃন্দ অনুসন্ধান করতে ত্রুটি করছে না।

চৌঘটলাল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সংবাদটি পাঠিয়ে দিল পাতন রাজ্যে।

শত্রুমিত্র সবাই বলল, আহা!

পুলকেশী ভাল ছিল কি মন্দ ছিল, সে প্রশ্ন কেউ উত্থাপন করল না, শুধু বলল, আহা!

বিরুদ্ধপক্ষও শুধু প্রশ্ন করল, গুরুজি কেন নিরুদ্দেশ হল তা আজও দেশের লোক জানতে পারল না। আবার তার প্রিয় শিষ্য পুলকেশীই বা কেন নিরুদ্দেশ হল, তাও জানা গেল না। কোন রহস্য নেই তো এর পেছনে?

উত্তর দেবার মত লোক নেই।

সবাই শুধু আপশোষ করছে, আহা! বিদেশে বিভুঁয়ে এভাবে জীবনের পরিসমাপ্তি! আশ্চর্য!

চৌঘটলাল সফর অসমাপ্ত রেখে ফিরে এল দেশে।

দেশে এসেই মস্ত ভাষণ দিল জাতির উদ্দেশে, আর তিনদিন পর্যন্ত শোক দিবস পালনের অনুজ্ঞা দিল।

মুনিয়া কাঁদল।

তার কর্তব্য যে সে পালন করতে পারে নি সেজন্য আপশোষ করল।

দিন গড়িয়ে যায়।

বেদনার প্রলেপ হল সময় অপহরণ। দিন গড়াতে গড়াতে মনের ক্ষত আরাম হল। মুনিয়া আবার নিজের কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দিল। ক'দিন পরে ডাকযোগে পেল পিতার শেষ উইল। তাকে মৃত মনে করেই সলিসিটর যবন রাজ্য থেকে উইলটা পাঠিয়ে দিয়েছে মুনিয়ার কাছে।

পুরাতন মহামাত্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সঞ্চিত তার সকল

অর্থের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী করে গেছে মুনিয়াকে। এই অর্থের পরিমাণ কয়েক লক্ষ পাউণ্ড স্টারলিং। স্বদেশের স্থাবর সম্পত্তি দান করে গেছে দেশের জনসাধারণকে। আর সঞ্চিত অর্থের আশীভাগই মুনিয়াকে দিয়ে বাকিটা দিয়ে গেছে অন্য কয়েকটি মহিলাকে; তার মধ্যে একজন হল নাজুক সচদেব।

উইলের বয়ান পড়বার পর মুনিয়া স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। পুরাতন ভৃত্য বজরংবলী এসে ডেকে না তুললে হয়ত ঐভাবেই বসে থাকত সারা রাত। আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চিন্তা করল কিছুকাল।

তারপরই ফোন তুলে চৌঘটলালকে বলল, নাজুক সচদেবকে কানাডা থেকে ফিরিয়ে আনা কি সম্ভব নয়!

চৌঘটলাল বলল, খুব প্রয়োজন মনে করলে আনতে হবে বইকি! নাজুক সচদেবকে হঠাৎ কেন দরকার পড়ল মুনিয়া বাঈয়ের?

মুনিয়ার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

বলল, দরকার হয়েছে। তাকে ফেরত আনার ব্যবস্থা করুন। এক সপ্তাহের জন্য অন্তত। কি বললেন! নাজুকের অতীত কার্যকলাপ দেশের স্বার্থের পরিপন্থী? জানি। তবুও তাকে দরকার। দূতাবাসে খবর দিন।

সেই দিনই খবর গেল কানাডায়।

পরের দিন নাজুককে ডেকে পাঠাল রাষ্ট্রদূত।

আপনাকে পাতনে ফেরত পাঠাবার আদেশ পেয়েছি আমি। কালকেই রওনা হতে হবে।

এত জরুরী! বিস্মিত ভাবে নাজুক বলল।

মনে হয় খুব জরুরী। আপনি প্রস্তুত হোন।

নাজুক ফিরে এল নিজ আবাসে। সচদেব থাকে ওস্টেরিওতে, নাজুক থাকে মন্ট্রিলে। সচদেবের সঙ্গী তার মেয়ে। নাজুক একাই দিন কাটায়।

কানাডায় তাকে পাঠান হয়েছিল ঘর করতে। নাজুক এসে

পাকাপাকি ভাবে ঘর ভেঙ্গেছে কানাডায়। সচদেবকে সোজাসুজি বলে দিয়েছে, অর্থের প্রয়োজন মেটাতে সচদেব তাকে বিপথে নামিয়েছে, তার জন্য দণ্ড পেতে হবে সচদেবকেই। আর সচদেবের নিজেরও যখন কোন চরিত্র নেই তখন নাজুকের কাছেও চরিত্রের দাবী সে করতে পারে না। বিচ্ছেদ অনিবার্য। তবে লোক হাসাহাসি না করিয়ে স্বেচ্ছায় দুজনে দূরে থাকাই হল বুদ্ধির পরিচয়। সে পরিচয় দিতেই তারা দুজনে আলাদা শহরে বাস করে।

হঠাৎ পাতন থেকে জরুরী ডাক আসতে চিন্তিত হল নাজুক। এতদিনে তার পাপের ভরাডুবি বুঝি ঘটবে। তবুও মনকে প্রবোধ দিল 'আমি ডুবব ঠিকই তবে ডোবাব অনেককে'। যাবার আগে মেয়েকে দেখতে ওস্টেরিও যাওয়া প্রয়োজন। বিকেল বেলায় ওস্টেরিওতে হাজির হল নাজুক।

সচদেব বিকেল বেলায় নিজের ফ্ল্যাটে বসে গ্লাসের পর গ্লাস সুরা পান করছিল, সঙ্গী তার প্রতিবেশির বিধবা মিসেস ক্যাডব্যাক্। নাজুককে দেখে সচদেব চমকে উঠল। প্রশ্ন করল, কি মনে করে নাজুক ?

পাতনে ফিরে যাওয়ার আদেশ পেয়েছি। মেয়েকে দেখতে এলাম যাবার আগে।

ঢোক গিলে সচদেব বলল, রুমি তো নেই।

নেই মানে ?

রুমি তার প্রেমিক ওসল্যাণ্ডের সঙ্গে ব্রেজিলে বেড়াতে গেছে।

মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে নাজুকের।

সচদেব শুকনো হাসি দিয়ে মনের বেদনা গোপন করতে চাইল। ধীর কণ্ঠে বলল, এই প্রথম নয়, সি হ্যাজ সেভারেল এ্যাডমায়ারার্স, মাঝে মাঝেই বের হয় দেশ ভ্রমণে এইসব বান্ধবদের সঙ্গে। আমাদেরই মেয়ে তো! হো-হো করে হেসে উঠল সচদেব।

নাজুক ছুটে বের হল পথে, কোন প্রশ্ন করতে পারল না।

পেছনে শুনতে পেল সচদেবের সেই হাসির শব্দ। নাজুকের পশ্চাতে সচদেবের ঐ হাসির শব্দ যেন ঝড়ের বেগে ছুটে আসতে থাকে। দুই হাত দিয়ে কান চেপে ধরে গাড়িতে এসে বসল নাজুক।

পাতনের মাটিতে পা দিয়েই কেমন ভাবান্তর ঘটল নাজুকের। আশ্চর্য হয়ে দেখতে পেল বিমান বন্দরে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে পুলিশ।

কোন প্রশ্ন করার আগেই পুলিশের নির্দেশে নাজুককে উঠতে হল পুলিশ ভ্যানে।

গাড়ি এসে দাঁড়াল অমাত্য মুনিয়া বাঈয়ের বাংলোর সামনে।

পুলিশই পথ দেখিয়ে তাকে নিয়ে গেল অতিথিশালায়।

নাজুক যেন কোন মায়া রাজ্যে এসেছে। কিছুই বুঝতে পারছিল না সে।

মুনিয়া বাঈ ধীরে ধীরে যখন এসে দাঁড়াল তার সামনে তখন সম্বিত ফিরে পেল নাজুক।

আমি তোমাকে ডেকে এনেছি নাজুক।

হঠাৎ বিনা নোটিশে?

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে।

পুলিশ কেন?

অন্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ দেব না বলে। আজ আমার কাছেই তুমি থাকবে। কালকে আবার ফিরে যাবে তোমার কর্মস্থলে।

নাজুক মনে মনে হাসল।

মুনিয়া বাঈ আজ পাতনের ভাগ্য নিয়ন্তাদের অন্যতম। তাকে অখুশী করার সাহস নেই কারও। নাজুক তো অতি নগণ্য একজন।

সম্মতি জানাল নাজুক।

পরদিন সকালেই গাড়িতে উঠে বসল নাজুক। মুখে তার হাসি। যে দুশ্চিন্তা নিয়ে সে এসেছিল তার চিহ্ন ছিল না। সারারাত

কি হয়েছে ?

রাজধানীর পথে পথে ছাত্র পুলিশে লড়াই আরম্ভ হয়েছে। টিয়ার গ্যাস ছুড়েও ফল হচ্ছে না।

আমর্ড পুলিশ পাঠাও।

ফুচাসিং বেরিয়ে যাবার আগেই আবার ফোন বেজে উঠল।

পূর্বায়তন।

হ্যাঁ।

একশ বাষট্টিটা কারখানায় লক্-আউট। পুলিশ পাহারা বসেছে। ভাল করেছেন। অবস্থা দেখতে থাকুন। ঘটনার গতি প্রকৃতি জানাতে বিলম্ব করবেন না।

আবার বেজে উঠল ফোন।

কে ?

নর্মচর। খাবার। পাঠান হয়েছে। আর দিতে পারব না। লোককে বলুন দেশে খাবার নেই। কোথায় পাব আমরা। উপায় নেই। লোকে না শুনলে পুলিশ দিন। পুলিশ দেবেন না। কেন! শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে নিশ্চয়ই। আচ্ছা আচ্ছা।

আবার চৌঘটলাল ফাইলে মন দিল।

ফুচা সিং রিপোর্ট হাতে এসে দাঁড়াল।

আবার কি ?

পূর্বায়তনের রিপোর্ট। চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-চোলাই-নরহত্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে। কি ব্যবস্থা করতে হবে জানতে চেয়েছে রাজ্যপ্রমুখ।

পুলিশ কি অকর্মণ্য !

ফুচা সিং ভয়ে শুকিয়ে গেল।

এখান থেকে পুলিশ পাঠাও অঙ্গরাজ্যকে সাহায্য করতে।

ফুচা সিং রিপোর্ট হাতে করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ফোন বেজে উঠল আবার।

বন্যায় ডুবে গেছে ওড্র দেশের সমুদ্র তীরের জেলা গুলো।

বেশ হয়েছে। অঙ্গরাজ্য সরকার ব্যবস্থা করবে। কেন্দ্রের কিছু করার নেই।

আবার ফোন এল অবন্তিকা থেকে।

অনুপ্রবেশ! মিলিটারী য়্যাক্শন। গুলি করে হঠিয়ে দাও উৎপাতনের দস্যুদের।

ফোন ছেড়ে দিয়ে চৌঘটলাল। নিজের মনেই বলতে থাকে, পুলিশ, মিলিটারী, গ্রেপ্তার, গুলী। আর কোন পথ নেই। আর কোন পথ নেই।

বার বার একই কথা বলতে বলতে হঠাৎ তার মনে হল প্রাক্তন মহামাত্যের মত তারও মানসিক বিকার ঘটবে না তো! শেষ পর্যন্ত মানসিক রোগের হাসপাতালেই আশ্রয় নিতে হবে না তো!

তাই তো?

মানসিক বিকার! পুলিশ! মিলিটারী! গ্রেপ্তার! গুলী।— চমকে উঠল চৌঘটলাল।

কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল চৌঘটলালের। আবার ফোন বেজে উঠল। ফোনটার দিকে কাতর নয়নে চেয়ে রইল চৌঘটলাল। রিসিভার তুলে ধরবার সাহসও তখন আর তার ছিল না। যবনিকা পতনের তখনও অনেক বিলম্ব। নেপথ্য রাজনীতির অবশিষ্ট ইতিকথা তখনও লেখা হয়নি।